মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল

মধুসূদনের কালপর্ব থেকে অতি আধুনিক কালের সাহিত্যসমাজ পর্যন্ত প্রসারিত সময় সীমায় কাব্য, উপন্যাস, সমালোচনা সাহিত্যের যে বিপুল বিকাশ ঘটেছে তার সুচিন্তিত উপস্থাপনায় সমুজ্জ্বল এই সমালোচনা গ্রন্থখানি। বিভিন্নকালের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, সমালোচকের মেজাজ ও মৌলিক চেতনার বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে গ্রন্থখানি সবিশেষ সমৃদ্ধ।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

স্বপ্ন-কামনা (কাব্য)
স্বর ও অন্যান্য কবিতা (কাব্য)
দিনযাপন (কাব্য)
শতাব্দী শতক (কাব্যসংকলন)
সময় ও সাহিত্য (সমালোচনা)

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রূপা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

মুদ্রক : ফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেস
৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : নরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সূচী

মেঘনাদবধ কাব্য ও তৎকালীন শিল্পচিন্তা

গত একশত বছরের মধ্যে বাঙালী লেখকের শিল্পচিন্তায় যে সুগভীর ও বহুব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করা যায়, তার সর্বপ্রধান কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্বত্রমুখীতা। বস্তুত রবীন্দ্রনাথে পৌঁছেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যচিন্তায় যথার্থ ভারসাম্যস্থাপনের প্রভূত প্রমাণ উপস্থিত এবং একালের রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠেই সচেতন ও শিক্ষিত পাঠক মহৎ উপলব্ধিতে আন্তরিকভাবেই অনুপ্রাণিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নে শতবর্ষ পূর্বে যে অনন্যসাধারণ সৃজনী-প্রতিভা মেঘনাদবধ কাব্যকে কেন্দ্র ক'রে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তার প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ সাম্প্রতিককালেও পাঠকসমাজকে বাংলাভাষায় লালিত সৎসাহিত্যের আদি এবং প্রারম্ভিক চেতনা সম্পর্কে সজাগ রাখতে সমর্থ। অর্থাৎ, মেঘনাদবধ মধুসূদনের বহুস্তরময় শিল্পচিন্তার সাক্ষ্যই শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর শিল্পচিন্তার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের কল্পনাও মেঘনাদবধ কাব্যপাঠ ভিন্ন প্রায় অসম্ভব। তৎকালীন সাহিত্যচিন্তায় মেঘনাদবধ সামগ্রিক প্রতিভার স্বাক্ষর এবং যথোচিত অভিনিবেশ ও সতর্কতাই এই কাব্য আস্বাদনের একমাত্র সহায়। যদিও এই অনন্য কাব্যগ্রন্থের বহু শব্দ, ক্রিয়াপদ এবং অন্যান্য উপকরণ ইতিমধ্যেই নিষ্প্রভ এবং অনেক সময়েই টীকা ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে হয়তো পাঠোদ্ধারও অসম্ভব, তবু সমগ্রভাবে মেঘনাদবধ বাংলা কাব্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অন্যতম এবং সেকালের প্রধানতম সাক্ষ্য; স্বচ্ছ ও শতমুখী শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে একালেও সুনিশ্চিতভাবেই অপরিহার্য। সুতরাং একালের যে-পাঠক এই কাব্যগ্রন্থের অনাধুনিক ভাষাবিন্যাসকেই কাব্যপাঠের প্রধানতম অন্তরায় মনে করেন এবং মেঘনাদবধ সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ না করেই বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিতৃপ্ত হতে চান, তাঁর উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সিদ্ধ হবে কিনা সন্দেহ।

বস্তুত মধুসূদনের বিরলপ্রতিভাসৃষ্ট মেঘনাদবধেই সর্বপ্রথম আধুনিক শিক্ষিতমনের উপজাত কাব্যসৃষ্টির সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ সেকালের শিল্পচিন্তায়

বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত করেছিল এবং ভারতচন্দ্রের গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট কিন্তু সর্বজন-উপভোগ্য কবিতায় অভ্যস্ত পাঠক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের সম্মুখীন হয়েছিল, বলা বাহুল্য। শুধু সম্ভাবনার দিক থেকেই নয়, সিদ্ধির ক্ষেত্রেও মেঘনাদবধে মধুসূদনের সাফল্য বিস্ময়কর। প্রতীচ্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের আদর্শে মহাকাব্যরচনায় বদ্ধপরিকর এই মহাশক্তিধর কবি একদিকে যেমন এতদ্দেশীয় সর্বজনশ্রুত কাহিনীকেই বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করলেন অন্যদিকে তেমনই তৎকালীন বাংলা সাহিত্যপাঠকের সঙ্কীর্ণ, অনেক পরিমাণে অচেতন ও গতানুগতিক দৃষ্টিপথের সামনে অভূতপূর্ব, সুবিস্তৃত সাহিত্যচেতনার শতবর্ণে অনুরঞ্জিত নবদিগন্ত উজ্জ্বলরূপেই উদ্ভাসিত হ'লো। এই সর্বপ্রথম গতানুগতিক সংস্কারে আচ্ছন্ন বিমূঢ় কাব্যপাঠকের চেতনায় য়ুরোপীয় কাব্যজগতের শত বাতায়ন খুলে গিয়ে তর্কাতীত উপলব্ধির সুনিশ্চিত অনুরণন সম্ভবপর হ'লো। বাঙালী পাঠক বুঝলেন, শাখা-প্রশাখার আধিক্যে য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতের বহুবিস্তৃত বনস্পতি যদিও দ্বাররুদ্ধ পথের দুর্গমতাই মনে জাগায় তবু প্রকৃত বিশ্ববীক্ষার সন্ধান এই পথেই সম্ভব। মধুসূদনের জীবনেতিহাস বর্তমান প্রবন্ধের অঙ্গীভূত নয়। তবু এইটুকু বলা আবশ্যক যে ব্যক্তিগত জীবনে সংযমের অভাব তাঁর শোকাবহ পরিণতির কারণ হলেও কাব্যরচনার ক্ষেত্রে, সৎসাহিত্যের উপযোগী আদর্শসন্ধানের জগতে, যথোপযুক্ত সংযমই তাঁর কাব্যে যথার্থ ধ্রুবসাহিত্যের আদর্শ ও অভিপ্রায়কে আগাগোড়া অব্যাহত রেখেছে। বস্তুত মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদন শিল্পপ্রকরণের কোনো গতানুগতিক আকারকে প্রশ্রয় দেন নি। বরং বলা যেতে পারে প্রয়োজনবোধে মহৎ কবিজনোচিত নিয়মলঙ্ঘনেও তাঁর প্রতিভার সমর্থন সর্বদা অব্যাহত ছিল। একদিকে গ্রীক মহাকাব্যের আদর্শে কাব্যরচনা অন্যদিকে রামায়ণের চরিত্রসমূহের ভিন্নতর বিশ্লেষণ—মধুসূদনের কবিপ্রতিভার সঞ্জীবনীস্পর্শে এই উভয় দিকই সমপরিমাণে সমুজ্জ্বল। তৎকালীন শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে এই উভয় দিকই অনন্য প্রতিভার সাক্ষ্য।

*

মধুসূদনের পত্রাবলী থেকেই মেঘনাদবধ কাব্যের পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়। বালক বয়সেই রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনীগুলো তাঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে থাকবে। উত্তরকালে তাঁর কবিকল্পনায় এইসব কাহিনীগুলোই বিভিন্ন কবিতাবলীর মাধ্যমে নৈপুণ্যের সঙ্গেই কাব্যোচিত উপাদানে পরিণত হয়েছে। নয় সর্গে বিভক্ত মেঘনাদবধ কাব্যের তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনার সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে যে-সব বিচিত্র দৃশ্যসজ্জা রচিত ও পরিকল্পিত হয়েছে তার তুল্য বিন্যাস বাংলা কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রপূর্বযুগে একেবারেই বিরল। রামায়ণে বর্ণিত নানা অধ্যায়ের নানা ঘটনাবলীর মধ্যে মেঘনাদের শৌর্যবীর্য, স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অংশটুকুই মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যের বিষয়-বস্তু হিসেবে গ্রহণ করায় তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিল্পচিন্তা সম্পর্কে সংশয় থাকে না। মেঘনাদবধের নায়ক রাম কিংবা লক্ষ্মণ নয়, এমন কি রাবণও নয়, মেঘনাদ। এবং নায়িকা সীতা কিংবা মন্দোদরী নয়, প্রমীলা। এই নির্বাচনশক্তি মধুসূদনের অনন্য শিল্পপ্রত্যয়ের সার্থক দৃষ্টান্ত। রাম এবং রাবণ উভয়েই তাঁর কবিকল্পনায় একই মনুষ্যত্ববোধের উন্মোচনে উদ্ভাসিত। প্রচলিত সংস্কারের অনুসরণে তিনি রামকে দেবতা বলতে যেমন কুণ্ঠিত তেমনি রাক্ষসরাজ রাবণের মধ্যে কাঠগড়ার আসামীর পাপবোধ কিংবা কাপুরুষতার অভিব্যক্তি-চিত্রণে মধুসূদন সমপরিমাণেই পরাঙ্মুখ। অর্থাৎ, নশ্বর মানুষের গুণাগুণে তিনি রাম রাবণের চরিত্রচিত্রণের পক্ষপাতী এবং মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মূল্যবোধগুলির অব্যর্থ টীকাকার-রূপেই মধুসূদনের অন্যতম সিদ্ধি। গ্রীক পুরাণের আদর্শে মধুসূদন মহাকাব্যরচনার উদ্যোগ করলেও বিদেশী আখ্যায়িকার পরিবর্তে স্বদেশীয় পৌরাণিক কাহিনী থেকে বিষয় নির্বাচন করেছেন। অর্থাৎ, প্রসঙ্গ ও উপকরণের মধ্যে, প্রসঙ্গে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ এবং উপকরণে গ্রীক ধ্রুবসাহিত্যের আদর্শ অনুযায়ী বিপুল ও গভীর উদ্যোগ আয়োজন এই উভয় ধরনের সমাবেশ ঘটিয়ে মধুসূদন প্রায় কল্পনাতীত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের চরিত্রে ট্র্যাজিক হিরো বা শোকান্ত নায়কের প্রায় সমস্ত লক্ষণই কমবেশী সুপরিস্ফুট। ব্র্যাডলি (১) ট্র্যাজিক হিরোর যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন, রাবণচরিত্র তদনুযায়ী সার্থক। মধুসূদনের পরিকল্পনায় সীতাহরণ গৌণ ব্যাপার; ভগ্নি শূর্পণখার অপমানে প্রতিশোধস্পৃহার বিমূঢ় অভিব্যক্তি। রাবণচরিত্রে যদি কোনো flaw (খুঁত বা দুর্বলস্থান—ব্র্যাডলি সাহেব শোকান্তিকার উপাদান প্রসঙ্গে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন) থেকে থাকে তাহলে তার অপরিণামজনিত সূত্রপাত যদিও এইখান থেকেই, তবু মেঘনাদবধের ঘটনাবলীর মূল আবর্তের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সামান্য। চতুর্থ সর্গে অশোক-কাননে বন্দিনী সীতা সরমার কাছে এ বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ করলেও অন্যান্য সর্গের বিচিত্র ও মর্মস্পর্শী ঘটনাবলীর পটভূমিকায় এই ঘটনা অনেক পরিমাণেই নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। বস্তুত মেঘনাদবধ কাব্যের শুরুতেই 'অকালে' শব্দটির পরেই যতিপাত যেমন আঙ্গিকের দিক থেকে মির‍্যাক্‌ল্ (miracle) বা আশ্চর্য ঘটনা তেমনি কাব্যগ্রন্থের প্রারম্ভ থেকেই পাঠকমনকে বিষয়ানুগ পরিবেশের মধ্যে দৃঢ়প্রোথিত করার সাফল্যেও মধুসূদনের অতুলনীয় শিল্পাদর্শের পরিচয় নিহিত। প্রথম সর্গের প্রথম দৃশ্যেই বীরবাহুর মৃত্যুজনিত শোকে জননী চিত্রাঙ্গদার আর্ত আবেদন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের হৃদয়ের দুর্বিসহ যন্ত্রণার উল্লেখের মধ্য দিয়ে যে শোকান্তিকার শুরু, মেঘনাদের মৃত্যু ও প্রমীলার নিহত স্বামীর সঙ্গে চন্দনকাঠের চিতায় আরোহণ এই মর্মস্পর্শী ও ভাবগম্ভীর দৃশ্যরচনায়ই পরিকল্পিত মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি। প্রারম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন দৃশ্যবর্ণনায় মধুসূদনের আন্তরিক, বহুব্যাপক উদ্যোগ লক্ষণীয়। বাংলা কবিতাকে মহাকাব্যের অনুবর্তী কিংবা নিকটবর্তী করবার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকেই এই বিরল উদ্যোগের চেতনা ও আয়োজন সম্ভব। মেঘনাদ মধুসূদনের মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক। প্রেমে, অঙ্গীকারে, বীরত্বে, শৌর্যে আদর্শস্থানীয়। আক্রান্ত, পীড়িত জাতি ও সমাজের মহত্তর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুত এই মহাবীর-চরিত্র মধুসূদনের কবিকল্পনার শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে ভূষিত। বাংলা সাহিত্যে, তৎকালীন শিল্পচিন্তায়, এই ধরনের চরিত্রসৃষ্টি প্রায় কল্পনাতীত ঘটনা।

---

(১) SHAKESPEAREAN TRAGEDY : A. C. BRADLEY.

মেঘনাদ স্বদেশরক্ষায় বদ্ধপরিকর, স্বজাতি উদ্ধারের সঙ্কল্পে অটল। তার কাছে, পিতার বহুকথিত কৃতকর্ম, ভিন্নতর দিক থেকে তাৎপর্যময়। রাক্ষসরাজ যে-কাজই করে থাকুন, তার ন্যায্যতা সম্পর্কে মেঘনাদের মনে কোনোই সংশয় নেই। বরং শত্রুবেষ্টিত লঙ্কাপুরীতে শত্রুদলনই তার আশু লক্ষ্য এবং তার জন্যে যে-কোনো উচ্চমূল্য দিতেই সে প্রস্তুত। মেঘনাদের হৃদয় বরাবর বীররসে বিকীর্ণ এবং বীরত্ব ও গৌরববোধ রাক্ষসসমাজের স্বধর্ম। সুতরাং খুল্লতাত হ'লেও দলত্যাগী বিভীষণও তার ক্ষমার অযোগ্য এবং সমগ্র রাক্ষসসমাজের ভর্ৎসনাভাজন। রাক্ষসরাজ রাবণের হৃদয়ে আত্ম-গ্লানির স্পর্শ একেবারেই অনুপস্থিত নয়, কৃতকর্মের শেষ পরিণাম-চিন্তা কোনো কোনো সময়ে সুনিশ্চিতরূপে তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোড়ন এনেছে। ট্র্যাজিক হিরোর অনেক লক্ষণই তার চিন্তা-ভাবনায় প্রতিফলিত। অনেক সময়েই তার উক্তিগুলো সকরুণ ও মর্মস্পর্শী, শোকের তীব্রতায় এবং কিছুটা সম্ভবত অনুতাপের জ্বালায়ও জর্জরিত। পক্ষান্তরে মেঘনাদ সুনিশ্চিতভাবেই সংশয় ও বিলাপের আলোড়ন থেকে মুক্ত। দেবরাজ ইন্দ্রকে যে পরাজিত করেছে রাম বা লক্ষ্মণ সম্পর্কে কোনো ভীতিই থাকতে পারে না তার। মেঘনাদ চরিত্রই চরিত্রচিত্রণে মধুসূদনের অসামান্য লিপিকুশলতার উদাহরণ। (২) পিতার মতো কিন্তু মেঘনাদহৃদয়ে কোনো তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব বা দাহ নেই। পিতা যার ত্রিভুবনবিজয়ী, মাতা স্নেহময়ী সম্রাজ্ঞী এবং পত্নী যার পতিপ্রেমের ঐশ্বর্যে বীর্যবতী তার পক্ষে ভয় বা নৈরাশ্য কিংবা পরাজয় কি বস্তু তা জানবার সুযোগ ছিল না। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে এই চরিত্রচিত্রণ মধুসূদনকে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সাফল্যসোপানের নিকটবর্তী করেছে;

---

(২) এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর নিপুণ বিশ্লেষণ বিস্তারিত উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। "মেঘনাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপ ভীতিশূন্য। পিতা, মাতা, পত্নী, প্রত্যেকের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁহার এই ভীতিশূন্যতা পরিব্যক্ত হইয়াছে। লঙ্কার কালরূপী সমরে সহস্র সহস্র রক্ষবীর নিহত হইতেছিলেন, কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ে সেজন্য উদ্বেগমাত্র ছিল না। বীরাগ্রগণ্য বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং রাক্ষসরাজও বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ে বিস্ময় নাই। বীরবাহু তাঁহার নিকট বালকমাত্র, রামচন্দ্র সেই বালককে নিহত করিয়াছেন, তাহাতে আবার বিস্ময় কি? জননীর নিকট বিদায় গ্রহণের সময়েও তাঁহার এই ভীতিশূন্য ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় নাই। পত্নীর প্রতি তাঁহার সান্ত্বনাবাক্য আরও নির্ভীকতা-ব্যঞ্জক। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ, তাঁহার নিকট শিশুর ক্রীড়ার অধিক নয়।..." আরও একটি গুণের উল্লেখ আছে। মেঘনাদ আততায়ী শত্রুর প্রতিও শিষ্টাচার পরায়ণ।

লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধকালে মেঘনাদের মহত্ত্ব অধিকতর সুপরিস্ফুট। উল্লেখ্য এই যে লক্ষ্মণের শরাঘাতে নয়, তার নিষ্কোষিত অসির আঘাতেই অরিন্দমবলী ইন্দ্রজিৎ ভূতলশায়ী হয়েছিল। মায়াদেবী অদৃশ্যভাবে সমস্ত সময় লক্ষ্মণের শুভার্থিনী। ফলে, দেবমায়ার প্রভাবে মেঘনাদের সম্মুখে দণ্ডধারী যম, শূলপাণি মহাকাল, এবং গদাচক্রধারী বিষ্ণু সমুপস্থিত। ক্ষণকালের জন্যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো যখন মেঘনাদ দেবতাদের সামনে দণ্ডায়মান ঠিক সেই অবসরেই লক্ষ্মণের খড়্গাঘাতেই এই বাসবজয়ী বীর ভূলুণ্ঠিত। নিরস্ত্র শত্রুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ যথার্থ বীরের কাজ নয় বলেই লক্ষ্মণচরিত্রে কাপুরুষতার স্পর্শ এই দৃশ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নিরস্ত্র অবস্থায় অসহায় ও অতর্কিত মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়েই মেঘনাদচরিত্রের অন্তিম মাহাত্ম্য সুপরিস্ফুট।

*

কিন্তু মধুসূদনের শিল্পচিন্তা তৎকালীন শিল্পচিন্তার জগতে যেমন অভিনব তেমনি তাঁর সাফল্যও বিস্ময়কর। ধ্রুবসাহিত্যের আদর্শ তাঁর কাব্যরচনার অনুপ্রেরণা এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের আদর্শেই তাঁর মেঘনাদবধ রচিত, একথার উল্লেখের সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যরচনায় আঙ্গিকের কলাকৌশলের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক সাফল্যের ইতিহাসও সুবিদিত। মেঘনাদবধ কাব্যের অমিতাক্ষর ছন্দের বিন্যাসের তুলনীয় দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে বিরল। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যরচনার উদ্যোগ স্মরণীয় হলেও মধুসূদনের সমপরিমাণ সাফল্য অর্জন তাঁদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ধ্রুবসাহিত্যের ভাব-গম্ভীর ও উদাত্ত পরিবেশ একমাত্র মেঘনাদবধেই শেষ পর্যন্ত অব্যাহত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ঐতিহ্যই এক্ষেত্রে মধুসূদনের অনন্য সাফল্যলাভের সহায়। (৩) দেশী ও বিদেশী ধ্রুবসাহিত্য থেকে মধুসূদন

---

(৩) প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উল্লেখ্য। "মধুসূদন নিজে ইউলিসিসের মত সমুদ্রে ভ্রাম্যমান। সে সমুদ্র জীবন-সমুদ্র; সে সমুদ্র গ্রীক-রোমান ক্ল্যাসিকাল কাব্যের অকূল রহস্যময় সমুদ্র। মধুর কাব্যজীবন এই দুস্তর সমুদ্রের তরঙ্গ-তাড়িত। তাহার এক পারে ভারতবর্ষ—কবিগুরু বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস: আর অপর পারে হোমার, ভার্জিল, মিল্টন; মধুর কাব্য-জীবন এই দুই পারের মধ্যে নিরন্তর পারাপারে নিরত।" (মাইকেল মধুসূদন: পৃ: ২৪)

গ্রহণ করেছেন অকুণ্ঠিতচিত্তে এবং স্বকীয় প্রতিভার আলোকপাতে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁর কাব্যের চরিত্রগুলো এবং পরিবেশ ও দৃশ্যসজ্জা নবজন্ম পরিগ্রহ করেছে। মেঘনাদবধে গ্রীক্ মহাকবি হোমারের মতো নিছক যুদ্ধ-বর্ণনাকে মধুসূদন প্রশ্রয় দেন নি। বরং মিলটনের মহাকাব্যের অনুসরণে একটিমাত্র সর্গে (সপ্তম সর্গ: মেঘনাদ বধ) যুদ্ধের চিত্র তিনি এঁকেছেন। এই ব্যতিক্রম মধুসূদনের মাত্রাজ্ঞান ও পরিমিতিবোধের দৃষ্টান্ত। রাবণ-চরিত্রের প্রতি পক্ষপাত মধুসূদন গোপন করেন নি। People here grumble and say that the heart of the Poet is with the Rakshasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এই চিঠিতেই মধুসূদনের এই পক্ষপাত স্পষ্টতালাভ করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যপাঠে রাবণচরিত্র সম্পর্কে অতএব ভিন্নতর ধারণায় পরিশুদ্ধ হতে হয়। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী রাবণকে যেভাবেই দেখা যাক না কেন, মেঘনাদ-বধের Grand old fellow রাবণ শেষ পর্যন্ত কাব্যপাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। প্রথম সর্গের শুরুতেই রাক্ষসরাজের খেদোক্তি:

"কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

এবং তার কিছু-পরেই:

"হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয় ধন লয় কেহ হরি।"

কাব্যপাঠককে গোড়া থেকেই রাবণচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন

করে রাখে এবং নাটকীয় ধরনের ঘটনাবিন্যাস ও দৃশ্যবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এই চরিত্রের প্রতি পাঠকের পক্ষপাতও যেন স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবেই প্রবল হতে থাকে। মেঘনাদের মৃত্যু যদিও ষষ্ঠ সর্গের বিষয় তবু নবম সর্গ পর্যন্ত এই কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃতি। রাবণচরিত্রের সর্বাঙ্গীণ প্রতিচিত্রণের প্রয়োজনেই সম্ভবত সপ্তম, অষ্টম ও নবম—এই তিনটি অতিরিক্ত অধ্যায়ের অবতারণা। ট্র্যাজিক রিলিফের (tragic relief) প্রয়োজনেও সম্ভবতঃ সপ্তম ও অষ্টম সর্গে বর্ণিত বিচিত্র ঘটনাবলী সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা ছিল। রাম-রাবণের যুদ্ধে দেবগণের অংশগ্রহণ এক অভিনব ঘটনা এবং ইলিয়াডের একবিংশতি সর্গের অনুকরণেই যে সপ্তম সর্গে মধুসূদন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, জীবনচরিতে যোগীন্দ্রনাথ যথাস্থানে তার উল্লেখও করেছেন। নবম সর্গে মেঘনাদপত্নী প্রমীলার চিতারোহণপর্ব রাবণচরিত্রের ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের পরিসরকে বিস্তৃততর করেছে বলা যেতে পারে, সুপরিকল্পিত ঘটনাবিন্যাসে মেঘনাদবধ আদ্যন্ত সুসংহত। "I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done." মধুসূদনের পত্রাবলীর এই অংশ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। এবং অন্য একটি পত্রে : "It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem I mean to give free scope to my inventing Powers (Such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki." এই উদ্ভাবনশক্তির চর্চায় মধুসূদনের বিস্ময়কর সাফল্য একালে প্রায় কিংবদন্তিতেই পরিণত।

*

কাব্যরচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন শুধু নতুন নতুন শব্দই সৃষ্টি করেননি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজস্র সুভাষিত পদাবলীর সৃষ্টিও সম্ভবপর হয়েছে। মধুসূদন বাংলা-ভাষায় শৈশবে তেমন আগ্রহী ছিলেন না বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি শুধু বাংলাভাষাকে আয়ত্তই করেন নি, নতুন নতুন শব্দসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা-ভাষাকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন। মধুসূদনই ঊনবিংশ শতাব্দীর

নবজাগৃতির যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অসামান্য প্রতিভাশালী কবি এবং সম্ভবতঃ তিনিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা কবিতাকে য়ুরোপীয় ধ্রুবসাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে সম্পূর্ণ নতুন ক'রে নির্মাণের পক্ষপাতী। মধুসূদন প্রবর্তিত কাব্যসাহিত্যের ক্রিয়াপদগুলি এখনকার যুগে অচল, কিন্তু তাঁর কবিতার অনেক সুভাষিত পংক্তি বা শব্দ যোজনার কাছে পরবর্তী বিভিন্ন কালের কবিসম্প্রদায় দীর্ঘকাল ঋণস্বীকার করে এসেছেন বলা যেতে পারে। কবিতায় ঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে প্রচুর যুক্তাক্ষরের সার্থক ব্যবহার মধুসূদনের ব্যাপক সাফল্যের অন্যতম নিদর্শন এবং রবীন্দ্রনাথই এদিকে প্রথম বাঙালী কাব্যপাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। (৪) মধুসূদনের অমিতাক্ষর ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও যে প্রেরণা জুগিয়েছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র থেকে শুরু ক'রে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এমন কি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত মধুসূদনের শব্দ-সম্ভারের আকর্ষণ এড়াতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ।

'বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।'

(তৃতীয় সর্গ : মেঘনাদবধ)

'মায়াময় লঙ্কা ধাম, পূর্ণ ইন্দ্রজালে।' (ঐ)

এই ধরনের পংক্তি বিন্যাসে যেরূপ আধুনিক কবিতার সূত্রপাত, অন্যদিকে তেমনি মেঘনাদবধের পাঠভেদ মধুসূদনের ভাষাজ্ঞান ও শব্দপ্রয়োগ কৌশল জ্ঞানের প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত। মধুসূদন যে বরাবরই এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন, রাজনারায়ণ বসু ও গৌরদাস বসাকের এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে লেখা নানা চিঠিপত্রের অংশে তার প্রমাণ উপস্থিত। মেঘনাদবধের পাঠভেদ থেকেও তার দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে।

---

(৪) "...কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য, যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।..." (রবীন্দ্রনাথ : আধুনিক সাহিত্য)

যেমন :

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
১	২২	বিষবৃক্ষ চন্দন বৃক্ষের শোভা ধরে।	সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
	৪৮	ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী।	সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী।
	১২৬	বজ্রাঘাতে, ভূধর অধীর কভু নহে	বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর।
	৩১৯	সভাতলে, নীরবে বসিলা মহামতি	সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
	৩২০	শোকাকুল; পাত্রমিত্র সভাসদ্ আদি	মহামতি, পাত্রমিত্র সভাসদ্ আদি
২	৭	শর্ব্বরী; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ,	শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

এইরূপ আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। (৫) কবিতার অবয়ব পুনর্নির্মাণে ও সংগঠনে মধুসূদনের শিল্পচিন্তা বরাবর কিরূপ প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল তার প্রমাণ উপরের উদ্ধৃতি সমূহে বর্তমান। পক্ষান্তরে মধুসূদনের শব্দসম্ভার থেকে উপযোগী শব্দের নানা ব্যবহার উত্তরকালের এমন কি আধুনিককালের কবিতায় দ্রষ্টব্য। নীচের উদ্ধৃতির সঙ্গে—

আইস মোরা যাই কুঞ্জবনে
সরস কুসুম তুলি, চিকনিয়া গাঁথি
ফুলমালা।··· (মেঘনাদবধ : ৩য় সর্গ)

মোহিতলাল মজুমদারের চতুর্দশপদী কবিতার পংক্তি তুলনীয় :

প্রদীপের তলে বসি'—যুথী যেই করেছ চয়ন
গাঁথো তারে চিকনিয়া, আমি পড়ি পুঁথি মনে মনে—
(শ্রাবণ-শর্বরী)

(৫) দৃষ্টান্তগুলো ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত মধুসূদন গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃত।

মধুসূদনের নিম্নলিখিত পংক্তি-বিন্যাসও উদ্ধৃতি যোগ্য :

ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে
চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদ-নিনাদে !

(মেঘনাদবধ : নবম সর্গ)

এবং মোহিতলালও 'তিতি অশ্রুনীরে' কথাটির ব্যবহার তাঁর কবিতায় বজায় রেখেছেন। অন্যত্র মধুসূদনের কবিতায়

"খুলিলা কাঁচলি ;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর রাশি—
রূপিনী সুর-সুন্দরী।…

যদি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিতায় 'সেখানে প্রতীক্ষারত সুর-সুন্দরীরা' পংক্তি-বিন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাহলে মধুসূদনের কাব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সজীবতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। মধুসূদন 'অনীকিনী' শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন—

দৈব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী,……

(মেঘনাদবধ : সপ্তম সর্গ)

এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়ও

পণে উপবনে পরদেশী অনীকিনী। (নান্দীমুখ)

'অনীকিনী' শব্দটির সুন্দর ব্যবহার লক্ষণীয়।

*

সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে কবি মধুসূদনের যে-প্রতিভার স্বাক্ষর মেঘনাদবধ কাব্যগ্রন্থে পরিস্ফুট, সে কালের শিল্পচিন্তায় তা নিঃসন্দেহে বিপ্লবের নামান্তর। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘনাদবধ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় মধুসূদনের কবিতার ত্রুটিসমূহের আলোচনা ক'রে কাব্যের সাংগঠনিক দুর্বলতার দিকে পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সমগ্র কাব্য-সম্পদের তুলনায় এই বিচ্যুতি যে নগণ্য একথার উল্লেখও তিনি

করেছিলেন। (৬) মেঘনাদবধের পটভূমির বৈচিত্র্য এবং বিশালতা একদিকে যেমন ঘটনাসন্নিবেশে এবং যথোচিত বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহী, অন্যদিকে তেমনি কখনো ক্রোধে ও ক্ষোভে কখনো বিস্ময়বোধ কিংবা করুণরসের ধারায় পাঠক-মন এক বিরল ও মহৎ অনুভূতির মুখোমুখী হয়ে থাকে। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গলের কাব্যস্বাদের সঙ্গে এই নতুন কাব্যানুভূতির স্বাতন্ত্র্য প্রভূত পরিমাণেই নজরে পড়ে এবং সেকালের শিল্পচিন্তায় প্রকৃতিগত এবং আকৃতিগত বিপ্লবের স্বরূপ সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে না। সপ্তম সর্গে বর্ণিত আকাশচারী পক্ষিরাজের মতোই

বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।

মেঘনাদবধ কাব্যগ্রন্থের পাঠকসমাজও ত্রিভুবন এবং ত্রিকালের মহাজাগতিক ঘটনাবলীকে ভয়, বিস্ময়, ক্রোধ ও করুণার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ক'রে বিস্ময়বিমূঢ় হন ; আরিষ্টটল বর্ণিত অনুকম্পা ও ভয়ের (pity and fear) শতবর্ণের ভাবধারায় পাঠকমন রোমাঞ্চিত হতে থাকে। মহাকাব্যের নিকটবর্তী হবার সুযোগ পেয়ে পাঠকসমাজ পরিতৃপ্তি অনুভব করেন।

---

(৬) "...যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়, যাহাতে দেব, দানব, মানব-মণ্ডলীর বীর্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্যকলাপদর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়...তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন ইহার বিচিত্রতা কি !" ভূমিকা।

বীরাঙ্গনা কাব্য : সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয়

মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয়ের অকৃত্রিম সাক্ষ্য 'বীরাঙ্গনা কাব্য'; অন্ততঃ তাঁর সুপরিণত কবি-মানসের সুসংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ বিস্তার এই কাব্যগ্রন্থে নানা দিক থেকেই তাৎপর্যময় একথা উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থ রচনার পূর্বেই প্রায় একই সময়ে 'মেঘনাদবধ' এবং 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হওয়ায় মধুসূদনের কাব্যপ্রবাহের দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাঠকসমাজের সচেতনা স্পষ্টতর উপলব্ধিতে ইতিমধ্যেই পরিণত হয়েছিল। একথা যেমন সত্য যে মেঘনাদবধ রচিত হবার আগে বাংলা সাহিত্যে বীররসের অস্তিত্ব কল্পনাতীত ব্যাপার বলেই পরিগণিত হতো, অন্যদিকে তেমনি মেঘনাদবধের বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও বীররসের জের টেনে কাব্য রচনার মোহ যে মধুসূদনের মতো অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান কবি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বর্জনে সচেষ্ট হয়েছিলেন ব্রজাঙ্গনা কাব্যই তার প্রমাণ। মেঘনাদ-বধের পাশাপাশি বীররস বিষয়ে অভিনব উদ্যম পুনরাবৃত্তি হবে এই ধারণা থেকেই ব্রজাঙ্গনায় গীতিকাব্যের গভীর উৎসকে উন্মোচিত করবার জন্যে মধুসূদন তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রজাঙ্গনায় তাঁর আকাঙ্ক্ষিত গীতি-কাব্যনির্ঝর আশানুরূপ অন্তরঙ্গতায় উৎসারিত হতে পারেনি। বীররস থেকে শান্তরসের দিকে যাত্রা তাঁর পক্ষে খুব সহজসাধ্য হয়নি। মেঘনাদ-বধের রণদামামার গম্ভীর আওয়াজ ব্রজাঙ্গনা কাব্যের শ্রুতিমধুর বংশীধ্বনির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ, অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে মধুসূদনের পক্ষে কাব্য রচনা সম্ভব হলেও উল্লেখিত কবিদের মতো গীতিকাব্যের কোমল রসের গভীরে তলিয়ে যাওয়া তাঁর মতো পাশ্চাত্য ভাবধারায় গভীরতর ভাবে অনুপ্রাণিত সচেতন কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাষাগত দুর্বলতা এবং ভাবগত অসম্পূর্ণতা দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ বিষয়োচিত ভাষাবিন্যাস তখন পর্যন্ত যেন অধিকতর এবং গভীরতর পরীক্ষার মুখাপেক্ষী এবং বৈষ্ণব কবিতার অনুরূপ

ভাব-বৈচিত্র্য ব্রজাঙ্গনায় শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনাদবধের অপ্রত্যাশিত সাফল্য সত্ত্বেও এই ধরনের আরও রচনা পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হতে পারে এই আশঙ্কায় রোমান্টিকতা ও গীতিকাব্যের অবাক্ প্রান্তরে প্রায় একই সময়ে বিচরণ করবার অধীরতা থেকেই ব্রজাঙ্গনা কাব্য লেখা সম্ভব হলেও এবং শূন্য বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাধিকার বিরহ বর্ণনায় কোন কোন ক্ষেত্রে মাধুর্যরসের অভাব না ঘটলেও সমগ্রভাবে এই আদিরসপ্রধান কাব্যের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এইরূপ অবস্থায় বীরাঙ্গনা কাব্যই বরং মধুসূদনের বহুমুখী প্রতিভার অনন্য নিদর্শন এবং যদিও মেঘনাদবধের অভূতপূর্ব সাফল্যই এখনকার দিনেও মধুসূদন প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে পরিগণিত তথাপি বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিত না হলে মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয় সম্পর্কে বিবেচক পাঠক-সমাজের যথোচিত ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হতে পারতো কিনা সন্দেহ।

*

সুতরাং বীরাঙ্গনা কাব্যের যথোচিত আলোচনা সচেতন পাঠকমাত্রেরই অভিপ্রেত। সেকালের এই একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থে নবজাগরণের যুগের মননসাধনার যে-অভিব্যক্তি প্রস্ফুটিত তার তুলনা রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বিরল। উপরন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যের সার্থকতা তার সামগ্রিক ব্যঞ্জনায়, তার অন্তর্নিহিত শিল্প সম্ভাবনায়। এবং এই গ্রন্থের বহিরঙ্গ পরিকল্পনা যদিও ইউরোপীয় ধ্রুব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অনুগামী তথাপি ভাবনায় ও চরিত্র-চিত্রণে এই পত্রকাব্যগুচ্ছের অধিকাংশই সমকালীন স্বদেশীয় ভারতীয় বিচারবোধ, সংস্কার ও সংশয়ের অধিকতর সন্নিকটবর্তী। সুতরাং যাদের ধারণা মধুসূদন চিন্তায় ও আচরণে ইউরোপীয় অনুকরণপ্রিয়তার বলিমাত্র তাদের চোখের সামনে বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যের প্রায় সবগুলি সর্গই ভিন্নতর ব্যাপক অভিজ্ঞতার স্বাদ বহন করে আনবে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন সেই বছরেই মধুসূদন বীরাঙ্গনাকাব্য রচনা করেছিলেন এবং এই পত্রগুচ্ছ প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত। 'বীরাঙ্গনা'য় মধুসূদন পত্রকাব্যের ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেন

* এবং তারা, দ্রৌপদী, জাহ্নবী, জনা, উর্বশীর চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে নারীহৃদয়ের যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যজাত বিচিত্র ভাবাবেগকে উন্মোচিত করেন তার সার্থক উত্তরাধিকার অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের দেবযানী, গান্ধারী, চিত্রাঙ্গদা এবং অনুরূপ চরিত্রচিত্রণের মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ পেয়েছে এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে মধুসূদন যে প্রাচীন রোমক কবি ওভিদের বীরপত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু যথাস্থানে তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত অনুরাগী হয়েও যোগীন্দ্রনাথ মধুসূদনের নৈতিক আদর্শের সমালোচনার পক্ষপাতী এবং সহোদরের প্রতি অনুরাগিনী ক্যানেস কিংবা সপত্নী-পুত্রের প্রেমে নিমজ্জিত ফিড্রা চরিত্র-সৃষ্টির অনুসরণে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রকাব্য রচনার জন্য যোগীন্দ্রনাথের মতো সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জীবনীকারও যখন গভীর অতৃপ্তি অনুভব করেন তখন এ ব্যাপারে মধুসূদনের স্বপক্ষে কিছু বলার থাকতে পারে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। অন্ততঃ এখনকার দিনে অনুরূপ কবি-কল্পনায় সুরুচির বিকৃতি কিংবা গাম্ভীর্যের অবমাননার তর্ক বোধ হয় অবান্তর। মধুসূদন গোড়া থেকেই মহাকাব্য কিংবা পত্রকাব্য রচনার ক্ষেত্রে রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণের চরিত্রগুলিকে আপন কবিস্বভাব ও কবিকল্পনার জারকরসে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির করে গড়েছিলেন। ছন্দ মিল গুণে কবিতা রচনা যে কারণে তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল ঠিক সেই কারণেই এদেশের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত চরিত্রসৃষ্টিতে কোন গতানুগতিক সংজ্ঞা আরোপ খুব সম্ভব তাঁর একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল। এবং এই কারণেই রাবণ, মেঘনাদ বা শূর্পনখা সম্পর্কে মধুসূদনের আরোপিত গুণাবলীর ব্যাখ্যায় দীর্ঘকালের সংস্কার ও অভ্যাসজর্জরিত পাঠকসমাজ চমৎকৃত ও বিস্মিত এবং রাম-লক্ষ্মণ-অর্জুন প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় অপ্রীতিকর কিন্তু অভিনব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

*

ওভিদের পত্রাবলীর সঙ্গে বীরাঙ্গনার রূপকল্পের সাদৃশ্য যতোটা, স্বাতন্ত্র্য সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশী। চরিত্র-চিত্রণে ভাষা-বিন্যাসে ঘটনা সংস্থাপনে মধুসূদনের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। ওভিদের বীরপত্রাবলী পাঠে পত্রকাব্যে কবি-কল্পনার সার্থক বিস্তৃতির প্রসঙ্গ মধুসূদনের মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে বীরাঙ্গনা পত্রগুচ্ছকে সম্ভবতঃ সম্পূর্ণরূপেই মৌলিক বলা যেতে পারে। যদিও ওভিদের আদর্শে পরিকল্পিত একুশটি পত্রকাব্যের স্থলে প্রস্তাবিত গ্রন্থের মাত্র এগারোটি পত্রকাব্যই শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের অবিস্মরণীয় প্রতিভার সাক্ষ্য তথাপি এই এগারোটি পত্রকাব্যেই নবজাগৃতির যুগের বাঙালীর মননসাধনার অমূল্য সম্পদ সংগৃহীত।

বীরাঙ্গনা কাব্যে বর্ণিত নায়িকারা পৌরাণিক কালের নারী। কিন্তু অনুভবে, উন্মোচনে, অভিজ্ঞান ও অভিব্যক্তিতে এই চরিত্রগুলো নবজাগৃতি যুগের প্রাণোন্মাদনার প্রতীক। এই দিক থেকে মধুসূদনের স্বকালের প্রতি পক্ষপাত যতটা সেকালের প্রতি আনুগত্য ততটা নয়। বীরাঙ্গনার নায়িকারা মধুসূদনের মনোজগতে দুর্মর আলোকধারায় সম্পূর্ণরূপেই নূতন করে জন্মেছে। মধুসূদন রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক আখ্যায়িকার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবেই পরিচিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর নিজের কবিস্বভাব অনুযায়ী তিনি নায়িকা নির্বাচনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল যুগোপযোগী কাব্যসৃষ্টি, পৌরাণিক ঘটনাবলীর পদ্যানুবাদ নয়। ফলে, 'সোমের প্রতি তারা' পত্রকাব্যে একদিকে যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রেষ্ঠ কলা-কৌশলের দৃষ্টান্ত অন্যদিকে তেমনি মূল থেকে (সোমদেব ও তারাদেবীর কাহিনীর) বিচ্যুতিরও সার্থক উদাহরণ। মধুসূদনের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ব্যতিক্রম, স্খলন নয়। বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যে বর্ণিত চরিত্রসৃষ্টিতে, পটভূমিকার ব্যাপ্তিতে, দৃশ্যের রম্যতায় এবং নাটকীয় আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চারণে মধুসূদন অনন্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শকুন্তলা, তারা, ভানুমতী, উর্বশী এবং জনা—এই চরিত্রগুলো স্পষ্টতঃই পরস্পরের থেকে বহুল পরিমাণে স্বতন্ত্র এবং জনা বা

ভানুমতী যে-অর্থে বীরাঙ্গনা, শকুন্তলা কিংবা তারাদেবী যে অনুরূপ অর্থে বীরাঙ্গনা নয় তা বলাই বাহুল্য। জনা পুত্রহন্তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর; ভানুমতী স্বামীর অধঃপতনে অমঙ্গল আশঙ্কায় পীড়িতা। পক্ষান্তরে শকুন্তলার আচরণে তপোবনসুলভ নির্মল ভাবাবেগ লক্ষণীয় এবং তারাদেবী স্পষ্টতই নিজের নিষিদ্ধ প্রেমের গভীর আর্তিতে স্পন্দিত। সুতরাং প্রচলিত অর্থে বীরাঙ্গনা নয়, বিশিষ্ট নায়িকার অর্থেই এই ধরনের চরিত্রগুলোকে বীরাঙ্গনা বলা যেতে পারে। পত্রাকার কাব্যে বর্ণিত নারী-হৃদয়ের আলেখ্য একদিকে যেমন পৌরাণিক কালের ঘটনাসংস্থাপনের নৈপুণ্যে, দৃশ্যসজ্জার নিখুঁত প্রতিচিত্রণে, পরিবেশ এবং পরিমণ্ডলের প্রতিভাসে পাঠকমনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে থাকে অন্যদিকে তেমনি পুরুষের প্রভাব থেকে মুক্ত স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে সার্থকতা আনে। প্রকৃত প্রস্তাবে, পৌরাণিক যুগের নারীসমাজের অভিজাত, শিক্ষিত অংশের ধ্যানধারণা, চিন্তা ও কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একালের পাঠকসমাজ অনুমান করতে পারেন মাত্র যেহেতু ইতিহাসের তথ্যসমৃদ্ধকালের সঙ্গে সেকালের ব্যবধান বিস্তর। পক্ষান্তরে মধুসূদনের কবিকল্পনায় যে চরিত্রগুলোর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তাদের প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের নবজাগৃতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব। 'সোমের প্রতি তারা' এবং 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। মধুসূদন এরূপ ক্ষেত্রে স্বকালের চিন্তা ও ভাবনার প্রভাবেই তারা কিংবা জনার চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর ক'রে তুলতে পেরেছেন বলা যেতে পারে।

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!

* * *

কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিণী কিঙ্করী তারারে,

তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে
এসো, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিনী
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!

('সোমের প্রতি তারা')

হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির, হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি প্রভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?

* * *

কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—

(নীলধ্বজের প্রতি জনা)

এক্ষেত্রে অন্তত দুটি বিষয় সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ, তারাদেবীর নারীহৃদয়ে প্রেমের যে আলোড়ন প্রত্যক্ষ করা যায় নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের সঙ্গেই কোথায় যেন তার গভীরতর মিল অনুভূত হবে। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক অর্থে তারাদেবীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে ঠিক বৈধ বলা না গেলেও এই দ্বিচারিণী যে গভীর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়েছে তার জন্যেই সর্বকালের কাব্যপাঠকের সমবেদনা ও শুভেচ্ছায় সে-চরিত্র অভিষিক্ত। এই দিক থেকে মধুসূদনের পত্রকাব্যের কোনো কোনো চরিত্র নিঃসন্দেহেই সেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের অনুগামী এবং সে কারণেই নবজাগৃতির (the

renaissance) গভীরতর মানবিক আবেদনে বিকীর্ণ। আরনল্ড বেনেট একদা যে হৃদয়াবেগের ব্যাখ্যা করেছেন ('Literature does not begin till emotion has begun.') তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বলা যায় মধুসূদন থেকেই শুরু। রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির সারাৎসার মধুসূদনের কবিকল্পনায় যে সর্বদাই গভীর ব্যাপ্তি এনেছিল মিলটনের প্রতি প্রবল পক্ষপাতই তার প্রমাণ। অর্থাৎ, আদর্শের দিক থেকে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ওভিদ্ তাঁর ধ্রুবসাহিত্যজনিত চেতনাকে অনুরঞ্জিত করলেও চরিত্রচিত্রণে সেক্সপীয়র এবং মিলটনের অনুসরণই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেঘনাদবধেই মধুসূদনের চরিত্রচিত্রণ স্পষ্টতা এবং ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। পাত্রপাত্রীর উক্তি এবং পরিবেশ বর্ণনার মধ্যে কবিকল্পনার সার্থক ব্যাপ্তি কাব্যপাঠককে আকর্ষণ করে। এই মহাকাব্যের প্রধান অবলম্বন যদিও সমগ্রভাবে বীররস, তবু বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সর্গে কোমল ও শান্তরসের অনুরণনও দৃষ্টিগোচর হবে। বীরাঙ্গনা কাব্যে মাইকেল মধুসূদনের রসবোধ অধিকতর পূর্ণতা লাভ করেছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ওপর দখলও বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যেমন চরিত্রচিত্রণে অধিকতর উৎকর্ষতা লক্ষণীয় এবং নারীচরিত্রের বিভিন্নমুখী বৈচিত্র্য আশ্চর্য সুষমায় উন্মোচিত অন্য দিকে তেমনি রোমান্টিক চিত্তবৃত্তির অনুগামী রসের ক্ষেত্রও বহুবিস্তৃত। পত্রকাব্যের স্বল্প পরিসরের এক-একটি নারীচরিত্র মানবিক আবেদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্বেলিত। প্রেমে, শপথে, অঙ্গীকারে, ঘৃণায়, আর্তিতে, উদ্বেগে, পূর্ণতায় বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্রগুলো শেষ পর্যন্ত পাঠকমনে গভীরভাবেই রেখাপাত করে।

*

মধুসূদনের কবিতায় গোড়া থেকেই নাটকীয় উপাদানের আধিক্য এবং প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক ক্ষেত্রেই এই নাটকীয় উপাদান তাঁর কাব্যরচনায় অতিরিক্ত আস্বাদ বহন ক'রে এনেছে। মেঘনাদবধে বীররসের ব্যাপ্তির সঙ্গে নাটকীয় উপাদানেরও প্রচুর সমাবেশ ঘটলেও বীরাঙ্গনাকাব্যে পৌঁছে এই নাটকীয় লিপিকুশলতা যেন অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। 'সোমের

প্রতি তারা' 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা' 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী' ইত্যাদি পত্রকাব্য প্রসংগত উল্লেখ্য। নিম্নলিখিত পংক্তিবিন্যাসে নাটকীয় উপাদান এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুরণন যে-কোনো সজাগ পাঠকমনকে নাড়া দিয়ে থাকে :

কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিণী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!

(সোমের প্রতি তারা)

ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে ;
নহে কহ প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন ; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ, ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে!

(লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা)

শুধু প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী নারীর প্রণয়-নিবেদনের মধ্যেই নয়, অন্যত্র বিদ্রূপে, ক্ষোভে, উদ্বেগেও এই নাটকীয়তা বিমূর্ত। নীলধ্বজের প্রতি জনার উক্তিতে, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, এবং দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর আবেদনে এই ক্ষোভ উদ্বেগ ও বিদ্রূপের বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। মধুসূদন তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনায় নাটক রচনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তার ফলেই সম্ভবত পত্রকাব্য রচনার ক্ষেত্রেও এই নাটকীয় সমাবেশ ঘটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। জীবন এবং

অভিজ্ঞতায় ঘনিষ্ঠ হলেই আবেগ সার্থকতা লাভ করে। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের ভাষা মূলত সংস্কৃত সাহিত্যের মুখাপেক্ষী এবং তৎকালীন প্রাকৃত ভাষার অবস্থা সম্ভবত এরূপ ছিল না যার থেকে সৎসাহিত্য রচনার অনু-প্রেরণা পাওয়া যেতো। সুতরাং সাহিত্যের ভাষাগঠন ও ভাষাবিন্যাসের প্রাথমিক কৃতিত্বও মধুসূদনের প্রাপ্য এবং যদিও বর্তমান কালের কবিতার ভাষার সঙ্গে মধুসূদনের সৃষ্ট ভাষার ব্যবধান দুস্তর তথাপি বাংলা সাহিত্যের সেই নব-উন্মেষের যুগে বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের প্রবর্তন এবং নাটকীয় আবেগ সৃষ্টির ব্যাপকতর সাফল্য লাভের জন্যেই মধুসূদন একালের নমস্য।

ভাষা সংগঠনে মধুসূদনের কবিতা পুঁথিগত অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশই সমকালীন জীবনের বোধ ও ব্যাপ্তির মধ্যে, গভীরতর অনুভূতিগুলোর মধ্যে, সঞ্চারিত হয়েছিল। মেঘনাদবধ থেকে বীরাঙ্গনাকাব্যে উত্তরণের মধ্যেই তার নিভৃত প্রমাণ উপস্থিত। মেঘনাদবধের বিরাট সাফল্য এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সে-কাব্যের ভাষায় কোনো কোনো অংশে ভাষাবিন্যাসের দুর্বলতা লক্ষণীয়। ঘটনাসংস্থাপনের বৈচিত্র্যে, বীররসের আধিক্যে এবং সর্বোপরি অভূতপূর্ব নাটকীয় আবেগসৃষ্টিতে ভাষাগত এই দুর্বলতা অনেক পরিমাণেই প্রচ্ছন্ন। কিন্তু বীরাঙ্গনায় মধুসূদন এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর অবচেতন মনে সম্ভবত এই বোধ জেগেছিল যে ভাষাকে ক্রমশই জীবনমুখী করে সংগঠিত করার প্রয়োজন এবং বীরাঙ্গনার ভাষায় সম্ভবত সে কারণেই প্রাকৃত ভাষার উপকরণ সঞ্চারিত হতে শুরু করেছিল। বলা বাহুল্য, মধুসূদনপ্রবর্তিত কাব্যে ভাষা একান্তভাবেই তাঁর অননুকরণীয় প্রতিভা-সৃষ্টি এবং সে ভাষার প্রকৃতি এরূপ স্বতন্ত্র ছিল যে পরবর্তী কালে সে ভাষায় কাব্য রচনার উদ্যোগ আর সফল হয়নি। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ভাষাকে পরবর্তী কালে অধিকতর জীবনানুগ করলেও মধুসূদনের ব্যাপক সাফল্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের আয়ত্তাধীন হয়নি। সুতরাং বলা যেতে পারে, ভাষায় ও ভাবানুসঙ্গে মধুসূদন সেকালের সংশয়াচ্ছন্ন আকাশে বজ্রের মতোই অকৃপণ এবং বাংলা ইতিহাসেও বিস্ময়কররূপে একক। ছন্দোমুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বাধিক ; কিন্তু মধুসূদন এই পথে অগ্রণীর সম্মানের অধিকারী।

মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয় সুদৃঢ় কবিকল্পনার উপরে সংস্থাপিত ও বদ্ধমূল ছিল বলেই মধ্যযুগীয় কবিতার কলাকৌশলকে সম্পূর্ণ বর্জন করেও

তিনি অতুলনীয় সাফল্যের অধিকারী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক জায়গায় বলেছেন: "মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর করেই থামলেন, বুঝলেন না যে ভাষা প্রাকৃত না হলে, প্রকৃত কাব্যরচনা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে এ-কথা নিশ্চয় স্বীকার্য যে ভাষা সম্বন্ধে তিনি কোনো কালেই ঔদাসীন্য দেখাননি। তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিল, এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোষেরই শরণ নিয়ে থাকেন, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত বাংলার ঐকান্তিক দৈন্যও মানতে হবে।" সুধীন্দ্রনাথের এই উক্তি অংশত সত্য যেহেতু মধুসূদনের কাব্যের ভাষা তৎকালীন সমাজের মানুষের মুখের ভাষার নিকটবর্তী হতে পারেনি। কিন্তু মধুসূদন আপন প্রতিভাবলেই নতুন কাব্যভাষার সৃষ্টি করেছিলেন এবং যে-ভাষায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম মেঘনাদবধ এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের মত সৎসাহিত্য সম্ভব হয়েছিল তার সাহিত্যিক গুরুত্ব এরূপ উক্তিতে হ্রাস পায় না। "মাইকেল শুধু ম্রিয়মাণ বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলেই ঝিমিয়ে পড়েননি, বাঙালী কবিকে তরজা-ওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই।" সুধীন্দ্রনাথের একই নিবন্ধের ('ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ') এই পরবর্তী উক্তি বরং সৎপাঠকের বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এরূপ অবস্থায় মধুসূদন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক মূল্য-বিচার ('সাহিত্যচর্চা') সর্বাংশে গ্রাহ্য কিনা সন্দেহ। "মাইকেলের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো যাদুমন্ত্র।"—এছাড়া অন্য গুণাবলী তিনি মধুসূদনের সাহিত্যে খুঁজে পাননি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যগ্রন্থের সমগ্রতার অনুধাবন যদিও সহজসাধ্য নয় তবু সাধারণ কাব্যপাঠক সে-গ্রন্থের চিত্তহারী পদবিন্যাস ও ভাষালাবণ্য সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পান। এবং যে-পাঠক সতর্কতার সঙ্গে বীরাঙ্গনার চরিত্রগুলো বিশ্লেষণের পক্ষপাতী মধুসূদনের কবিকল্পনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবার মতো প্রচুর উপাদান তিনি আবিষ্কার করবেন। এখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পূর্তির পর মাইকেল প্রবর্তিত ভাষা ও ছন্দে নানা বিচ্যুতি আবিষ্কার সম্ভব; কিন্তু মধুসূদন যে-কালে প্রথম মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করলেন তখনকার বাংলা সাহিত্যের গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট অবস্থার কথা মনে রাখলে মধুসূদনের অবদান সম্পর্কে সংশয় থাকে না।

মধুসূদনের চতুর্দশপদী : জীবনবোধের উৎস

জীবনবোধ এবং তজ্জনিত অতৃপ্তির যন্ত্রণা—মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী এই সকরুণ অবস্থার অবিস্মরণীয় সাক্ষ্য। যে-পাঠক চতুর্দশপদী রচনার পূর্বকাল পর্যন্ত মধুসূদনের জীবনালেখ্য ও সৃজনীপ্রতিভার সম্যক পরিচয় রাখে চতুর্দশপদী কবিতাবলী পাঠান্তে এই বিরল কাব্যক্ষমতার অধিকারী কবির কাব্য-জীবনের সম্পূর্ণ ভিন্নতর পর্যায়ের সম্মুখীন ধ্যান-ধারণাকে অনুভব করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে। বস্তুতঃ, নাটক, মহাকাব্য ও পত্রকাব্য রচনার পরেও কোথায় যেন মধুসূদন-প্রতিভা নতুন বাঁকের সন্ধানী এবং সুদূর বিদেশে, প্রায় দ্বীপান্তরিত অবস্থায়, মধুসূদন নতুন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার অলৌকিক হর্মদ্বার অতিক্রম করলেন চতুর্দশপদী রচনাবলীর মধ্যস্থতায়। সুতরাং জীবনের শেষ সাহিত্যসৃষ্টির পর্যায়ে প্রায় একশতটি চতুর্দশপদী কবিতার সবগুলোই সমপরিমাণ শিল্পবিন্যাসের নিদর্শন না হলেও মধুসূদনের পরিণত শিল্পবোধের নিঃসংশয় প্রমাণ অনেকগুলো কবিতায় উপস্থিত; এবং বলতে পারা যায়, বাংলা কাব্যসাহিত্যে সর্বপ্রথম সনেট রচনার প্রবর্তনই যে তিনি করলেন তাই নয়, নিজের জীবনের গভীর অতৃপ্তিবোধসঞ্জাত এক আশ্চর্য অনুভূতির উৎস এই রচনাবলীর গভীরে নিহিত।

সনেট রচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই দুটি বিষয় সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ, পেত্রার্কীয় সনেটের অনুসরণে মধুসূদন যে সনেটরূপের প্রচলন করেছিলেন তার কৌলীন্য অনস্বীকার্য। অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সনেট রচনার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিগোচর হবে বাংলা সনেটের আদি প্রবর্তক মধুসূদনের চতুর্দশপদী সেখানেও রূপ বা ফর্মের দিক থেকে অনন্য। দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্য কি পত্রকাব্য রচনায় তাঁর কবিকল্পনার যে বহু বিস্তৃতি ঘটেছিল সনেটের ক্ষুদ্র পরিসরে তার সংহতি দেখে আশ্চর্য হতে হয়। মেঘনাদবধে কবিকল্পনা স্বেচ্ছাচারী। যেখানে যতটা প্রয়োজন বর্ণনার

বিষয় মহিমায় কবিকল্পনা বহুবিস্তৃত সুদূরপ্রসারী পটে সঞ্চরণশীল। পত্রকাব্যেও এই অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ অব্যাহত। কিন্তু, সনেটের খুব স্বল্প পরিসরে, মাত্র চতুর্দশ পংক্তির আয়তনের মধ্যে, মধুসূদন অনমনীয় সংহতির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন এবং তাঁর উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণের কথা মনে রাখলে, এই নৈপুণ্য বিস্ময়কর। প্রথম যৌবন থেকে পরিণত বয়সে, উচ্ছ্বাস-প্রবণতা থেকে ভাবসংহতির গভীরে, মধুসূদনের কবিমন যে ক্রমশই অগ্রসর হয়ে এসেছে সনেট রচনায় তার দৃষ্টান্ত অবিসংবাদীরূপেই উপস্থিত। সনেটের ফর্ম বা রূপ সম্পর্কে মধুসূদন নিখুঁত ধারণার অধিকারী এবং পেত্রার্কীয় সনেটের আদর্শই যে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল এ উক্তি বাহুল্য। চৌদ্দ পংক্তি ও চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত পংক্তিবিন্যাসের অতি ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে চতুর্দশ-পদীর নির্মাণকার্য যে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো এই বিষয়টি, তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার কথা বিবেচনা করলে, হয়তো বিস্ময়কর নয়। যেমন অমিতাক্ষর ছন্দ কিংবা পত্রকাব্য তেমনই সনেটও বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন প্রতিভার অবদান একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন নবপ্রবর্তিত সনেট রচনায় কী পরিমাণে সাফল্যলাভ করেছিলেন সে-প্রসঙ্গও অনিবার্য। মধুসূদনের চতুর্দশপদী (সনেটের বাংলা প্রতিশব্দরূপে সর্বপ্রথম মধুসূদনই 'চতুর্দশপদী' কথাটির ব্যবহার করেছিলেন) পেত্রার্কীয় সনেটের আদর্শে রচিত হলেও শেষ পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র শিল্পবস্তু। পেত্রার্ক, সেক্সপীয়র কিংবা মিলটনের সনেটের নির্ভরযোগ্য অনুকৃতি মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে অনুপস্থিত। বরং বলতে পারা যায়, সনেটরচনার উৎসমুখ খুলে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত, নির্ঝরের বিচিত্র প্রবাহ ও স্পন্দনের গভীরতাসন্ধান তাঁর তৎকালীন শিল্পপরিকল্পনার বাইরে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, আধুনিক পাঠকের বিবেচনায়, আঙ্গিকের দিক থেকে চতুর্দশপদী কবিতাবলী খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপ্তির অধিকারী নয়। সনেটের মধ্যে ভাবসংহতি ও ভাব-সম্পূর্ণতার যে মণি-কাঞ্চন সংযোগ নিতান্তই কাম্য মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে অনেক ক্ষেত্রেই তার সাক্ষাৎ মেলে না। কয়েকটি কবিতা ভিন্ন অন্যত্র গীতিকাব্যের মূর্চ্ছনা অনুভব করা যায় এবং সার্থক সনেট-রচনার পথে এই অন্তরায় অপসারণের চিন্তা মধুসূদনের ছিল না। কিন্তু স্মরণীয় এই যে, মধুসূদন যে-কালে চতুর্দশপদী রচনায় নিযুক্ত সে-সময়ে বাংলা

ভাষার দৈন্য আত্যন্তিক। সনেটের কঠোর ও সীমাবদ্ধ বন্ধনীর মধ্যে ভাব ও ভাষার সমীকরণে মধুসূদন যথেষ্ট পরিমাণেই সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন বটে কিন্তু বাংলা শব্দকোষের দীনতা ও নগণ্যতা তাঁর কবিকর্মের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বলা যেতে পারে। ভাষা সম্পর্কে মধুসূদনের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ সার্থক ছিল 'কবি-মাতৃভাষা' এবং 'বঙ্গভাষা' কবিতা দুটির তুলনাতেই তাঁর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের চিঠি থেকে জানা যায় ১৮৬০ সালে 'কবি-মাতৃভাষা' সনেটটি মধুসূদন প্রথম রচনা করেন এবং প্রথম অবস্থায় কবিতাটির ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য, তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—'হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?

(কবি-মাতৃভাষা)

মধুসূদন ইংলণ্ডে যাবার প্রায় দু'বছর আগে, সম্ভবত দৃষ্টান্ত হিসেবেই এই চতুর্দশপদী রচনা করেছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ইংলণ্ডে যান এবং প্রধানতঃ আর্থিক বিপদের দরুন সেখান থেকে তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফরাসীদেশে ভার্সাই শহরে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সময়ে সনেট লেখা তিনি শুরু করেন। এখানেই তিনি তাঁর শতাধিক চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেছিলেন এ সংবাদ মধুসূদনের জীবনী পাঠকের

অজানা নয়। কিন্তু, সনেট রচনার ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষায় কোনো আদর্শ, তখন পর্যন্ত মধুসূদনের সামনে না থাকলেও, বাংলা ভাষার আত্মার সন্ধানে তিনি যে কতোটা সজাগ ছিলেন বিদেশী পরিবেশে বাংলা কাব্যসাহিত্য রচনায় তাঁর অসীম অনুরাগ যেমন তার প্রমাণ অন্য দিকে তেমনই প্রথম চতুর্দশপদী রচনার চার বছর বাদে লিখিত 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি তার সাক্ষ্য :

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি,—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি !'
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

(বঙ্গভাষা)

'কবি-মাতৃভাষা' থেকে 'বঙ্গভাষা'য় মধুসূদনের উত্তরণপর্ব অভিনন্দনযোগ্য, বলা বাহুল্য। স্পষ্টই অনুভব করা যায়, কবি-কল্পনায়, ভাষার পরিমার্জনায় এবং সার্থক শব্দবিন্যাসে 'বঙ্গ-ভাষা' কবিতাটি 'কবি-মাতৃভাষা'র উন্নততর রূপান্তর, মধুসূদনের ক্রমবর্ধমান ভাষাজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন যে ভাষার ওপরের স্তরে সংস্কৃতের গাঢ় প্রলেপ থাকলেও, মধুসূদন খাঁটি বাংলা বুলিরও যে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, তার প্রমাণও মেঘনাদবধে রয়েছে। এই খাঁটি বাংলা বুলির বিস্তার চতুর্দশপদী রচনাবলীতেও লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষার ওপর মধুসূদনের অধিকার অর্জন একটি সংহত রূপ নিতে চলেছিল। মধুসূদন দীর্ঘজীবী ছিলেন না,

ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করবার পর্যাপ্ত সুযোগ তাঁর জীবনে আসেনি। দীর্ঘায়ু হলে তাঁর প্রবর্তিত কাব্যভাষাও অধিকতর সুপরিণত রূপ নিতে পারত এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। অন্যত্র সুকুমার সেন মধুসূদনের 'কালিদাস' (৯ নং সনেট) কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ বিষয়ের চতুর্দশপদী কবিতার তুলনা করে তুলনায় মধুসূদনের কাব্যশক্তির সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করলেও একথা অনস্বীকার্য যে মধুসূদনের কাব্যভাষাগঠন ও ভাবসংহতি নির্মাণের কৃতিত্ব তাতে হ্রাস পায় না। মধুসূদনের সনেটের বিভিন্ন পংক্তি উত্তরকালে প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হতে পেরেছিল; মধুসূদনের ভাষার জীবনীশক্তির অনিবার্যতাকেই তা স্মরণ করিয়ে দেয়। নীচের চতুর্দশপদী দৃষ্টান্ত :

সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে!
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিফলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি, "ওরে বাছা না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দির ওই, ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে!"

(যশের মন্দির)

কবিতাটির পরিকল্পনা ও ভাষা-বিন্যাস লক্ষণীয়। কোথাও সংস্কৃত শব্দের গুরুভার নেই; ক্রিয়াপদগুলো ভিন্ন আর প্রায় সমস্ত শব্দ আধুনিক কালের মানুষের মুখের ভাষার অনুবর্তী,—একশত বছরেরও অধিককাল পূর্বের কবিতায় এই ধরনের বিন্যাসকে অতএব অভূতপূর্ব বলতে পারা যায়।

কিন্তু মধুসূদনের সনেটের মহিমা অন্যত্র। কবি-প্রকৃতির স্বরূপসন্ধানে, সনেটের আলোকে বিষয়মাহাত্ম্যের পটভূমিকায় কবিস্বভাব উপলব্ধির চেষ্টার ক্ষেত্রে, চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ভূমিকা একপ্রকার অভ্রান্ত। সনেটগুচ্ছ থেকেই, প্রকৃত প্রস্তাবে, এই অস্থিরস্বভাব কবির নিগূঢ় জীবনবোধকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সহজ। সাহিত্যজীবনের প্রায় শেষের দিকে মধুসূদন ফরাসী দেশে ভার্সাই শহরে বাসকালীন সনেটগুলো লিখেছিলেন। মধুসূদনের জীবনীপাঠকের অবিদিত নয় তখন মধুসূদন অর্থাগম ভাবনায় এবং অর্থসংকটের দরুন কী রকম দুঃসহ অবস্থায় কাল যাপন করছিলেন। ছাত্র-জীবনে, অল্প বয়সে যে তরুণ বিদেশী ভাষায় কাব্যচর্চা এবং বিদেশকেই স্বদেশ হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন পরিণত বয়সে, অনন্যসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যসাধনার পরেও তাঁকেই বিদেশে, সুদূর ফরাসী দেশে, স্বদেশচিন্তায় অভিভূত হতে দেখা যায়। টাকাকড়ির চিরন্তন টানাটানি ফ্রান্সে থাকাকালীন অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নেবার ফলেই বহু দূরবর্তী সমুদ্র-পরপারের স্বদেশ তার পরিপূর্ণ মহিমায় কবির অশ্রুসজল চোখের সামনে উদ্ভাসিত হতে পেরেছিল। ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের চিত্ররূপময়তা বারবার থেকে থেকেই হানা দিয়েছে তাঁর মানসলোকে; ফলে সম্ভব হয়েছিল চতুর্দশপদী কবিতাবলী। স্বদেশের মাটি, আকাশ বাতাস, আলো-নদী-হাওয়া সবই যেন নতুন রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল কবিকল্পনায়। স্বদেশের মানুষ, ফুল-পাখী-লতা সবই যেন নতুনতর তাৎপর্য বহন করে এনেছিল কবির কাছে। বাংলাদেশের ঋতু, দেবদেবী, মহিয়সী মহিলা কিছুই তাঁর তৎকালীন ধ্যানধারণার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারেনি। এই প্রথম, সনেটগুচ্ছ রচনার মধ্য দিয়ে, মধুসূদন যেন তাঁর পর্যাপ্ত জীবনবোধকে কবিতায় সঞ্চারিত করলেন। 'লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে। বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?' এবং অনুরূপ অনেক পংক্তিতে সে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের আভাস মধুসূদনের জীবনবোধেই তার ব্যাপ্তি।

সুদূর বিদেশে, জীবনযাপনের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও ক্লান্তিকর অবস্থায়, মধুসূদন মাতৃভাষায় কাব্যচর্চার মধ্যেই যেন যৎপরোনাস্তি অতৃপ্তি ও গ্লানির হাত থেকে মুক্তির পথকে খুঁজে পেয়েছিলেন। চতুর্দশপদী কবিতা

রূপের (form) দিক থেকে যেমন ভাবসংহতি ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তির সাক্ষ্য অন্যদিকে তেমনই কবিতাগুলোর বিষয়-বস্তুতে আত্মানুসন্ধানের জীবনতৃষ্ণামন্থিত আ ান্তরিক উদ্যোগের স্বাক্ষর। দেশের ভাষা ('বঙ্গভাষা'), দেশের প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্য ('কাশীরাম দাস', 'কৃত্তিবাস', 'জয়দেব', 'কালিদাস' ইত্যাদি সনেটে বিধৃত), রামায়ণ, মহাভারত অনুপ্রাণিত নানা প্রসঙ্গের অবতারণায় কাব্যজনোচিত উৎকাঙ্ক্ষার প্রসার একদিকে যেমন অভিনব অন্যদিকে তেমনই সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিস্বরূপের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধানিবেদনে (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সনেট নং ৭৮ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সনেট নং ৮৬ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য) তাঁর উপলব্ধিপ্রসূত আচরণবোধের স্নিগ্ধতা স্মরণীয়। তাছাড়া, বিদেশে থাকাকালীন স্বদেশের কোনো-কোনো দৃশ্য রচনায়ও তাঁর অসীম পরিতৃপ্তি। 'নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির' তাঁর কবিকল্পনাকে বিদেশ-জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও সতত অনুপ্রাণিত করে এবং 'বউ কথা কও' পাখীর ডাকে কবি-জীবনের সম্মোহনের প্রতিরূপ খোঁজেন। অন্ততঃ, শেষোক্ত দৃষ্টান্তে, একটি সামান্য পাখীর উদ্দেশ্যে আরোপিত প্রতিবেদনে, মধুসূদনের সহজতর প্রকাশভঙ্গির সুন্দর বিন্যাস বর্তমান। মধুসূদনের কাব্য-ভাষা যে ক্রমশই তৎকালীন জীবন্ত মানব-সমাজের মুখের ভাষার নিকটবর্তী হতে চলেছিল অন্য এক প্রসঙ্গে সেকথার উল্লেখ করা হয়েছিল। 'বউ কথা কও' কবিতাটি অনুরূপ মন্তব্যের সাক্ষ্য।

কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে ?—
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ?
তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে ?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে ?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে ?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)

পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী ;
"ক্ষম, প্রিয়ে," এই বলি পড় গিয়া পায়ে !—
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে ॥

পক্ষান্তরে কবিতাটি বিবেকী দ্বিধায় বিচলিত হৃদয়ের সুখ দুঃখের প্রতীক। প্রেমের রাজ্যে শুধুই সন্ধান নয়, শুধুই দুর্বল প্রার্থনার খেদোক্তি নয়, বিশ্বাসে ও পরিপূর্ণ সমর্পণেই যে ভালোবাসা মৃত্যুহীন এই কাব্যলব্ধ অভিজ্ঞতায় কবিতাটি তাৎপর্যময়। মধুসূদনের জীবনে, যৌবনকালে কোনো স্থিরপ্রতিজ্ঞ বিবেচনার অভাবে, জীবনবোধের ক্ষেত্রে যে উৎকেন্দ্রিকতার প্রসার ঘটেছিল পরবর্তীকালে ক্রমশই যে তা সংহত হয়ে উঠেছিল, প্রীতিতে, নিষ্ঠায়, সমর্পণে ভিন্নতর এক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল চতুর্দশপদী কবিতাবলী নিঃসন্দেহে তার প্রমাণ। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে এবং কবি প্রতিভায় যিনি অতুলনীয় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী দৈনন্দিন সংসারে নানা অভাব-অনটনের তাড়নায় তিনিই বিপর্যস্ত হতাশহৃদয় পথিক। মধুসূদনের জীবনে এই দুটি দিকের সমীকরণ সম্ভব হলোনা শেষ পর্যন্ত এবং সনেটগুলো পাঠে এরূপ ধারণা সম্ভব যে মধুসূদন শেষাবধি স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশচিন্তার মধ্যেই বার-বার অবগাহন করে সার্বিক মুক্তিস্নানের পক্ষপাতী।

মার কোল-সম মাগো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রয় আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে ?
কে মোছে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?

(সরস্বতী—৩৩নং সনেট)

এবং ভাবতে অবাক লাগে মাত্র দুটি কবিতা ভিন্ন প্রেম-বিষয়ক কোন সনেট মধুসূদন রচনা করেননি। দুটি কবিতার মধ্যে একটি নিজের স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিবেদিত এবং অন্য কবিতাটি সাগরপারের দূরবর্তিনীর উদ্দেশ্যে বিরচিত। কোনো কবিতাই অবশ্য পুরোপুরি প্রেমের কবিতা নয় (চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ১০০নং কবিতাটি দৃষ্টান্ত) এবং প্রেম-বিষয়ক কবিতারচনার প্রতি অনীহার প্রকৃত কারণ, প্রমথনাথ বিশীর প্রশংসনীয় গবেষণা সত্ত্বেও, খুঁজে বার করা দুষ্কর। শুধু বলতে পারা যায়, সনেট রচনার সময়টা মধুসূদনের ক্ষেত্রে

প্রায় আপদকালীন অবস্থার রূপান্তর এবং প্রেমে উদ্দীপিত হবার মতো মানসিক অবস্থা সে-সময়ে তাঁর না থাকাই সম্ভব। সনেট রচনার ক্ষেত্রে এলিজাবেথীয় যুগ পর্যন্ত প্রচুর প্রেমের কবিতা চতুর্দশপদীরূপে পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। রেণেসাঁসের সময়ে সনেট আগাগোড়াই প্রেম-বিষয়ক। স্পেন্সার, সেক্সপীয়র উদাহরণত উল্লেখ্য। মিলটনের হাতে অবশ্য পরবর্তীকালে বিষয়-বস্তুর ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যে সনেট বৈচিত্র্য সন্ধানী, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমালোচনাও তার অন্তর্ভুক্ত। মধুসূদন, যদি উক্তি থেকে তাঁকে বিচার করা দোষাবহ না হয়, মিলটনের সাহিত্যকীর্তির ছিলেন সর্বাপেক্ষা পক্ষপাতী (Milton is always sublime) অথচ দান্তে, টেনিসন প্রভৃতি কবি মনীষীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সময় মিলটন সম্পর্কে যে তিনি অবহিত হলেন না এবং তাঁর উদ্দেশে একটিও সনেট রচনা সম্ভব হলো না—এই বিষয়টিও কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারে। পেত্রার্কে কিংবা ভিক্টোর হুগোকে তিনি স্মরণ করেছেন অথচ দান্তে সম্পর্কে তাঁর মৌনতা বিস্ময়ের বিষয়। মধুসূদনের কাব্য-সাহিত্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিষয়ের বিস্তৃততর গবেষণা এখন পর্যন্ত ভাবীকালের সমালোচক প্রবরের মুখাপেক্ষী, একথাই শুধু আপাততঃ বলা যেতে পারে। তবু, সবদিক বিবেচনা করলে, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই মধুসূদনের ব্যক্তিস্বরূপ সর্বাপেক্ষা উদ্ভাসিত এবং মধুসূদনের জীবনবোধেরও উৎস, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত।

মধুসূদন : অন্য কবির চোখে

মধুসূদনের অনন্যসাধারণ প্রতিভাসৃষ্ট বাংলা কাব্যসাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে পরবর্তী কালের বিবেকবান কবিসম্প্রদায় যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন তার পর্যালোচনা একালের সাহিত্যচিন্তায় অপরিহার্য। অপরিহার্য এই কারণে যে, বাংলা কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন মধুসূদনের সমতুল্য প্রতিভাবান কবি এখন পর্যন্ত বিরল এবং দেশজ বাক্‌পদ্ধতি ও বিদেশী সাহিত্যরীতির মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়ে তিনি আধুনিক কালের কবিতার যে জন্মান্তর ঘটিয়েছেন তার প্রকৃত মূল্যবিচার কাব্য পাঠকের নিবিড় উপলব্ধির সহায়। উত্তরকালে, অন্য বাঙালী কবির চোখে, মধুসূদনের কবিকর্ম কী ভাবে প্রতিভাত তার আলোচনা প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে অন্য কোনো বাঙালীর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে এতো অধিক পরস্পরবিরোধী কিংবা সমস্যা-সঙ্কুল মূল্যায়ন যেমন দেখা যায় না অন্যদিকে তেমনি মধুসূদনের নায্য পাওনা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে সাধারণত যে-পরিমাণে পরিশ্রমী ও উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয় তারও অভাব দেখে বিস্মিত হতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কি পক্ষে কি বিপক্ষে মধুসূদন সম্পর্কে বক্তব্য বরাবরই সম্ভবত আন্তরিক উদ্যোগের অপেক্ষা রাখে এবং কোনো কিছু না অনুধাবন করেই মধুসূদনপ্রতিভা সম্পর্কে স্তুতি যেমন বিভ্রান্তিকর নিন্দাও তেমনি অনভিপ্রেত। মধুসূদন একদিকে অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভার অধিকারী, অন্যদিকে ছিদ্রান্বেষী মাত্রেই তাঁর কাব্যরচনার এমন অনেক ত্রুটিবিচ্যুতির সন্ধান পেতে পারেন কোনো শক্তিমান কবির লেখায় যে-সব না থাকলেই ভালো ছিল। কিন্তু প্রকৃত কাব্য-বিচার স্তাবক বা ছিদ্রান্বেষীর কর্ম নয়। বরং বলা যেতে পারে একটি সমাহিত সমীকরণ প্রচেষ্টায় শাস্ত্রসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র মধুসূদনের কবিতাবলীর যথোপযুক্ত মূল্যায়নে সমর্থ।

বাঙালী কবিদের অন্যতম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে যে মূলসূত্রসমূহের উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন

উত্তরকালে অপর কয়েকজন শক্তিমান ও শিক্ষিত কবির চিন্তায় স্পষ্টতই সে সম্পর্কে বিচারমূলক বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অথচ মধুসূদন-প্রতিভার যথাযোগ্য মূল্য-বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর সম্পর্কে উত্তরকালের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কবির উক্তিসমূহ খুব ন্যায়সঙ্গতভাবেই পরীক্ষা করা দরকার এবং এই বিভিন্ন রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিজনিত মতামতের স্তূপ থেকে মধুসূদনের শিল্প-চিন্তা ও ব্যক্তিস্বরূপ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও তথ্যানুগ সিদ্ধান্তকে উদ্ধার করার দায়িত্ব প্রত্যেক বিবেকবান কাব্যপাঠকের। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেঘনাদবধের শতবার্ষিকীর বছরেও (১৯৬১) এ-বিষয়ে একালের সমালোচকদের মধ্যে আশানুরূপ উদ্যোগ দেখা যায় নি। মেঘনাদবধের সূচনাকাল থেকেই মধুসূদনের বিরুদ্ধাচারী সমালোচকের অভাব হয়নি। কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রঙ্গলাল এবং ঈশ্বর গুপ্তর মিত্রাক্ষরে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে মেঘনাদবধ প্রকাশের ফলে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। 'ছুছুন্দরী-বধ কাব্য' একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়াশীলদলের অযৌক্তিক বিরোধিতার দৃষ্টান্ত অন্যদিকে তেমনি মধুসূদনের কবিতার সাংগঠনিক দুর্বলতার উল্লেখ করেও সেকালের পণ্ডিত সমাজের অনেকেই শেষ পর্যন্ত মধুসূদন-প্রতিভার মুক্তকণ্ঠ প্রশংসায় উৎসাহী। ঐ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিসমূহ উল্লেখ্য :

(১) "মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের রাজগাম্ভীর্য ও রচনার জমজমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিলটনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' 'নাদিল দম্ভোলি কড়্‌কড়্‌ রবে' ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। গম্ভীর বিষয় বর্ণনাকালে মাইকেল মধুসূদন 'খেদাইনু' 'নাদিলা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়।...কিন্তু এই সকল ও অন্য বহুবিধ দোষ সত্ত্বেও কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি ?" (রাজনারায়ণ বসু)

(২) "...কেহ কেহ কহেন যে, 'মেঘনাদবধ যে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দই তাহার প্রধান কারণ ; মিত্রাক্ষর ছন্দে দুই পঙ্‌ক্তিতেই সমুদয় ভাব শেষ করিতে হয়, সুতরাং বীররসের অনুরূপ ওজস্বিনী রচনা ইহাতে স্থান পায় না—এদিকে অমিত্রাক্ষরে ভাব প্রকাশার্থ যতদূর ইচ্ছা,

ততদূর যাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং আয়তনের স্বল্পতাবশতঃ ক্ষোভ পাইতে হয় না।'—ইত্যাদি।...আমরা অবশ্য বলিব যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের অথবা একটি বিশেষ দল ভিন্ন দেশের কাহারও প্রিয় হয় নাই। আমরা মেঘনাদবধের যে ওরূপ মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা করিলাম তাহা ছন্দের গুণে নহে, কবিত্বের গুণে। ওরূপ অসাধারণ কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে? (রামগতি ন্যায়রত্ন)

(৩) "...মেঘনাদবধ কাব্যে কবির যে সকল ত্রুটি আছে, আমরা তাহা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হই নাই।..কিন্তু সেই সকল দোষ সত্ত্বেও আমরা বলিতে পারি যে ইহা বাঙলাভাষায় মহামূল্য রত্নরূপে চিরদিন সমাদৃত হইবে। কবি ইহাতে যে প্রতিভা এবং মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিলেও ইহা বাঙলাভাষায় যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, কেবল তাহারই জন্য ইহা অমরতা লাভ করিবে।...পাশ্চাত্ত্য সমাজের সংঘর্ষে উদ্বোধিত হইয়া, বঙ্গভূমি আজ যে জাতীয় জীবন লাভের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, মেঘনাদবধের ভাষা তাহারই উপযোগী হইয়াছে। সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে, হৃদয়ে যে ভাব লইয়া উপনীত হওয়া আবশ্যক, মেঘনাদবধ পাঠ করিতে করিতে আমরা অনেক স্থলে সেইভাবে উদ্দীপিত হই। জাতীয় ভাব জাতীয় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। বহু শত বৎসরের পরাধীনতায় নিষ্পেষিত বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও, মধুসূদন যে ইহাতে বীরোচিত ভাষা এবং বীরোচিত ভাব সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমাদিগের জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাপ্রদ।...চিন্তাশীল এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে মধুসূদন বাঙলাভাষাকে কি অমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছেন।..." (যোগীন্দ্রনাথ বসু)

উপরের উদ্ধৃতিসমূহের পটভূমিকায় সম্ভবত এরূপ সিদ্ধান্তই যৌক্তিক যে সেকালের সারস্বত-সমাজ মধুসূদন প্রতিভার মহত্ত্বকে উপলব্ধি করলেও কোনো সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রত্যেক সমালোচকই নিজস্ব সংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য-বিচারে উৎসাহী। ফলে, একজন সমালোচক যেকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মহিমা-কীর্তনে মুখর সেই সময়েই অপর একজন নিছক কবিত্বের জন্যই মেঘনাদবধ কাব্যগ্রন্থে মহৎ উপলব্ধির আস্বাদন অনুভব করেন। আবার কেউ কেউ

কবি-মধুসূদনকে অনন্য প্রতিভাধর কবি মনে করলেও ব্যক্তি-মধুসূদনের জীবনের নানা ঘটনায় সংযমের অভাব মধুসূদন-প্রতিভার অবিমিশ্র স্তুতির অন্তরায় বলে পরিগণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সেকালের এই সমালোচকদের কেউই সম্ভবত অভিসন্ধিপরায়ণ ছিলেন না এবং যথাযোগ্য উদ্যোগ ও অভিনিবেশ সহকারে কাব্যপাঠ না করেই উদ্‌ভ্রান্ত মন্তব্য করবার যে আত্মম্ভরিতা সাম্প্রতিককালে প্রবলতর হতে দেখা যায় এই সমালোচক-সম্প্রদায় সৌভাগ্য-ক্রমে সেই বিচ্যুতি থেকে নিঃসন্দেহেই মুক্ত, বলা বাহুল্য। কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত আদর্শ ও সংস্কারের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না বলেই অনেক স্থিতধী ও বিজ্ঞ সমালোচকও মধুসূদনের রচনার যথোপযুক্ত প্রশংসায় পরাঙ্মুখ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে মেঘনাদবধে রামের চেয়ে রাবণের প্রতি মধুসূদনের পক্ষপাত প্রদর্শিত হওয়ার ফলে তাঁর সুবিখ্যাত এবং অন্যান্য দিক থেকে আন্তরিকতম জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত 'মধুসূদন বিষম ভ্রমে পতিত' হয়েছিলেন বলে মন্তব্য করতে কুণ্ঠিত হননি। অনুমান করা যায় যোগীন্দ্রনাথ বা তৎকালীন অন্যান্য বিবেকবান সমালোচকরা যদি প্রচলিত সংস্কার ও আদর্শের ঊর্ধ্বে উঠতে পারতেন এবং সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যের মাপকাঠির যথাযথ প্রয়োগ সম্ভবপর হতো, হয়তো তাহলে মধুসূদন-প্রতিভা সম্পর্কে অধিকতর উচ্ছ্বসিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম কবিপুরুষরূপে মধুসূদনও নিঃসংশয়চিত্তে তাঁর ন্যায্য পাওনা ও পুরস্কার গ্রহণ করতে পারতেন।

পণ্ডিতদের মধ্যে সাহিত্য-সমালোচকের অভাব নেই এবং নিজে কবি না হয়েও অনেক পণ্ডিত সমালোচক কবিতা ও কাব্যকলা সম্পর্কে আশ্চর্য বিশ্লেষণের অধিকারী। কাব্য-বিচারের নানা পদ্ধতি তাঁদের করায়ত্ত থাকায় কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে পরিশ্রমী বিচার-বিবেচনায় পরাঙ্মুখ হবার কারণ থাকে না। তথাপি, কোনো কবি যখন কাব্য-বিচারে অগ্রণী হন তখন ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁর কাছ থেকে কাব্যপাঠকের ভিন্নতর প্রত্যাশা থাকে। যে বিশেষ যন্ত্রণা বা নিগূঢ় উপলব্ধির ফলে এক-একটি কবিতার জন্ম সম্ভব হয়ে থাকে একজন কবি ভিন্ন অন্য কোনো পেশাদার সমালোচকের পক্ষে—তিনি যতোই পণ্ডিত হোন না কেন—সে সম্পর্কে গভীরভাবে অভিভূত হবার সুযোগ থাকে কিনা সন্দেহ। কোনো কবি যখন অন্য কোনো অগ্রণী কবি সম্পর্কে

মন্তব্য করেন তখন আশা করা অন্যায় নয় যে পণ্ডিত বা পেশাদার সমালোচকের বহুব্যবহৃত মাপকাঠিতে নয় কোনো ভিন্নতর পরাদর্শের পটভূমিকায় সামগ্রিক কাব্য-বিচার সম্ভবপর হবে। সে-কারণেই এলিয়ট যখন ড্রাইডেনের মতো অষ্টাদশ শতকের প্রাচীন কবি কিংবা সমসাময়িক কবি-সুহৃদ এজরা পাউণ্ড সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হন তখন অন্তত এই ভেবে স্বস্তি পাওয়া যায় যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাব্য-বিচার না হয়ে বরং ব্যক্তিগত উপলব্ধির ভিত্তিতে নতুনতর এবং ভিন্নতর বিশ্লেষণেই আলোচ্য কবির সৃজনী প্রতিভার মূল্যায়ন সহজসাধ্য হবে। সুতরাং মধুসূদনের ক্ষেত্রেই হেমচন্দ্র থেকে মোহিতলাল, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে পর্যন্ত কবিদের সাক্ষ্যে গতানুগতিকতাবর্জিত সুস্থির মূল্যায়ন একালের কাব্য-পাঠকেরও প্রত্যাশা এরূপ উক্তি বাহুল্য।

*

মধুসূদনের পরবর্তী কবিদের মধ্যে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত তৎকালীন কাব্য-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক পরিমাণেই বাস্তবানুগ বলা যেতে পারে। মধুসূদনের কবিতার ভাষাদৌর্বল্য পংক্তির পর পংক্তি উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান কবির শিল্পচিন্তা ও মহৎ কবিজনোচিত কল্পনাশক্তি সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে পারেন নি। মেঘনাদবধের কোনো কোনো সর্গের পটভূমির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে চেয়েছেন যে ভাষাবিন্যাসে অনেক সময় ত্রুটি আবিষ্কার সম্ভব হলেও মধুসূদনের কল্পনাশক্তি (Imagination) যে কোন মহৎ কবির উপযুক্ত এবং মহাকাব্যের পরিপোষক। মধুসূদনের কাছে য়ুরোপীয় ধ্রুবসাহিত্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকায় বাংলা কবিতা য়ুরোপীয় সৎসাহিত্যের আদর্শে এই প্রথম পরিশুদ্ধ ও প্রাণময় হতে পেরেছিল। মেঘনাদবধের পরিকল্পনায় মধুসূদন গ্রীক ধ্রুবসাহিত্যের আদর্শ অনুসরণ করলেও স্বদেশের প্রাচীন কাহিনীর পটভূমিকায় সার্থক রসনিবেদনের ক্ষেত্রে মধুসূদন অসাধ্যসাধন করেছেন একথায় হেমচন্দ্রের সমর্থন ছিল অনুমান করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের যুগে বালক রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার বিচারে অনেক পরিমাণে তারুণ্যজনোচিত স্পর্ধায় একদা আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও পরবর্তীকালে পরিণত বয়সের বিচারে তিনি মধুসূদনকে অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভার অধিকারী বলতে কুণ্ঠিত হন নি। যদিও একালের কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মতে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত তারুণ্যের সত্যভাষণ ('মেঘনাদবধ কাব্য কবিত্বের কেরানিগিরি মাত্র, মাইকেল স্রেফ নকলনবিশি ছাড়া আর কিছুই করেননি, এপিকের বিভিন্ন লক্ষণ প্রাচীন সাহিত্য থেকে জেনে নিয়ে অন্ধ অধ্যবসায়ে তার প্রত্যেকটি প্রয়োগ করেছেন' ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসু এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের সমালোচনার সারমর্ম তার 'মাইকেল' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন।) একালেও গ্রহণযোগ্য এবং "পঁচিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজ-নিন্দার প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করলেন 'সাহিত্য-সৃষ্টি' প্রবন্ধে" তথাপি রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় মূল্যায়নই যে প্রকৃত প্রস্তাবে মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর শেষ কথা এই সত্য অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকৃত দ্বিতীয় সমালোচনায় সন্তুষ্ট নন এবং 'শুধু চলতি মতের পুনরুক্তি' ছাড়া এই সমালোচনায় তিনি আর কিছু দেখতে পান না।

কিন্তু একথা স্বীকার করা প্রায় অসম্ভব যে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি পরিণত বয়সে নিছক জনপ্রিয়তার সন্ধানে চলতি মতের পুনরুক্তি করবেন। বরং এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত যে প্রথম সমালোচনায় তারুণ্যজনোচিত স্পর্ধার ভিত্তিহীন লক্ষণগুলো লক্ষ্য করে পরিণত বয়সে তিনি পীড়িত হয়েছিলেন এবং মধুসূদন-প্রতিভার অভূতপূর্ব দীপ্তি ও স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেই নতুন করে পঁচিশ বছর বাদে ভ্রমসংশোধনের সুযোগ গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন নি। সুতরাং ১৩১৪ সালে আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধটিতে কথা-প্রসঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যকর্মের বাস্তবানুগ মূল্য-বিচারের সুযোগ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। এবং তাঁর ভাষায়:

"মেঘনাদবধকাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে

আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যের রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্ম-নিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য ; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে, ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান, ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্ম-বিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল। ..”

উদ্ধৃতি সম্ভবত দীর্ঘ হলো। কিন্তু একালের পরস্পরবিরোধী যুক্তি ও মন্তব্যের পটভূমিকায় মধুসূদনের কাব্য ও কবিকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ মন্তব্যের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থেও প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দে মধুসূদনের অবিস্মরণীয় অবদানের উল্লেখ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের এই যাবতীয় মন্তব্যই যে কেবলমাত্র ‘অগ্রজ-নিন্দার প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা’ এরূপ মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদন-কাব্যের গবেষণায় সর্বাপেক্ষা আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কবি

শ্রীমধুসূদন গ্রন্থ তার প্রমাণ। মোহিতলাল মেঘনাদবধকেই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তিরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং 'মেঘনাদবধের কাহিনী বা বিষয়-বস্তু অপেক্ষা যে কাব্যের অন্তর্নিহিত কবি-স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নেরই আবেগ-সম্ভূত ছন্দধ্বনি এই দুইটিকেই হৃদয়ঙ্গম' করতে হবে।* এই কাব্য ক্লাসিক আদর্শে রচিত হলেও মূল প্রবৃত্তি রোমান্টিক, এ-কথার উল্লেখ করে মোহিতলাল এরূপ মন্তব্যের পক্ষপাতী যে মেঘনাদবধ শেষ পর্যন্ত মহাকাব্য হতে পারেনি, শোকান্তিকার করুণ রসে আর্দ্র হয়েছে বটে কিন্তু মধুসূদনের কবিকল্পনার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এরূপ ব্যতিক্রমের প্রয়োজন ছিল। প্রসঙ্গত, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য এই যে, মহাকাব্যের আদর্শে বৃত্রসংহার রচনার জন্য হেমচন্দ্র প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করলেও এবং কাঠামোর দিক থেকে মহাকাব্যের নিকটবর্তী হলেও মধুসূদনের বহুব্যাপ্ত কবিকল্পনা বৃত্রসংহারে অনুপস্থিত। তাছাড়া, গভীরভাবে সঞ্চারিত যে-মানবিক আবেদন মধুসূদনের মেঘনাদবধে নজরে পড়ে বৃত্রসংহারে তার অংশমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

একদিকে মধুসূদনের সুগভীর কবিকল্পনা অন্যদিকে মানবতাবোধ—মোহিতলালের বিবেচনায় এই দুটি বস্তুই মেঘনাদবধের ব্যাপক সাফল্যের হেতুমূল। মেঘনাদবধের ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এই যে, এই কাব্যগ্রন্থের ভাষা ও ছন্দসঙ্গীত শ্রেষ্ঠ কবিত্ব শক্তির নিদর্শন হলেও যথেষ্ট অনভ্যাসের ত্রুটিও আছে। দেশী ও বিদেশী কাব্যরীতির সমন্বয় সাধনে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও স্বচ্ছন্দ কবিপ্রেরণার সঙ্গে সজ্ঞান অভিপ্রায়ের সংঘর্ষ অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এই সজ্ঞান অভিপ্রায়ের ফলেই কোথাও জবরদস্তি এবং

*'...তিনি মানুষের জন্য কোনও নৈতিক মহত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা দাবী করেন নাই। রাবণ ও মেঘনাদ মানবজীবন-পুষ্পেরই দুই রূপ—একটি ফুটিয়া ওঠা ও অপরটি ঝরিয়া পড়ার। হোমারের মহাকাব্য হইতে তিনি সেই আদিম মানবতার রসপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, বাঙালী কবি কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য হইতে তিনি সেই মানবতার অতি সরল ও সহজ রূপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বাঙালীর সংসার ও বাঙালীর ভাবজীবনে সেই মানবতা যে একটি স্নিগ্ধ-কোমল সরস-শ্যামল শোভায় বিকশিত হইয়াছে, মধুসূদনের কাব্যে তাহার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব আছে, যুদ্ধ বা বীরত্বের বীররস তাহাতে অধিক প্রশ্রয় পায় নাই।...'' (কবি শ্রীমধুসূদন)

"...মেঘনাদবধের ভাষায় যমক-অনুপ্রাসের যে প্রাচুর্য প্রায় সর্বত্র আছে, তাহার কারণ শুধু শব্দালঙ্কার প্রীতি নয়—অব্যর্থ শব্দধ্বনির দ্বারা ভাবের যথাযথ রূপসৃষ্টিও তাহার অভিপ্রায়।..." (ঐ)

কোথাও বা অনাবশ্যক অধীনতা-স্বীকারের দোষ মেঘনাদবধে লক্ষণীয়। "একদিকে য়ুরোপীয় কাব্যভঙ্গির অতিরিক্ত আকর্ষণে কবির সহজ কল্পনাস্রোত তটমৃত্তিকা-স্তূপে আবিল হইয়াছে; অপরদিকে তৎকালের একমাত্র উপযুক্ত পাঠক-সমাজের, সেই সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া ভাষায় ও অলঙ্কার-বিন্যাসে পুরাতন রীতির আতিশয্য ঘটিয়াছে।" তৎসত্ত্বেও, মোহিতলালের বিবেচনায়, এই রীতির দ্বারাই যেমন বাংলা ভাষায় সবলতা সঞ্চার সম্ভবপর হয়েছিল তেমনই সাধু বাংলার ধ্বনি-প্রকৃতি থেকেই খাঁটি ছন্দসঙ্গীত সৃষ্টি হওয়ায় বাংলা কাব্যেরও নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা সহজতর হলো। মধুসূদনের কাব্য-ভাষার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য-ভাষার আপাত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। একালের কাব্য-পাঠক স্বাভাবিকভাবেই মধুসূদনের ভাষাকে প্রাচীন এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে আধুনিক ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে যদিও মধুসূদনের সেই আদর্শের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গণ্য করা যায়, তথাপি বাংলা ভাষায়, আধুনিক কাব্যরসের সহিত প্রথম পরিচয় সাধন করাইয়া দিয়া মধুসূদনই বাঙালী সমাজে যেটুকু রসগ্রাহিতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ছন্দে ও ভাষায় যে খাঁটি কাব্যকলা, এবং উদার স্বাধীন কল্পনায় যে নূতনতর রসবোধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কেহই এমনভাবে তাহা করেন নাই।...' রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণরূপে আধুনিক কিন্তু মধুসূদন সেকালে প্রাচীনকেই যতদূর সম্ভব আধুনিক সাজে সজ্জিত করেছিলেন এবং এইরূপেই আধুনিক কাব্যমন্ত্রে বাঙালীর প্রথম দীক্ষালাভ সম্ভব হয়েছিল।

*

মধুসূদন সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য পক্ষান্তরে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অনুবর্তী। মোহিতলালের মতোই তিনিও মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র প্রাক্‌রবীন্দ্রযুগে একমাত্র মধুসূদনই প্রস্তুত করে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, মধুসূদনের দৃষ্টান্ত (তাঁর সাফল্য এবং বিফলতা) সামনে জাজ্জ্বল্যমান ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ শুরু থেকেই এরূপ নব নব শিল্প-চিন্তায় স্বকীয় প্রতিভাকে নিযুক্ত করতে সহজেই পেরেছিলেন। ভাষা সম্পর্কেও

মধুসূদন ঔদাসীন্য দেখাননি একথার উল্লেখও করেছেন সুধীন্দ্রনাথ। 'তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিলো; এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোষেরই শরণ নিয়ে থাকেন, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত বাংলার ঐকান্তিক দৈন্যও মানতে হবে।' মধুসূদনের পূর্ববর্তীকালের সাহিত্যের পটভূমিকায় মধুসূদনের আবেদন সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তও উল্লেখ্য। '…মাইকেল শুধু ম্রিয়মান বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলেই ঝিমিয়ে পড়েননি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই।…' কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বিবেচনায় 'মাইকেল বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেন না।' এই উক্তির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সুধীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেননি। সম্ভবত তাঁর ধারণায় প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃতজ বাংলা থেকে ভাষানির্মাণের ক্ষেত্রে মধুসূদন শব্দ-উপাদান সমূহের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপলব্ধি করে অগ্রসর হতে পারেননি। সুধীন্দ্রনাথের বিবেচনায় 'ভাষা প্রাকৃত না হলে, প্রকৃত কাব্যরচনা অসম্ভব।' সুতরাং মধুসূদন সংস্কৃত শব্দকোষের শরণ নিয়েছেন দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত হতে হয়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন: 'তবু মাইকেলের সমর্থনে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে ভাষা-সম্বন্ধে তিনি কোনোকালেই ঔদাসীন্য দেখাননি। তখন বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, ভাষা সম্পর্কে মধুসূদনের সমন্বয়সাধনার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। অতএব 'আমি জানি যে তিনি (মধুসূদন) শুধু নিয়ামক হিসাবে অদ্বিতীয় নন, চারিত্র্যগুণের অনটনে তাঁর বিরাট কবি-প্রতিভার অনেকখানি অপ্রকাশিত থাকলেও, তিনি একজন মহাকবি; এবং যতদিন বাংলা কাব্যের অনুকম্পায়ী জুটবে ততদিন তাঁর নামকীর্তনে লোকাভাব ঘটবে না।' সুধীন্দ্রনাথের এই বিবেকসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যের অপর একজন প্রতিনিধিস্থানীয় খ্যাতিমান কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমকালীন হয়েও মধুসূদনের খ্যাতির সঙ্গে মধুসূদনের কীর্তির 'সুমাত্রা-সূত্রের সম্বন্ধ' খুঁজে পান না। বস্তুত বুদ্ধদেব বসুর নিম্নলিখিত ভাষা-বিন্যাসে মধুসূদন-কীর্তি কয়েক মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হবার

উপক্রম হয়: 'আধুনিক বাঙালী পাঠক মাইকেলের রচনাবলী পড়ে এ মীমাংসায় আসতে বাধ্য যে তাঁর নাটকাবলী অপাঠ্য এবং যে-কোনো শ্রেণীর রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অযোগ্য, মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিলে চতুর্দশ-পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমন কি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাঙ্গনা কাব্যেও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে।' এবং তার পরেও রয়েছে: '…মেঘনাদবধ কাব্য হয়ে-ওঠা পদার্থ নয়, একটা বানিয়ে-তোলা জিনিস। আয়োজনের, আড়ম্বরের অভাব নেই, সাজসজ্জার ঘটাও খুব, কিন্তু সমস্ত জিনিসটা আগাগোড়াই মৃত, কোথাও আমাদের প্রাণে নাড়া দেয় না।' এবং এই উক্তিরই আরও ব্যাখ্যা করে বুদ্ধদেব বসু বলতে ইতস্ততঃ করেন না যে মধুসূদনের 'বীর রসে উদ্দীপনা নেই, আদি রসে হৃৎস্পন্দন নেই, তাঁর করুণ রসে দীর্ঘশ্বাস পড়ে না, এবং বীভৎস রস শুধুই বীভৎসতা।' মধুসূদন বাংলা ভাষা জানতেন না, এরূপ মন্তব্য অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শোনায়—একথা স্বীকার করেও বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য এই যে 'বাংলা মাইকেলের মাতৃভাষা হলেও আবাল্য তিনি তাঁকে অবজ্ঞাই করেছেন, কখনো তার মর্মে প্রবেশ করেননি।…মাইকেলের এই বঙ্গভাষাবিজয়ে জেদ যতটা ছিলো, সাধনা ততটা ছিলো না, শক্তির দৌরাত্ম্য যতটা ছিলো, প্রেমের দৌত্য ততটা ছিলো না।' তবে মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাছে বাঙালী কাব্য-পাঠক ঋণী একথার উল্লেখ বুদ্ধদেব বসু যথাস্থানে করেছেন। "মাইকেলের যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিলো 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'র এক ঘেঁয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ-যতির উর্মিলতা।" মধুসূদন যে-সময়ে মেঘনাদবধ কিংবা বীরাঙ্গনা কিংবা সনেটগুচ্ছ লিখেছিলেন সে-সময় পর্যন্ত বাংলাভাষার আত্মাকে তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি, 'সাহিত্যরচনার যে-সব রীতি-নীতি উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রয়োগের অন্তরায় হলো ভাষাকে আত্মীকরণের অক্ষমতা; সাহিত্য-শক্তির যে-বিভিন্ন উপাদানগুলিকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে পরখ করে দেখেছিলেন, যথাযথ মাত্রায় সেগুলির সমন্বয়ের সময়ই হলো না—তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক জীবন বলতে গেলে মাত্রই তো পাঁচ-সাত বছরের।'

বিষ্ণু দে অবশ্য ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে মধুসূদনের কবিপ্রতিভা বিচারের পক্ষপাতী। তৎকালীন সমাজজীবন ও শিল্পচিন্তার পটভূমিকায় মধুসূদনের ভাষাজ্ঞানকে অসামান্য বলতে তিনি কুণ্ঠিত নন। প্রশ্ন করেন : 'কি করে এই প্রায়-বাইরের মানুষ ভাষার প্রকৃতির একেবারে অন্তরের খোঁজ পেলেন ?' এবং এই উক্তির সমর্থনে বিষ্ণু দে-র বক্তব্য :

"...শব্দের পর্যায়ে হয়তো তার উপযুক্ত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য কম ছিল, মাতৃভাষার সেমান্টিকতত্ত্বে হয়তো তিনি যথোচিত কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছিল ভাষার কথনছন্দ, ভাষার দেশজ ব্যবহারের স্মৃতি। আজকে হয়তো আমাদের কানে 'রে' ও 'লো' ব্যবহারের কিঞ্চিৎ আধিক্য অস্বস্তিকর লাগতে পারে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ঐ দুটি তুইতোকারি সম্বোধন বাংলা ভাষার নিজস্ব ধারার যারা বাহক অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যে এবং সাবেকী পুরুষদের মধ্যেও সমধিক প্রচলিত ছিল। ...মাইকেল যে তাঁর অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত পঠনপাঠনের ফলে মাঝে মাঝে রীতিভ্রষ্ট হন সেটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়, স্মরণীয় হচ্ছে বাংলা কথনছন্দের ধ্বনি ও গতি এবং দেশজ বাক্‌ভঙ্গী বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত নিশ্চিতি, মাঝে মাঝে তার বিড়ম্বিত সংস্কৃতপণা সত্ত্বেও।" বিষ্ণু দে মধুসূদনের চিঠিপত্র থেকে তাঁর সাহিত্য-বিচারের কালোত্তীর্ণ পরিণত বুদ্ধির বিষয়ে একালের পাঠকসমাজকে সচেতন করতে সচেষ্ট। মধুসূদনের কবিতার মার্জনাকার্যে তাঁর শুভবুদ্ধি বারবার প্রমাণিত একথার উল্লেখ করেছেন বিষ্ণু দে। এবং 'মাইকেলের কবিতায় অসমতার কারণ নির্দেশ শেষ অবধি পাঠককে কবিতার বাইরে নিয়ে যায়। কেন তাঁর খণ্ড-কল্পনা প্রচণ্ড কাব্যবেগ সত্ত্বেও সংকল্পনায় গঠিত হয় না, সে বিচারের দায়িত্ব নিশ্চয় কবির একলার প্রাপ্য নয়, তাঁর সমাজ, তাঁর যুগও ঐ ভঙ্গিলতার জন্য দায়ী।' উপসংহারে বিষ্ণু দে-র সুচিন্তিত বক্তব্য নিম্নলিখিত রূপ :

'মাইকেল মাতৃভাষায় আত্মগ্লানি মোচন করেন মহাবিদ্রোহের পরেই। শতাব্দীতেও তাঁর প্রতিভান্বিত শিক্ষা আমরা আত্মস্থ করতে পারিনি। অথচ তা যদি করতে পারি, তবেই ফিরবে আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি, রচনা করতে পারব ভবিতব্যতার নিশ্চিত ইতিহাস, আমাদের প্রকৃত রেনেসাঁস। পশ্চিম য়ুরোপের স্বপ্নে আমাদের মুক্তি নেই, না ভাড়া-করা পাপের সন্ধানে, না

অস্মিতার জীবন্মৃত ক্লান্তিতে, না সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশী হাহাকারে।' শেষ কয়েকটি পংক্তির উপর বিশেষ জোর দেবার প্রয়োজনীয়তা বিষ্ণু দে অনুভব করেছেন সম্ভবত সাম্প্রতিককালের তাৎপর্যহীন বিদেশী এবং অতিমাত্রায় সুস্থির চিন্তার বিরোধী ধ্যান-ধারণার উপর অনেক শিক্ষিত বাঙালী-মনের অর্থহীন, অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতাকে লক্ষ্য করেই। প্রতীচ্যের একটা এমন আলাদা সংস্কৃতি ও সভ্যতা রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাসের দুর্গম ও বহুশাখায় প্রসারিত পথ দিয়ে এসেও যার বিলুপ্তি ঘটেনি। মধুসূদনের রচনাবলীকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই শেষ পর্যন্ত বিচার করা আবশ্যক।

মধুসূদন সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন কবির বিভিন্ন উক্তির মধ্যে সঙ্গতি না থাকলেও উদ্ধৃত মতামতগুলো থেকেও মধুসূদনের অবদান সম্পর্কে সুগঠিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব নয়। ব্যক্তি-মধুসূদনের চেয়ে কবি-মধুসূদন বড়ো। এবং মোহিতলাল মজুমদার যখন বলেন যে, মধুসূদন তাঁর কবিকল্পনার মধ্যেই ব্যক্তি-জীবনের ক্ষুদ্রত্ব থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন তখন মন সায় দেয়। যেখানে মধুসূদন কবি সেখানে সংযমের অভাব দেখা যায় না। বিদেশী সাহিত্যের গঠনসৌষ্ঠব এবং স্বদেশী সভ্যতার ঐতিহ্য মধুসূদনের মেঘনাদবধের অন্তর্নিহিত প্রাণ-ঐশ্বর্যের প্রমাণ একথা মেনে নিতে বাধা নেই। সেকালের বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ভাবে ও কল্পনায় কেবল ব্যতিক্রম নয় তাঁর কবিকর্মে যে বাধাবন্ধহীন জগৎ উদ্ভাসিত রবীন্দ্রকাব্য ভিন্ন অন্যত্র বাংলা রচনায় তার তুলনীয় মহৎ সৃষ্টি বিরল। সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে যেখানে তিনি সফল সেখানে তাঁর কৃতিত্ব প্রায় গগনস্পর্শী। যেখানে তিনি ভাষাবিন্যাসে কিংবা শব্দযোজনায় তেমন সতর্ক নন সেখানেও তাঁর উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য। মধুসূদন যেকালে জন্মেছিলেন সে-সময়ে বাংলা ভাষা এমন কিছু সমৃদ্ধ ছিল না; তখনও ভাষা হয়ে ওঠার দিকে, হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে কবিতার ভাষা বলতে আধুনিক প্রকরণের দিক থেকে কিছুই ছিল না বললেই হয়। অনুরূপ অবস্থায় মধুসূদনের কবিতার শব্দ-উপাদান বিরল কৃতিত্বের সাক্ষ্য। মধুসূদন বিলম্বে মাতৃভাষার কাব্যরচনার আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং মাত্র আট বছর বাঙলা কাব্যভাষার

উৎকর্ষসাধনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই অল্পকালেই ভাষার যে সুদৃঢ় ইমারত তৈরী হয়েছিল তাকে লঘু করে দেখবার উপায় নেই। কাব্যের জগতে তৎকালীন শিল্প-চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদন চিত্তগ্রাহী আনন্দলোক সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর কাব্যভাষা গত একশত বছরের বাংলা ভাষার বিবর্তনের পটভূমিকায় একালে প্রাচীন মনে হলেও কবি-কল্পনা এবং রূপকল্পের দিক থেকে মেঘনাদবধ একালেও সযত্ন মনোযোগের দাবি রাখে। মধুসূদন যেকালে জন্মেছিলেন সে-কালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায়ই তাঁকে বিচার করা যুক্তিসঙ্গত এবং পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রতিভাসৃষ্ট সর্বতোমুখী সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তুলনা করে মধুসূদনের রচনাকে ভাষার জাদুঘরে সযত্নে রাখবার মতো মূল্যবান নমুনা বলে মন্তব্য করবার প্রবৃত্তি যখন উত্তরকালের সমালোচককে পেয়ে বসে তখন মানতেই হয় এখন পর্যন্ত বাংলা সমালোচনা একদেশদর্শী এবং ত্রুটিবহুল এবং যুক্তির চেয়ে আবেগের দিকেই এই ধরনের সমালোচকদের পক্ষপাত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ কবি-সমালোচকদের উত্তম নিতান্ত নগণ্য নয় এবং মধুসূদন-সাহিত্য সম্পর্কে সুগঠিত ধ্যানধারণা সেই কারণেই সম্ভব। মধুসূদন সম্পর্কে অতি-পক্ষপাত কিংবা অতি-বিরোধিতা এই উভয় দিকের প্রতিফলন সাম্প্রতিককালে সাহিত্য-বিচারে লক্ষণীয়। ছিদ্রান্বেষীর পক্ষে মধুসূদন-কাব্যে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সর্বদাই সম্ভব একথা মনে রেখে তাঁর সমগ্র সাহিত্যের যুক্তিসুষম ও তথ্যানুগ বিচারও যে করা যেতে পারে কবি-সমালোচকদের সমালোচনায় তার বহু উপকরণ ছড়ানো রয়েছে। খুব সাম্প্রতিক তরুণতর কবিদের কেউ কেউ মধুসূদন-সাহিত্যের নতুন মূল্যায়নে আগ্রহী। আশা করা যায় বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ নতুন আলোচনায় মধুসূদন-প্রতিভার সার্বিক মূল্যায়ন সহজ হবে।

উত্তরকালের চোখে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-প্রতিভা সমগ্রতার প্রতীক, দীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককালের সৃজনশীল কর্মপ্রবাহের মধ্যেই বিচিত্র সমগ্রতার সুপরিস্ফুট স্বাক্ষর নিহিত। রবীন্দ্র-কর্মজগতে আকস্মিকতার চমক অনুপস্থিত; সুদীর্ঘকালের নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনধারায় রবিপ্রতিভার সার্বভৌমতা অন্তর্লীন। সুতরাং উত্তরকালের চোখে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্ররূপে ভাস্বর বহু বিচিত্র উপকরণের জন্য, বিস্ময়, আশ্বাস, ব্যাপ্তি ও পরিপূর্ণতার জন্য; অতএব উত্তরসূরীমাত্রেই তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রশিল্পে, সমাজচিন্তায় সুন্দর, সম্পূর্ণ এমন একটি সর্বতোমুখী প্রতিভা ক্রিয়াশীল যার সামান্যতম ভগ্নাংশকে অবলম্বন করেও পরবর্তীকালের ভাবুক উদ্দীপিত কিংবা অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন কোনো নাটকীয় তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে কখনো আলোড়িত হবার সুযোগ পায় নি। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়ন বা কুমারী-প্রেমের কষাঘাত তাঁর যৌবনবেগকে খণ্ডিত করেনি। জীবনের শেষ কয়েকটি মাস ছাড়া এমনকি অসুখ-বিসুখের শারীরিক ক্লেশও তাঁকে সহ্য করতে হয়নি। আত্মীয়-বিয়োগের ক্লেশ সংসারী মানুষমাত্রেই কোনো না কোনো সময়ে অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথও সে তিমিরনিবিড় যাতনা সহ্য করেছেন একাধিকবার। কিন্তু মাইকেলের জীবন যে-অর্থে নাটকীয় রবীন্দ্র-জীবন সে অর্থে নাটকীয় নয়। রবীন্দ্র-জীবন দৃঢ়বদ্ধ মহীরুহ থেকে বিচিত্র ঐশ্বর্যময় বিস্তৃত বনস্পতি হবার ইতিহাস; সে-ইতিহাস খণ্ডিতভাবে নয়, সমগ্ররূপে প্রকাশমান বলেই মহৎ।

আমার বিশ্বাস পরবর্তীকালের বাঙালী কবিদের অনেকের রবীন্দ্র-মূল্যায়ন আমার উপরোক্ত ধারণার পরিপোষক[১] এবং রবিপ্রতিভা সৃজনশীলতা ও

১ "......কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হ'লেও, কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়; এবং শিল্পের সর্ববিধ বিভাগেই তাঁর সিদ্ধি যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান সুস্পষ্ট। সেই জন্যেই স্বকীয় মণীষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে যে-অভিনব রূপ দিয়েছেন, তার প্রতিভাসে কেবল সুধীসমাজই সমুজ্জ্বল নয়,

সংগঠনশক্তি এই উভয় দিক থেকেই যে সমান সার্থক তার প্রভূত প্রমাণ তাঁর দীর্ঘ আশি বছরের বিচিত্র কার্যাবলীর মধ্যেই নিহিত। রবীন্দ্র-সাহিত্য, চিত্রকলা ও গান একদিকে যেমন তাঁর অলোকসামান্য সৃজনীশীলতায় চিহ্নিত অন্যদিকে তেমনি বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান তাঁর বিরল সাংগঠনিক ক্ষমতার সাক্ষ্য। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম তো বটেই এবং সঙ্গে-সঙ্গে সর্বগ্রাসী বিস্তৃতিরও প্রতীক—যে বিস্তৃতির হাত থেকে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ যে উপাদানসমূহে গঠিত তার একদিকে উপনিষদ অন্য দিকে আন্তর্জাতিক মানবসংহিতা ; প্রাচ্য কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম মোহগ্রস্ত দেশীয় সমাজকে এ বিষয়ে সচকিত করেন যে প্রথা ও ঐতিহ্য বিভিন্ন বস্তু এবং জাতীয় জীবনীশক্তির উৎস দেশ-কালাতিরিক্ত মনুষ্যধর্মে। অথচ, ভাবতে অবাক লাগে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে এদেশীয় পাঠক-সমাজের সচেতনতা ভাবালুতার সমার্থবাচক এবং উপলব্ধির বিপুল গভীরতার বদলে অর্বাচীন উচ্ছ্বাসই দীর্ঘকাল যাবৎ রবীন্দ্রসাহিত্য প্রীতির আন্তরিক নিদর্শনরূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যে সরলতা ও সাবলীলতা বর্তমান তার অনুগামী হওয়াই যে রবীন্দ্রপ্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয়, এই সহজলভ্যতার পাদপীঠে যে মেধা ও মননের, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির, সত্য ও সুন্দরের গভীরতর উৎস নিহিত এ-সত্য উপলব্ধি করার অবকাশ দীর্ঘকালের মধ্যেও মিলেছিল কিনা সন্দেহ।

এরূপ অবস্থায় পরবর্তীকালের কবি সম্প্রদায় রবিপ্রতিভাকে কী ভাবে

অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত ; এবং তাঁর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ যদিও আজ আর তেমন প্রশংসা পায় না, তবু অনেকের মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই তরুণ-সাহিত্যেরও মূলধন।... রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রণীরা যে-সার্বভৌম সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পাননি, সেই কল্পনাবিলাসকে এই পাণ্ডববর্জিত দেশের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ।..."

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : স্বগত

"...বাঙালীর সাধারণ সাহিত্যচিন্তার সঙ্কীর্ণতা থেকে রবিপ্রতিভার সার্বভৌমতা এতই সুদূরে যে তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে হ'লে—অনেকেই আমরা আজ পর্যন্ত গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারি। এটা পরিতাপের বিষয়, কিন্তু বিস্ময়ের নয়, কেননা গুল্মবহুল বাংলা সাহিত্যের এঁদো জমিতে রবীন্দ্র-নাথের অভ্যুত্থান এত বড়োই আশ্চর্য ঘটনা যে তার টাল সামলাতেই আমাদের প্রায় দম ফুরোয়। কার্যত, এই অনন্য বনস্পতির ছায়ায় ব'সেই দিন কাটে আমাদের, মাপজোক নেবার কলকব্জা খুঁজে পাইনা।"

বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্যচর্চা

গ্রহণ করবেন এ চিন্তা যদি কৌতূহল জাগায় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাহিত্যজগতে অতীতকালের অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবির প্রতি পরবর্তীকালের কবির শ্রদ্ধানিবেদন অতি স্বাভাবিক ঘটনা। প্রসঙ্গত সেক্সপীয়রকে নিবেদিত মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং আর্নল্ডের সুপরিচিত কবিতাবলী স্মরণীয়। এই ধরনের কবিতার প্রধানতম প্রতিক্রিয়া যদিচ বিস্ময় তবু নিছক বিস্ময়বোধের অভিব্যক্তিই রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো অফুরন্ত সৃজনীশীল প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সার্থকতম উপায় বলে নির্ধারিত হবে কিনা সন্দেহ। ইংরেজি সাহিত্যে যে ভাবে সেক্সপীয়র-বিস্ময়ের (The Shakespeare Wonder) সূত্রপাত হয়েছিল অনুরূপভাবে 'রবীন্দ্র-বিস্ময়ের' সূত্রপাত হওয়াও স্বাভাবিক। চ্যাপম্যান-অনূদিত হোমার-পাঠে কীটস্‌ও বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিস্ময়-বোধ থেকে উৎসারিত অভিব্যক্তির অসুবিধে এইখানে যে তাতে বিস্ময়ের উৎসের সঙ্গে বিস্মিতের দূরত্ব যে অত্যন্ত বেশী তাও সূচিত হয়ে থাকে। অথচ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক সহজতর করতে হলে এ ধরনের বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠা দরকার; রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবহাওয়ায় আমরা যে শুধু লালিতই নই, আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেও যে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের গভীরতর সংযোগ রয়েছে সে-সত্যও সর্বজনবিদিত। এখনকার দিনে রবীন্দ্র-নাথকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতির সার্থক উত্তরাধিকার যেমন কল্পনাতীত ব্যাপার, অন্যদিকে তেমনি তিনি যে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো অমৃত-লোকের সত্তা নন একথাও মনে রাখা দরকার।

সে-কারণেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বলেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বরাবর 'ভক্তিই পেয়ে গেলেন, শ্রদ্ধা পেলেন না' কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত বড় লেখকের এতদিনকার সহযোগকে আমরা যথেষ্ট উপকারে লাগাতে পারিনি, তাঁর স্বাবলম্বনের দিকে না তাকিয়ে বাঙালী শুধু তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকরণে অসংখ্য শাদা কাগজ অজস্র কালির আঁচড়ে ভরেচে' তখন সে-কথার তীক্ষ্ণতা মনকে স্পর্শ করে তো বটেই আমরা নতুন ক'রে রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কিত সুদীর্ঘ কালের বদ্ধমূল ধারণাগুলোকে যাচাই করতে উৎসাহিত হই।

এদিক থেকে আধুনিককালের প্রবীণ ও তরুণ বাঙালী কবিদের রবীন্দ্র-চিন্তা কতোটা সার্থক তা ভেবে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত

কবিতারচনার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ সেন কিংবা অক্ষয়কুমার বড়ালের মানস-গঠনের সঙ্গে এযুগের প্রবীণ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যেমন দৃষ্টিগোচরযোগ্য অন্যদিকে তেমনি তরুণতর কবিরাও যে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল তারও নানা কাব্যলক্ষণ হাল আমলের কবিতায় সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে কবির জন্মদিন উপলক্ষে সমসাময়িক কবিদের লিখিত কবিতাবলী পাঠে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। অন্তত মৈত্রেয়ী দেবীর জবানীতে জানা যায় যে মংপুতে থাকাকালীন জন্মদিনের কবিতাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁকে একবার বলেছিলেন: "ওই তো কাগজ কলম রয়েছে, চট্ করে 'হে রবীন্দ্র কবীন্দ্র' ব'লে একটা লিখে ফেল না। আমার নামটা ভারি সুবিধের, কবিদের খুব সুবিধে হ'য়ে গেছে। মিলের জন্যে হাহাকার ক'রে বেড়াতে হয় না। রবীন্দ্রের পর কবীন্দ্র লাগিয়ে দিলেই হোলো।…" এই মন্তব্যের ভগ্নাংশও যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে আপন প্রতিভার প্রশস্তিপাঠে অন্তত এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্তি বোধ করতে পারেন নি। জয়ন্তী উৎসর্গ (১৩৩৮) গ্রন্থটিতে অনেক প্রবন্ধের পাশাপাশি যে ক'টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তার কোনো কোনোটিকে মনে রেখেই যদি কবিগুরু ঐরূপ উক্তি ক'রে থাকেন তাহলে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অসীম শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তি নিবেদন করবার জন্যে উচ্ছ্বাস যে অনিবার্য নয়, প্রচুর বিশেষণের প্রয়োগেই যে সর্বদা সার্থক প্রশস্তি রচনা সম্ভব হয়না একথার সত্যতা কুড়ি বছর আগেও গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ ছিল না হয়তো। আর সে-কারণেই জয়ন্তী-উৎসর্গ গ্রন্থে প্রকাশিত প্যারীমোহন সেনগুপ্তর 'রবীন্দ্র-প্রশস্তি' কিংবা সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রর 'প্রশস্তি' অথবা শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের 'রবি-বরণ' আন্তরিক উদ্যোগ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আধুনিক পাঠকমনে রেখাপাত করে না।

সুখের বিষয়, গত কয়েক বছরের মধ্যে রবিপ্রতিভা সম্পর্কে আধুনিক কবিদের মনোভাবের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর সম্ভব হয়েছে; একাধিক কবিতায় রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের সার্থক চিত্ররূপ উন্মোচিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা সার্থকতা লাভ করেছে। 'রবীন্দ্রনাথ ভক্তিই পেয়ে গেলেন, শ্রদ্ধা পেলেন না'—এই অবস্থার প্রতিকার কতকটা সম্ভবপর হয়েছে। 'প্রাণের প্রতি প্রাণের, মনের প্রতি মনের, হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক

টান আছে। ইহাকে বিশেষভাবে সৌন্দর্য বা ঔদার্যের আকর্ষণ বলিতে পারি না। ইহাকে ঐক্যের আকর্ষণ বলা যাইতে পারে।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মনে রেখে বলা যায় ঐক্যের আকর্ষণ অনুভব করেই আধুনিক কবিদের রবিবন্দনা মানুষ রবীন্দ্রনাথের অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছে। এবং আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধানিবেদনের প্রকৃষ্ট উপায় তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার ও তাঁকে নিকটবর্তী ও সমসাময়িক করবার চেষ্টার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। প্রাচীন-কালের শক্তিমান ও অনন্যসাধারণ সাহিত্যিকদের সচরাচর নানা উপমায় বিশেষণে বিভূষিত ক'রে দূর থেকে শ্রদ্ধানিবেদনের যে প্রয়াস পূর্ববর্তীযুগে দৃষ্টিগোচর হয় তার মূলে দায় ও দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা যদি থেকে থাকে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।২

রবিবন্দনায় প্রাচীন পদ্ধতির রেশ দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল কিংবা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় পাওয়া যায়। অক্ষয় বড়ালের কবিতায়—

ফুটিছে হিমাদ্রি শৃঙ্গে হিরণ্য কুসুম !
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর !
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব কুটীর—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম !
অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি !—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি-কবি।

অথবা করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সরস্বতীর অমর তনয়, বারে বারে প্রণাম করি পায়,
চির-নূতন চিত্ত-হরণ তোমার নিমন্ত্রণ,—

[2]"Reverence is often no more than the conventional homage we pay to things in which we are not willing to take an active interest. The best homage we can pay to the great figures of the past, Dante, Titian, Shakespeare, Spinoza, is to treat them not with reverence, but with the familiarity we should exercise if they were our contemporaries. Thus we pay them the highest compliment we can : our familiarity acknowledges that they are alive for us."

—Somerset Maugham.

তৃপ্তি দিবে এমন কিছু, নেই সেবকের পূজার পসরায়,
লও গুরুদেব দক্ষিণা লও শ্রদ্ধা-নিবেদন।

প্রভৃতি স্তবক পাঠকসমাজকে সেদিকেই আকৃষ্ট করে যেখানে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত উল্লেখে ভাস্বর এবং শ্রদ্ধা ও প্রণাম যেখানে হৃদয়াবেগের আতিশয্যে উদ্বেলিত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাও এই হৃদয়াবেগের অনুগামী। যেমন :

বাজাও কবি আলোক-বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয় শতদল সে তুমি ফুটাও সুধাগন্ধে ;
যে ভাবেই উঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলেই আছে
তোমার নামে মেতেছে দেশ, মিলেছে মহানন্দে ॥

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ আধুনিক কাব্যের বার্তাবহ কবিসম্প্রদায় রবি-বন্দনায় উদ্বুদ্ধ হলে দেখা যায় কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সচেতনতা :

ঘরের দেয়ালে টাঙানো কবির
ছবিখানি
পঁচিশে বোশেখে বাইশে শ্রাবণে
টানাটানি।
* * *
শেষ হ'লে পূজা উঠি সাবধানে
ভাঙা টুলে
পুরানো দড়িতে নয়া গিঁঠ বাঁধি
হুকে তুলে।
দেয়ালের ছবি ফিরে সে দেয়ালে,—
মোরা খাই দাই আপন খেয়ালে,
শুকনো ফুলের মালা খুলে নিতে
যাই ভুলে।

(যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

অথবা,

সাঙ্গ করে ফিরে আসি দিবসের নির্লজ্জ সংগ্রাম, পড়ি তব লেখা—
সুমধুর স্বপ্নগুলি শুভ্রপক্ষে নামে চারিধারে, মোছে অশ্রুলেখা।
তোমার কবিতা বন্ধু, জীবনের আতপ্ত ললাটে বুলায় অঙ্গুলি।
আকাশ যে নীলবন্ধু ধরণীর মন্থনের বিষে, সে কথাও ভুলি!

(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

এখানেই প্রথম সমকালীন সমাজ-জীবনের পারিপার্শ্বিকতায় রবীন্দ্রনাথের পরিশুদ্ধ ব্যক্তিস্বরূপের অমৃতসন্ধানী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

যেমন জন্মদিনে তেমনি মৃত্যুর তারিখেও রবীন্দ্রনাথ নব-নব সঙ্কল্পের প্রতীক। এবং ২৫শে বৈশাখ থেকে ২২শে শ্রাবণ প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলোকে স্পন্দিত। পঁচিশে বৈশাখের পরে বাইশে শ্রাবণ নয়, বাইশে শ্রাবণের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরেই ২৫শে বৈশাখ। তাই বিষ্ণু দের ভাষ্য "মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি-আলোয় চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবিকে" এবং প্রত্যহের সচেষ্ট উৎসবে

বছরে বছরে গ'ড়ে যাই জীবনের স্বাধীন বিন্যাস
তোমার বসন্তগানে রক্তরাগে হৃদয়স্পন্দনে
আমাদের দিনের পাপড়িতে, জীবনের ফুলে ফুলে
ভ্রমর গুঞ্জনে নব পল্লব মর্মরে
গড়ে' তুলি আজ কাল শতবর্ষ পরে
আমাদের প্রতিদিন, কবি। (বিষ্ণু দে)

আধুনিক পাঠকহৃদয়কে এতো সচেতনভাবে স্পর্শ করে। বাইশে শ্রাবণ মরণজয়ী প্রাণের সঙ্কল্পে নিরানন্দ, ভঙ্গুর স্বদেশে দীপ্যমান। এই মৃত্যুতিথি বিবর্ণ অন্ধকারের মধ্যেও নবনব জন্মচেতনার স্পন্দনে অনুরণিত। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের :

তুমি শুধু আজ বাইশে শ্রাবণ
আনো জীবনের আকুল প্লাবন
সূর্যের মত জ্বলুক আকাশে অগ্নিজীবন স্মৃতি।
মৃত্যুজয়ের মন্ত্রণা দিক মহৎ জন্মতিথি।

* * *

মুক্ত প্রাণের আগুনে পুড়ুক মরণের সঞ্চিতি।
আমার সাগর-স্বপ্ন জাগাক তোমার মৃত্যুতিথি।

কিংবা অন্যত্র তরুণতর কবির বর্ণনায়—

হারাবে কি? না-না, এই শ্রাবণের সজল কাজল
মেঘে-মেঘে তারই গান, তারই সুর করে টলোমল।
তারই নাম লেখা এই বিদ্যুতের উজ্জ্বল অক্ষরে
শ্রাবণী আকাশে। আর ঝড়ের সেতারে ঝরে পড়ে
তারই সুর। তারই গান অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায়।
তারই কথা ভেসে আসে উতরোল শ্রাবণ-সন্ধ্যায়।

(প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়)

বাইশে শ্রাবণের চিন্তা অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের শপথে অঙ্গীকারে আলোকিত হয়ে উঠেছে। দুঃখের আঁধার রাত্রি, ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্র-মানসলোকের সচেতনতার কথাও এক্ষেত্রে মনে আসে :

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ-কুহক
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে॥

(রবীন্দ্রনাথ : শেষ লেখা)

এবং মৃত্যুলীলার এই অন্ধকারেও রবীন্দ্র-মানসলোকে শেষ নিমেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সকল দেনা শোধ ক'রে বিচিত্র প্রত্যয়ের সজ্জিত প্রান্তরে উত্তরণের বিস্ময় সঞ্চারিত। খুবই পরিতৃপ্তির বিষয়, উত্তরসূরীর চোখেও এই বিস্ময়-বোধ সঞ্চারিত হবার পথে বাধা ঘটে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইয়েটস্-এর স্মৃতিতে নিবেদিত অডেনের কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যেমন বাইশে শ্রাবণের মেঘ-ছলোছলো অঝোর প্লাবন, ইয়েটস্ প্রসঙ্গেও তেমনি তীক্ষ্ণ শীতের জানুয়ারীর তুষার প্রবাহের নির্মমতা :

He disappeared in the dead of winter :
The brooks were frozen, the air-ports almost deserted,
And snow disfigured the public statues ;
The mercury sank in the mouth of the dying day.
O all the instruments agree
The day of his death was a dark cold day.

এবং একথাও স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান যেমন দ্বিতীয় মহাসমরের তাণ্ডবের মধ্যে, তেমনি ইয়েট্স্-এর মৃত্যুও এই বিশ্বযুদ্ধেরই প্রস্তুতিপর্বে (জানুয়ারী, ১৯৩৯)। রোদেনষ্টাইনের মাধ্যমে ইয়েট্স্ সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-কাব্যের আস্বাদ পেলেন। 'আমার সমসাময়িক আর-কোনো ব্যক্তির এমন কোনো ইংরেজি রচনার বিষয় আমি জানিনে যার সঙ্গে এই কবিতাগুলির তুলনা হতে পারে।' রবীন্দ্র-সম্বর্ধনাসভায় এই কথাই ঘোষণা করেছিলেন ইয়েট্স্। দু'জনেই বিবেকবান কবি। পার্থক্য এইখানটায়, জীবনের শেষের দিকে ইয়েট্স্ হতবাক, নিরুৎসুক ; রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সচেতন, সন্ধানী।

পঁচিশে বৈশাখের উৎসব প্রেমের উৎসব, শান্তি ও সমন্বয়ের উৎসব; মানুষের মহত্ত্বকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করার দিন। শান্তিনিকেতন এই উপলব্ধির সহায় ; রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি বোধহয় সে-কারণেই তরুণতর কবিহৃদয়ে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিধর্মী অনুপ্রেরণা জোগায়।

আলাদা লিখন—ছড়া বাঁধে তা'ও
মহারচনার উদার উধাও

আত্মসাতের টানে,
কত প্রেরণার মহাতরঙ্গ খুঁজে বুঝে নিয়ে নিজ প্রসঙ্গ
মানুষে মানুষে ছড়ায় লক্ষখানে।
রব না রব না দূরে আর,
পেয়েছি কবির শান্তিলোকে
মহামিলনের খোলা দ্বার !

(সুনীলচন্দ্র সরকার)

তবে চিত্র অবচেতনার মৌন গুহার গভীরে
অজন্তার থেকে দূর হোক অন্য শিল্পের ভাস্কর্য ;
করুক আনন্দ খেদ ! আলো তার রূপের বলাকা
মেলে দিক দূর নভে প্রজ্ঞার অপূর্ব কারুকার্য ;
সে প্রশান্তি রমণীয়, সুচেতন কবির তিমিরে
আরেক ভাস্কর তুমি, জ্বেলে দাও ক্লান্তির আশ্চর্য ॥

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কিন্তু তার ছবি অন্য ; জীবনে ভ্রূকুটি,
ব্যঙ্গ, কিংবা তীব্র সুরা—অথবা বিকল্প
দর্পণে বীভৎস ছায়া, দূরতম স্মৃতি
যামিনীতে বিপর্যস্ত। নাভি স্নায়ু শিরা
নীল রক্তে স্নাত হবে, বিবসনা নারী
ভাববে যৌবন গেল, জ্বল্‌বে ঈর্ষাতে
মুখ দেখবে চন্দ্রালোকে।

(অরুণ ভট্টাচার্য)

এই ধ্বনি নীলকান্ত মেঘে মেঘে তারার কাকলী,
হৃদয়ের নিশিপদ্মে যন্ত্রণার উন্মীলিত সুখ !
সুরের তরঙ্গ সে কী বিভোর আনন্দে আঁকে ছায়া :
সমুদ্র-মুকুরে দেখি বাসনার প্রিয়তম সুখ।

(মোহিত চট্টোপাধ্যায়)

এটা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত যে রবীন্দ্র তিরোভাবের দীর্ঘকাল পরেই উচ্ছ্বাসবর্জিত পরিশুদ্ধ উপকরণের সংযোগে রবিবন্দনা সহজতর হবে। নীচের স্তবকগুলো থেকে—

আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয়নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম!

(দীনেশ দাস)

যখনই তাকাই তোমার শিরীষে, তোমার বটে
শাখায় শাখায় সুর বেজে ওঠে, পাখীরা গায়
স্নিগ্ধ সলিল ধীরে ধীরে লাগে নদীর তটে।

(শিশিরকুমার দাশ)

রবীন্দ্রনাথ মৌলি পাহাড়, জলপ্রপাত আমি ;
দুঃখ তো আর বলি না ইনিয়ে-বিনিয়ে,
কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি,
রৌদ্দুরে যাই, রৌদ্দুরে যাই মিলিয়ে।

(অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

অন্তত একথা বলা যায় যে রবীন্দ্রচেতনা হাল আমলের কবিদের বিচিত্র-ভাবেই ক্রিয়াশীল ক'রে রেখেছে এবং রবীন্দ্রের সঙ্গে কবীন্দ্রের মিল জুগিয়ে রবি-প্রশস্তির এখন আর কোনো আশঙ্কা নেই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-চিন্তার ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতা যেমন প্রসঙ্গ-প্রকরণের সহযোগ-সন্ধানী, অন্যদিকে তেমনি বহিরাশ্রয়ে, অর্থাৎ, ছন্দে, ভাষায় ও প্রতীকে স্থিতিস্থাপকতা তার কাম্য। রবীন্দ্র-কাব্যের ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে ইদানীং কালের প্রবীন কবিদের কেউ কেউ যেমন রবিবন্দনায় বৈচিত্র্য সঞ্চারে সক্ষম অন্যদিকে তেমনি তরুণতম কবিরাও সচেতনভাবেই ভিন্নতর উপায়ে কাব্য-শরীর সংগঠনে উৎসাহী। নীচের দু'টি উদ্ধৃতি ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে রবীন্দ্ররচনার অনুকৃতি হয়েও সার্থক :

শক্তি এল সত্যের প্রত্যয়ে।
ভোরে উঠে জনে জনে পরম বিস্ময়ে
মহাবাণী, শুভ্রপটে জেনেছে তোমায় মর্মমাঝে
পেয়েছে সত্তার স্পর্শ ; দিনকাজে
বিদ্যালয়, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য সমাজে জাগে ভাষা।
প্রজ্বলন্ত আশা
মধ্যাহ্নে তোমাব ছন্দে গ্রামে গ্রামে নবীন সংগ্রাম
করিছে প্রণাম।

(অমিয় চক্রবর্তী)

আমাবে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ নিখিলে
সন্ধ্যা, ঊষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিনী ;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হ'তে নিলো মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।

(অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

পক্ষান্তরে অতি-সাম্প্রতিক, অতি-তরুণ কবিরাও রবিবন্দনায় বিচিত্র উপাদানের সন্ধানী ; তার কিছু প্রমাণ ইতিমধ্যেই উদ্ধৃত স্তবকগুলোর কোনো কোনোটিতে কাব্যরসজ্ঞ পাঠক খুঁজে পাবেন হয়তো। নিছক উপকরণ নয়, আন্তরিক কাব্যানুভূতির উপরেই এযুগের কবির উদ্যোগ নির্ভরশীল। এই কাব্যানুভূতি (the poetic sense) আধুনিককালের সমালোচকের বিচারে আধুনিক কবিতার আত্মার শরীর। "The poetic sense, in the work corresponds to the poetic experience, in the poet. ...The poetic sense is to the poet what the soul is to man."* এবং সে-কারণেই বোধহয় অতি সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা নিছক ভাবাবেগ বা ছন্দোবৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তিসন্ধানী ;

* T. S. Eliot

নতুনতর এবং ভিন্নতর উপকরণে কবিতার হৃদয়পদ্ম সংগঠনে আন্তরিকভাবেই উৎসাহী।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে তার অনেক লক্ষণ সাম্প্রতিককালের কাব্যশরীরে বর্তমান। তিরিশ বছর আগে 'ঋষি' কথাটি রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে বারবার ব্যবহার করবার রেওয়াজ ছিল। গান্ধিজী প্রবর্তিত 'গুরুদেব' কথাটিও অনুরূপ বহুসম্মানিত ধারণার ও শ্রদ্ধা-নিবেদনের পরিপোষক। কিন্তু এই ধরনের বিশেষণগুলো রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসু পাঠকের নিকটবর্তী করার পথে অন্তরায়, অন্তত: এখনকার দিনে, রবীন্দ্রজীবনীর অজস্র উপকরণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, মনে করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে! শেষ বয়সে, প্রিয়জনদের সঙ্গে নানা লঘু মুহূর্তের হাস্য-কৌতুকের ফাঁকে-ফাঁকে, তিনি এমন মন্তব্য করেছেন যা থেকে মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের ব্যাপক মহিমাকীর্তন চাননি, আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের যথার্থ বিশ্লেষণ। আধুনিক কালে এই বিশ্লেষণ বহুল পরিমাণে সার্থকতা লাভ করেছে বলে আমার ধারণা। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত বাঙালী কবিদের সম্প্রতি প্রকাশিত কবিতা সংকলন পাঠেও এই ধারণা বদ্ধমূল হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের ধারণা সচরাচর মোহপ্রবণ মন্তব্যের মুখাপেক্ষী; অর্থাৎ, যুক্তির তুলনায় বিশেষণের ব্যাপ্তিতে, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তে আবেগপ্রবণতায় তার পক্ষপাত। সম্ভবত সমগ্রভাবে যুগোত্তর কিংবা যুগান্তকারী মনীষার বিস্তর জনপ্রিয়তার মূলে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত অজ্ঞাতসারে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ক্রিয়াশীল। এবং এরূপ অবস্থায় যদি এমন কেউ থাকেন যিনি ভিন্নতর পদ্ধতিতে, যুক্তি ও অনুসন্ধিৎসার নানা উপকরণের সহায়তায় রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্যায়নে উৎসাহী তাহ'লে তাঁর জটিল এবং গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। সেক্ষেত্রে সমালোচকের বক্তব্যের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগের অভাব অনেক সময় অকারণ ও তাৎপর্যহীন বাকবিতণ্ডার হেতুমূল হয়ে থাকে।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর, সশ্রদ্ধ ও পরিশুদ্ধ বক্তব্য একালের সার্থক সাহিত্য-বিচারের সহায় এবং যেরূপ সেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে তেমনি এই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কালপুরুষের প্রতিভা সম্পর্কেও হয়তো আগামী শতবর্ষ ধরেই পাঠকসাধারণের আন্তরিক অনুরাগ ও ঔৎসুক্য অব্যাহত থাকবে। এরূপ পটভূমিকায় রবীন্দ্র-সমালোচনা চর্বিতচর্বণের নামান্তর না হয়ে নব-নব বিশ্লেষণ ও সত্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্তের আলোকে উজ্জ্বলতর এবং সার্থকতর হোক এটাই সাধারণ আকাঙ্ক্ষা এবং উৎকেন্দ্রিক রবীন্দ্রচিন্তাকে ক্রমশ সংহত ও কেন্দ্রানুগ করবার পক্ষেও বোধ হয় একপ্রকার অপরিহার্য।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এযাবৎকাল একদিকে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ যেমন অনেক ক্ষেত্রেই পুনরুক্তিতে, একদেশদর্শিতায় আচ্ছন্ন অন্যদিকে তেমনই এমন দৃষ্টান্ত ইদানীং বিরল নয় যেক্ষেত্রে রবিপ্রতিভা-বিষয়ক আলোচনায় বক্তব্যে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার খাতিরে এবং সম্ভবত অভিনবত্ব সঞ্চারের চেষ্টায় খুব আশ্চর্য-রকমের যুক্তিহীন মন্তব্যের নিপুণ প্রয়োগ অনিবার্য হতে দেখা গিয়েছে। অতএব যখন কেউ-কেউ এরূপ মন্তব্য করেন যে রবিপ্রতিভা একান্তভাবেই প্রতীচ্যের ভাবধারার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ অথবা রবীন্দ্রনাথ সর্বসাকুল্যে

এক ডজন উল্লেখযোগ্য সার্থক কবিতা লিখেছেন তখন এরূপ হঠোক্তির প্রতিবাদে মন সায় না দিয়ে পারে না। এবং তখন এ কথাও মনে না জেগে পারে না যে প্রসঙ্গ ও উপকরণে রবীন্দ্র-চিন্তা এযাবৎকাল যেধরনেরই হোক না কেন নবত্বের নামে যদি উল্লিখিত হঠোক্তি সংস্কৃতিবান লোকের মুখে উচ্চারিত হয় তাহলে এদেশের সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে সম্ভবত মৌন থাকাই সঙ্গত।

অর্থাৎ রবীন্দ্রপ্রতিভার বিচারের ক্ষেত্রে যদি নতুন বক্তব্য প্রকাশের খেয়ালে বাকচাতুর্যকেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত না রেখে স্বাধিকার প্রমত্ততায় দু'চারটি খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা রচনার উপর নির্ভর ক'রে মতামত স্থাপনের ব্যগ্রতা সমালোচককে পেয়ে বসে তাহলে তার পরিণাম শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হতে বাধ্য। এবং অনুরূপ অবস্থায় একথাই মনে হবে যে গতানুগতিক মামুলী চিন্তাধারাই বরং কাম্য তবু নতুন বক্তব্যের নামে এই ধরনের মন্তব্য না গ্রহণ করাই সমীচীন।

উত্তরকালের চোখে এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিচিত্ররূপে স্পন্দিত। তাঁর সাহিত্য, চিত্রকলা ও গান এখন পর্যন্ত জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না ঘটলেও বাংলা সাহিত্য অব্যাহত থাকতো এবং কালক্রমে তার লালন ও পরিবর্ধনও সম্ভব হতো। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ বর্তমান যে-দেশে সেক্সপীয়র কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষার আবির্ভাব সম্ভবপর হয়নি; তথাপি সে-সব দেশের সাহিত্য কালক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অবদান বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের অঙ্গীভূত করেছে বলেই রবিপ্রতিভার মহত্ত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকবার ন্যায়সঙ্গত কারণ থেকে যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে একালের পাঠক সম্প্রদায় যে আন্তরিকভাবে উৎসাহী তার মূলেও কাজ করছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব; রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুধাপানেই শ্রেষ্ঠসাহিত্যের আস্বাদন সম্ভবপর হওয়ায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠসাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেবার উপযুক্ত পরিবেশ এদেশে সৃষ্টি হয়েছে।

আদর্শের দিক থেকে মানবতার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ সমগ্রতার প্রতীক। খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটনাপ্রবাহকে গ্রহণ করবার পরিবর্তে

এই ধরনের ঘটনাসমূহের সামগ্রিক রূপনির্ণয়ের চেষ্টা তাঁর সাহিত্য-জীবনে বিচিত্ররূপে স্ফুটতর হয়েছে। সত্যকে নিঃসংশয়চিত্তে গ্রহণ করবার সাধনায় রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-সাহিত্য বারবার অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাহিত্যে, সমাজচিন্তায়, রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-চিন্তায় এই সাযুজ্যসন্ধানী গভীরতা ক্রিয়াশীল। প্রধানত এই কারণেই রবীন্দ্র-সাহিত্য কোনো বিশেষ কালের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুগমন না করে নিত্যকালের সাহিত্যের অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছে।

উল্লিখিত মন্তব্য অবশ্য এরূপ ধারণার পরিপোষক নয় যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোনো অংশই কালক্রমে ম্লান হবে না অথবা কালের ক্রমবর্ধমান তিমিরেও সে-সাহিত্যের সর্বত্র সহজ আকর্ষণের সূর্যরশ্মি সমানভাবেই প্রতিফলিত হবে। বরং বলা যেতে পারে বিভিন্ন কালের পাঠক সমাজ বিভিন্ন অংশের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করবে এবং এক এক সময়ে অংশত হলেও রবীন্দ্র-সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালীর জাতীয় জীবন সঞ্জীবিত হতে থাকবে। একটি সহজ উদাহরণ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এখনকার দিনে কোন সাহিত্য-সভায় কোনো সাধারণ ব্যক্তিই যখন আর 'দুই বিঘা জমি' কিংবা 'সোনার তরী' অথবা 'মানস সুন্দরী' পাঠ করতে রাজী হন না বরং অপেক্ষাকৃত অনেক পরবর্তীকালের লেখা 'জন্মদিন' কিংবা 'আফ্রিকা' প্রভৃতি কবিতার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন তখন একথা স্বীকার ক'রে নিতে বাধা থাকে না যে সমকালীন সমাজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা এবং ধ্যান-ধারণাই প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন যুগের পাঠক-সমাজের মূল্য-বিচারকে গভীরভাবেই প্রভাবিত করে থাকে। যুগে যুগে পাঠকের চিন্তাধারাও একই রকম থাকে না, কালক্রমে পরিবর্জন ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাতে ভিন্নতর উপলব্ধির নিবিড় স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভিন্নতর অংশের প্রতি তার আকর্ষণ তীব্রতর হ'লে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকে না।

সুতরাং একালের রুচি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির পর্যালোচনা যেমন স্বাভাবিক অন্যদিকে তেমনই রবিপ্রতিভা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি কিংবা চরম উক্তি প্রয়োগের বিড়ম্বনাও অনেক। যদিও একদিক থেকে সাহিত্যিক মাত্রেই কালের পুতুল তবু রবীন্দ্রনাথের মতো বিচিত্রভাবে সুদীর্ঘ কাল ধরে' নবনবরূপে ক্রিয়াশীল প্রতিভার দিগন্তসঞ্চারী

সূর্যালোক আগামী বহুকালপর্যন্ত কাব্যপাঠক ও সংস্কৃতি-পিপাসু চিত্তকে অনুপ্রাণিত করবে এটাই স্বাভাবিক। নিজের জীবিতকালেই কবি তাঁর মূল্যবান রচনার অনেক অংশকে নিজেই বর্জন করেছেন, পূর্ণাবয়ব কাব্য-শরীরের দুর্বল অংশগুলোকে অস্বীকার করার মধ্যে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পরিমিতিবোধের সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থিত। সুতরাং যদি ভবিষ্যতেও তাঁর সুদীর্ঘকালের সাহিত্যসাধনার ফসলের আরো কিছু অংশ অনুভবক্ষমতায় ম্লানতর প্রতিপন্ন হয় তাহলেও আশঙ্কার কারণ নেই, যেহেতু কালের কষ্টিপাথরে নিঃসংশয়রূপে উত্তীর্ণ হবার মতো প্রচুর উপাদান রবীন্দ্র-কলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এক সময়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং বাংলাসাহিত্য সমর্থাবাচক মনে হ'তো, যেহেতু রবিপ্রতিভার প্রভাব সে-সময়ে সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিল। রবিঠাকুরের গান, ছবি, কবিতা, গল্প ও নাটক তখনকার দিনের রুচিমান পাঠক সম্প্রদায়কেও অবাধ আত্মনিমজ্জনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। কিন্তু, বলাবাহুল্য, প্রতিভা যতো বহুমুখীই হোক, একদিন না একদিন তার দৃঢ়বদ্ধ আকর্ষণ হ্রাস পাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে তরুণতরদের সাহিত্য-আন্দোলন আজ থেকে তিরিশ বছরেরও অধিককাল আগেই শুরু হয়েছিল এবং আজকের দিনে এমন আধুনিক সাহিত্যের কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে, চিন্তায় স্বভাবে ও আবেদনে যে-সাহিত্য স্বতন্ত্র পথের সন্ধানী। অর্থাৎ, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঐতিহ্য একদিকে যেমন আধুনিক লেখকের আত্মশক্তি অর্জনের সহায়, অন্যদিকে তেমনই সমকালীন জীবনবোধের (যে-জীবনবোধ রবীন্দ্রযুগে হয়তো ভিন্ন ধরনের ছিল) প্রসার ও ব্যাপ্তির মধ্যেই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির চিন্তা ও অভিজ্ঞতার প্রসার একালের সাহিত্যের লক্ষণীয়।

এখানেই কিছু আশঙ্কার কারণ থেকে যায়। হাল আমলের লেখকদের কৃতিত্বকে বড়ো ক'রে দেখাবার উন্মাদনায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অবদানকে খুব সীমাবদ্ধরূপে বর্ণনা করার বাতুলতা কোনো কোনো আত্মতৃপ্ত সমালোচককে যখন পেয়ে বসে এবং যখন শুধু অর্বাচীন তরুণই নয় বিশেষ শিক্ষাসম্পন্ন প্রবীণও কিছু কিছু অভূতপূর্ব ও মজার বাক্যপ্রয়োগে রবিপ্রতিভার প্রকৃত

অবদানকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের অনুগামী করতে সচেষ্ট হন তখন জ্ঞানপাপীর ভূমিকা সম্পর্কে আর সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে সর্বজনস্বীকৃতির স্বাক্ষর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার ব্যাপ্তি বর্তমান, উত্তরকালের সাহিত্যে এখন পর্যন্ত তার তুলনা বিরল। উত্তরকালের সাহিত্য খণ্ডিত ও প্রতিযোগী উদ্যমে নিয়োজিত হয়েও এযাবৎকাল সীমাবদ্ধভাবেই সার্থক। রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বতোমুখী প্রতিভার আবির্ভাব এযুগে অচিন্ত্যনীয় এবং খণ্ড-খণ্ড রূপে এ যুগের লেখকরা ক্রিয়াশীল। কেউ কেউ কোনো কোনো দিক থেকে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী অতএব অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভা সৃষ্ট সুদীর্ঘকালের সাহিত্যের তুলনায় এখন পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড-খণ্ড উদ্যোগ অত্যন্ত পরিমিতভাবেই সার্থক।

এরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একালের মানুষের ধ্যানধারণাকে সত্যবস্তুর নিকটবর্তীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব এ যুগের সমালোচকের। এই বিরাট ও মহান হিমালয়সদৃশ প্রতিভার মূল্যবিচারে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াসুলভ যে-ধরনের চতুর অথবা উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্য সম্প্রতি কেউ কেউ করেছেন দু'চারদিন বাদেই তার গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে গেছে, বলা বাহুল্য। অথচ রবিপ্রতিভার সঠিক সমালোচনা কিংবা মূল্যায়নই উত্তরকালের সৃজনী সাহিত্যের প্রগতিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এখানে বলা দরকার হাল আমলের ইংরেজী, মার্কিন ও য়ুরোপীয় প্রাদেশিক সাহিত্য ও চিত্রকলার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী সাহিত্যিক ও পাঠক-গোষ্ঠীর পরিচয় যেমন একদিকে আমাদের বিচারবুদ্ধি ও রসোপলব্ধির প্রসার ঘটিয়েছে অন্যদিকে তেমনই সেই অভিজ্ঞতাকেই পুঁজি ক'রে রবিপ্রতিভার মূল্যায়ন করবার উদ্যোগ সফলতা লাভ করবে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ যে-কালের প্রতিনিধি সে-কাল এখন আর নেই, যে-অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মানসীমূর্তির প্রেরণা জুগিয়েছিল সে-অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হবার সুযোগ একালের সমাজচিন্তায় কিংবা সংসার ধর্মে আর নেই একথা স্বীকার ক'রেও বলা যেতে পারে যে উপনিষদ, বাংলার লোকসাহিত্য, বৌদ্ধসাহিত্য, ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা, বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে উড়িয়ে দিয়ে একমাত্র প্রতীচ্যের আলোকে রবীন্দ্রচিন্তা পুনর্নির্মাণের পরিণাম শুভ হবে না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'সূর্যাবর্ত' নিবন্ধে

একবার মন্তব্য করেছিলেন যে দান্তে যেমন "য়ুমা"-র রসানুবাদ ক'রে খৃষ্টান আখ্যা পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি উপনিষদের অনুগত বলে' হিন্দু-সভ্যতারই কবি। যদি তাই হয় তাহলে ইদানীংকালে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতীচ্য সভাতার ফল এরূপ সিদ্ধান্ত পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

অতুলচন্দ্র গুপ্তর একটি মন্তব্য থেকেও রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্তরকালের ঋণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে। "আমাদের সময় English Men of Letters পর্যায়ের অনেক বই অবশ্য-পাঠ্য ছিল। তাতে আমরা দেখতুম যে ইংরেজ লেখক মাত্রই অতি শ্রেষ্ঠ লেখক। যে কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না তিনিও নাকি Failure of a great poet. নিজের বোধ ও রুচি দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার অধ্যাপকেরা কখনও করতেন না। সেটা হ'তো ধৃষ্টতা। ইংরেজী সাহিত্য আমাদের কাছে অনেকটা ছিল কার্জনী আমলের ব্রিটিশ ঔদ্ধত্যের একটা দিক। কলেজের শিক্ষার এই inferiority complex আমাদের চিন্তাকে করেছিল ভীরু ও পঙ্গু, রসবোধকে করেছিল অস্বাভাবিক ও অনুদার। মনের এই দুরবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই যে প্রথম যৌবনে যথার্থ সাহিত্যিক রসে আমাদের মনকে সরস করেছিল কেবল তা নয়, তার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দিক আমাদের মনকে অনুকূল করেছিল। তাঁর সাহিত্যের আলোচনায় আমাদের মনে হ'য়েছিল যে আমরা নিজের মনে সাহিত্য-বিচারের একটি কষ্টিপাথর পেয়েছি যা ইংরেজী পুঁথি থেকে ধার করা নয়, যার দ্বারা সোনাকে সোনা এবং পিতলকে পিতল বলেই চেনা যায়।"

('আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ')

এবং এই উধৃতি থেকে এসত্যও হৃদয়ঙ্গম করা সহজ যে প্রতীচ্যের চিন্তাধারা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে-পরিমাণে তাঁর আয়ত্তে এসেছিল সে-পরিমাণে তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। এশিয়া ও য়ুরোপের মৌলিক বিরোধ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, স্থানীয় সংস্কারের উর্ধ্বে তাই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্বেষণ করা তাঁর পক্ষে এতো অপরিহার্য হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই য়ুরোপের বিবদমান জাতিগুলোর স্বার্থপরতায় যে-নগ্নতা প্রকট হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যে শক্তিমত্ত ইংরেজ বণিক-

শক্তি দুর্বল জাতিকে যে-ভাবে পীড়ন করেছিল (বুয়োর যুদ্ধের ঘটনাবলী উল্লেখ্য) তাতে প্রতীচ্যের কাছে প্রেরণা পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। সম্ভবত সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যের প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেই কালোপযোগী প্রেরণার উৎসসন্ধানে তৎপর ছিলেন। অন্তত তাঁর 'সাহিত্যতত্ত্ব', 'সাহিত্যের তাৎপর্য', 'সাহিত্যধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধ এই দিক থেকে বিচার্য। একই সঙ্গে রবীন্দ্র-চিন্তায় বুদ্ধদেব এবং যিশুখ্রীষ্টের আত্মত্যাগের মহিমা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যিশুখ্রীষ্ট প্রসঙ্গে ম্যারিয়ার চরম আত্ম-নিবেদনের সহজ রূপটি মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধদেব প্রসঙ্গে মনে হয়েছে সুজাতার কথা—যে সুজাতা ভক্তহৃদয়ের অন্ন-উৎসর্গের মধ্যে মাতৃ-প্রাণের সত্যতাকে উন্মোচিত করেছিল।

সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত বোধহয় সঙ্গত যে উত্তরকালের পক্ষে রবীন্দ্রচর্চার প্রয়োজন এখনই নিঃশেষিত হয়নি এবং সে-কারণেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শেষ কথা বা চরম উক্তির মোহ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন এত বেশী। যতোই দিন যাবে ততোই রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালের কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন এটা যেমন স্বাভাবিক তেমনি আশা করা যায় এমন একদিন আসবে যে-সময়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে রবীন্দ্রপ্রতিভার সার্থক ও সামগ্রিক মূল্য-বিচার সহজতর হবে। সেক্সপীয়র সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা তাঁর তিরোধানের বহুকাল পরবর্তী যুগে সম্ভবপর হয়েছে এবং যুক্তি ও বিচার পদ্ধতিতে সার্থকতর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম না হওযাই সম্ভব।

স্বদেশচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটি স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।" (জীবনস্মৃতি)।

এই স্বদেশপ্রেমের অন্যতম নিদর্শন মাতৃভাষার প্রতি ঠাকুর পরিবারের সুগভীর অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথের যে-কালে জন্ম সে-সময়ে ইংরেজি শিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং ইংরেজ রাজত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশী ভাবধারা বাঙালী জীবনকে ভিন্নতর আদর্শের সন্ধান দিয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করলেও শিক্ষিত বাঙালী-সমাজের অধিকাংশই দেশের ভাষা ও দেশের ভাবের অনুগামী ছিলেন না। কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মাতৃভাষার চর্চা রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব থেকেই অব্যাহত ছিল। মাতৃভাষার প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিবিড় অনুরাগ সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ জীবনস্মৃতিতে রয়েছে: "আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

হিন্দুমেলাকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার স্ফুরণ হয়েছিল। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি মেলায় পাঠ করবার প্রয়োজনে তাঁকে লিখতে হয়। তারও বছর দু-তিন আগে থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়ায় বালক রবীন্দ্রনাথের জাতীয় চেতনা ও সাহিত্য-প্রীতি একই সঙ্গে পুষ্টতর হতে পেরেছিল। হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন: "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার

কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" স্বদেশে দেশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন, কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সেকালের স্বদেশচিন্তার অঙ্গীভূত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম সেখানে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে তাঁর সচেতনতা আসতে থাকে। পরবর্তীকালে এই শান্তিনিকেতন বিশ্ববীক্ষার প্রাণকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়েছে। উপনিষদ ও প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ন শান্তিনিকেতন আশ্রমের কর্মপ্রণালী ও শিক্ষার মধ্যে সম্ভবপর করবার চেষ্টা ছিল। রবীন্দ্রনাথ উনিশ বছর বয়স থেকেই ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে অজস্র ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁকে লিখতে হয়। এই সঙ্গীতগুলো কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের অনুগামী নয়। ব্রাহ্মসমাজে এই গানগুলো গাওয়া হতো বটে কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী সত্যনিষ্ঠ সর্ব সম্প্রদায়ের লোকের চিন্তাভাবনাকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা এই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলোর অন্যতম দিক।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা গোড়া থেকেই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সংস্থাপিত হয়েছিল। সার্থক ও সামগ্রিক শিক্ষার গুণে এবং পিতৃদেবের আদর্শবাদের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই মানবতার গভীর উৎসের দিকে অগ্রসর হয়ে চলছিলেন। সত্যের আলোকে সব কিছুই যাচাই করবার শিক্ষা দেবেন্দ্র-নাথের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রেই যেন তিনি পেয়েছিলেন। একদিকে প্রাচীন ভারতের মহৎ ঐতিহ্যে তিনি যেমন মুগ্ধ অন্যদিকে আচারলুপ্ত অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রকণ্ঠ ঘোষণা। হিতবাদী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'অকাল বিবাহ' প্রবন্ধটি নিয়ে যে বাদানুবাদ হয়েছিল সে-প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেন যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি' দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে 'হিন্দু প্রকৃতির সহিত য়ুরোপীয় প্রকৃতির কোন বিরোধ নাই, কেবল বর্তমানকালের হীনদশাগ্রস্ত নির্জীব

গোঁড়ামি ও কিস্তুত-কিমাকার বিকৃত হিন্দুআনিই যথার্থ অহিন্দু।' কলকাতায় জন্ম হলেও জমিদারির কাজে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তাঁকে থাকতে হয়েছিল। সাধারণ মানুষকে, গ্রামের মানুষকে নানাদিক থেকেই নিবিড়ভাবেই যে তিনি জানতে পেরেছিলেন গল্পগুচ্ছের গল্পগুলোতে তার বিস্তর প্রমাণ উপস্থিত। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের পল্লীকেন্দ্রিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোতে এই সর্বপ্রথম অনাস্বাদিত অপূর্বতা পরিবেশন করলো বলা যেতে পারে। সমাজ-জীবনের ভাঙন আজ থেকে ষাট বছর আগে এরূপ তীব্র ছিল না। সম্ভবত জমিদার মাত্রেই তখন পর্যন্ত শহর-জীবনের অমোঘ আমন্ত্রণে আকৃষ্ট হননি এবং দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পল্লীজীবনের মধ্যেই দেশের হৃদয়সম্বন্ধ অনুভব করতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে, বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করবার উপাদানগুলো পল্লীজীবন থেকে সংগ্রহ করার পথে বাধা হয়নি। বঙ্কিম-যুগে উপন্যাস রচনার পথ সুগম হয়েছিল। ছকে-বাঁধা প্লটকে কেন্দ্র করে গল্প রচনার সূত্রপাতও সেই সময় থেকে হয়। ভালোকে অত্যন্ত ভালো এবং মন্দকে খুব মন্দ হিসেবে চিত্রিত করা, সুনীতির মহিমা এবং দুর্নীতির অভিশাপ সম্পর্কে পাঠকমনকে সজাগ করা রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলাসাহিত্যে গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরূপ অবস্থায় পল্লীজীবনের অপরিসর গণ্ডির মধ্যে, ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ ঘটনাগুলোকে ঘিরে নতুন অভিজ্ঞতার হিরণ্ময় দ্যুতি ছড়িয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। আয়তনে, উপকরণসংগ্রহে, চরিত্রচিত্রণে, ভাবব্যঞ্জনায় প্রকৃত ছোটগল্প রচনা করে নতুন অভিজ্ঞতার দিগন্তদ্বার উন্মোচিত করলেন। এই প্রথম বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পের সঙ্গে বাংলা ছোটগল্প তুলনীয় হলো।

গ্রাম-জীবনের পটভূমিকায় আশৈশব-লালিত নর-নারীর বিচিত্র প্রাণপ্রবাহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য দীর্ঘকালের চিন্তাপ্রসূত গভীর অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়ের জারকরসে সুদৃঢ় হবার সুযোগ পেয়েছিল। জমিদারি দেখাশোনার কাজে শিলাইদহে থাকাকালীন দিনগুলি একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের বৈষয়িক অভিজ্ঞতার সীমা বাড়িয়েছিল অন্যদিকে তেমনি বিশ্বপ্রকৃতি ও পল্লীপরিবেশকে নিবিড় ভাবে জানবার সুযোগ বহন করে এনেছিল। 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র'-এর আওতায় কলকাতার বাড়ির কড়ি, বর্গা

দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে যাঁর বালককাল অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে পদ্মাবিধৌত পল্লী পরিবেশ গভীর অনুভূতির ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপ্রস্তাবে, একদিকে শিলাইদহ এবং অন্যদিকে শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের এই দু-টি কেন্দ্র নিরবধি কালের অন্ধকারে স্মৃতির উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের মতোই সংস্থাপিত বলা যেতে পারে। একদিকে পদ্মাবিধৌত সুবিস্তীর্ণ সমতল বাংলার শ্যামল রূপ এবং অন্যদিকে বোলপুরের গৈরিক মাটির রুক্ষ পারিপার্শ্বিকতা—এই দুই বিপরীত পরিবেশের মধ্যে রবিপ্রতিভার বিস্ময়কব সৃষ্টি সম্ভবপর হযেছে। শিলাইদহের উন্মুক্ত পরিবেশে 'গল্পগুচ্ছ'-এব অনেক গল্পরচনা সহজতর হয়েছিল এবং রুক্ষ গৈরিক মাটিব পরিবেশ বোলপুরে সম্ভব করে তুলেছিল 'গীতাঞ্জলি' রচনা।

পল্লীর উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে কিছুকাল থাকতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব শিল্পকর্ম ছোটগল্পগুলোতে মূর্ত হতে পেরেছিল। রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সৌন্দর্যের উপলব্ধি কবির একমাত্র আকাঙ্ক্ষাব বস্তু ছিল না, সেই সৌন্দর্যকে সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কোনো সুপরিকল্পিত উপায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিনা এ বিষয়েও তাঁকে দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বদেশী সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধ-গুলোতে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে। দেশের হৃদয়কে আবিষ্কার করতে হলে দেশের মানুষকে জানতে হবে; মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষার পূর্বে দেশের হৃদয়বৃত্তির চর্চার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন বলেই ছোটগল্পগুলোতে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি এতো সুগভীর হতে পেরেছে। অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে অতি-পুরাতন ধ্বংসোন্মুখ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে দেশের প্রাণলীলাপ্রবাহের চাঞ্চল্য কিরূপ বিপরীত ও বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল তার বাস্তব চিত্ররূপ এই প্রথম বাঙালী শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উন্মোচিত হলো। একদিকে প্রকৃতিপ্রেমিক কবি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের মধ্যে আত্মীয়সম্বন্ধ আবিষ্কার করলেন অন্যদিকে পল্লী-জীবনের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে, খণ্ড-খণ্ড দুঃখ-বেদনা, আশা-উদ্বেগ, জয়-পরাজয়, আনন্দ-বেদনা, হতাশা-ঘৃণা, ভালবাসা-হিংসা, অভিজ্ঞান-উপলব্ধি কিভাবে অহরহ সূর্যাস্তে সূর্যোদয়ে মানুষের হৃদয়লোকে আলো-অন্ধকারের বিভিন্ন স্তরে

তরঙ্গায়িত হতে পারে তারও নিখুঁত ছবি সুগভীর সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের গোচরে আনলেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের চরিত্রগুলোতে বহুবিচিত্র স্বভাবের নর-নারীর যে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা যায় উত্তরকালের কথাসাহিত্যে তারই ভিত্তিতে বহু টাইপ চরিত্রের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই দিক থেকে স্বয়ং শরৎচন্দ্রও অংশতঃ রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোর অনেক নায়ক-নায়িকা ও পার্শ্বচরিত্রের পূর্ব-প্রতিভাস যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ছোটগল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যেই তার নজির মিলবে। সত্য রক্ষার চেষ্টায় রামকানাইয়ের মতো সংসার অনভিজ্ঞ লোকের আত্মপণ, জয়কালীর হৃদয়ের যুগপৎ কঠিনতা ও কারুণ্যের লীলা-রহস্য, 'দৃষ্টিদান' গল্পের নায়িকা দৃষ্টিহীন কুমুর অহল্যা প্রতীক্ষা ও জীবনসাধনা, 'মেঘ ও রৌদ্র'-এর নায়ক শশীভূষণের স্বগ্রামবাসীদের কাপুরুষ আচরণ সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, 'বিচারক' গল্পের বিচারক, শুদ্ধাচারী মোহিত-মোহনের যৌবনকালের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন—চরিত্রচিত্রণের এই বিভিন্নতা ও গল্পের উপাদান-বৈচিত্র্য পরবর্তীকালের উপন্যাস ও ছোট-গল্পের লেখকসম্প্রদায়কে দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রেরণা যুগিয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' সমাজ-জীবনাশ্রিত বাস্তবনিষ্ঠা ও নর-নারীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক থেকে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের অনুগামী। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের শশীভূষণ গ্রামে ফিরে এসে সকলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে বদ্ধ-পরিকর। অথচ সেই নিপীড়িত মাঝিমাল্লারা যখন ইংরাজনন্দন ম্যানেজারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিতে অসম্মত হতে থাকে তখন দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দেওয়া ছাড়া শশীভূষণের গত্যন্তর থাকে না। অবস্থাটা 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশের সঙ্গে তুলনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'মেঘ ও রৌদ্র' ১৩০১ এবং 'পল্লীসমাজ' ১৩২২ সালের রচনা। অন্ধসংস্কার-চালিত সমাজের অনেক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার প্রতি রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ-ব্যাপারে শরৎচন্দ্র তাঁর অনুগমন করেছিলেন মাত্র। 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল পুরুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছে (১৩২১) 'শেষ প্রশ্ন'-এর (১৩৩৮) কমলের প্রতিবাদ উত্তরকালে তার তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে মাত্র। বাংলা দেশের অন্তঃপুর-

চারিণীদের অন্তরের মূক আনন্দ-বেদনা শরৎ-সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি পেলেও রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যেই তার প্রথম উন্মেষ এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে কিনা সন্দেহ। 'বিচারক' গল্পের ক্ষীরোদা, 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তী চরিত্র দৃষ্টান্ত।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা গ্রাম-বাঙলার নানা সমস্যার ওপর নতুন উপলব্ধির আলোকপাত করেছে। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব শহর-গুলোতে কেন্দ্রীভূত হলে সমস্যার সমাধান হবে না, মরণোন্মুখ গ্রামগুলোতে নবজীবনের সঞ্চার হওয়া দরকার, নানাভাবে ও নানাপ্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের প্রাণ এককালে গ্রামগুলোকে কেন্দ্র করেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামগুলোও ক্রমশ স্বাস্থ্যহীন দীপ্তিহীন হয়ে পড়তে থাকে। 'স্বদেশী সমাজ' প্রসঙ্গে কবি স্পষ্টভাবেই তাঁর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা সর্ব-সাধারণের গোচরীভূত করার চেষ্টা করতে থাকেন। ইংরেজ শাসকের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না থেকে নিজ শক্তির ওপর আস্থা রেখে গঠন-মূলক নানা কাজের চেষ্টায় যে আনন্দ ও সুফল উভয়ই পাওয়া যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ তা সুস্পষ্টভাবেই নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন। আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক কর্মীর পক্ষে পরমুখাপেক্ষী হওয়া মহাপাপ এবং আত্মশক্তির উপলব্ধিতেই যে জনকল্যাণের বীজ নিহিত সে কথার উল্লেখ যথাসময়েই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। "আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন্, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেই জন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।" (স্বদেশী সমাজ)।

রামমোহনের মতো রবীন্দ্রনাথও হিন্দু সমাজের মঙ্গলময় ও কল্যাণকর

দিকগুলোর বাস্তব ব্যাখ্যার বিশেষ চেষ্টা করেছেন। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান থেকে সুরু করে সাধারণকে ধর্ম শিক্ষা দান এ সমস্তই যে জনকল্যাণের অঙ্গীভূত ও ধর্মব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বিগত যুগের সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস কোথায় তা দেখিয়েছেন। অল্প বয়স থেকে যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি সমাজচিন্তার ক্ষেত্রেও ভারতীয় আদর্শ ও অম্বিষ্ট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রাঞ্জল আলোচনার মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার চেষ্টা করেছেন। সাধনা পত্রিকার যুগে এবং পরবর্তীকালে সবুজপত্রের যুগেও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক সুস্পষ্ট ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রবণ ও মোহগ্রস্ত বাঙালীর সাহিত্য-চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন আলোকসম্পাত করেছেন এবং সাহিত্যে সৌন্দর্য, সত্য ও শুচিতাকে রক্ষা করার বিষয়ে লেখক ও পাঠককে অবহিত করেছেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ প্রসঙ্গে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগেই জানা গিয়েছিল। 'আজ আমাদের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়েছে।' জলকষ্ট নিবারণের জন্য বিদেশী সরকারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ধরনের নানা জনকল্যাণের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হোক রবীন্দ্রনাথ সে-যুগে এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। "জলদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যে সরকার বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়।···রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্যে তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে, বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।"··রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে বারবার রাজশক্তির পরিবর্তন হলেও গ্রামজীবনের ভারসাম্য তার ফলে কোনো সময়েই একেবারে বিপর্যস্ত হয়নি। কারণ, স্থানীয়ভাবে সামাজিকভাবে জনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই গ্রামজীবনের ঐক্য, সংহতি ও জীবনপ্রবাহ একসময়ে অব্যাহত ছিল। "আমরা নানাজাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত

কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সবাই পল্লীগ্রামে থাকবে এমন দাবি করা যায় না যেহেতু বিদ্যা ও ধনমান অর্জনের জন্যে বাইরে যাবার আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু ঘর ও বাইরের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তা যদি একেবারে উল্টোপাল্টা হয়ে যায় তাহলে সে বড় ভয়ঙ্কর কথা। বাইরে শক্তির প্রয়োগ হলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখতে হবে। বাইরে অর্জন করতে হবে ঘরে সঞ্চয় করে রাখবার জন্যেই। শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে বাইরে কিন্তু সে-শিক্ষার সার্থক প্রয়োগ হবে ঘরে, ঘরকে সমৃদ্ধ করার জন্যেই।

গ্রামসংযোগ ও গ্রামোন্নয়ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী মেলার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। শুধু উল্লেখমাত্র নয় মেলাকে সার্থক ও সর্বতোমুখী করে কী ভাবে পল্লীজীবনকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করা যায় তার বিস্তারিত কার্যসূচীও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছিলেন। "এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হয়,—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।" ক্ষুদ্রতা ও খণ্ডতা রবীন্দ্রনাথকে বারংবার আঘাত করেছে। পল্লীসমাজের ক্ষুদ্রতা ও অব্যবস্থা শহরজীবনে রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থান্ধতায় তাঁকে বিচলিত হতে দেখা গিয়েছে। তিনি সম্ভবত সে-কারণেই এমন একজন দেশনায়কের সন্ধান করেছেন পরাধীন ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে যাঁকে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং যাঁর উপযুক্ত নির্দেশে সংগ্রামী সাধারণ মুক্তিপথের সন্ধান পাবে। স্বদেশী যুগে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এই নেতৃত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত জনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-চিন্তা নির্ভুল না হলেও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দেশনায়কতা পরিপূর্ণরূপেই যে সার্থকতা লাভ করেছিল এসত্য আজকের দিনে আর কারুর অজানা নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে রাজপথে অকারণ ছুটোছুটির যেমন মানে হয় না তেমনি

দেশে নেতৃত্বহীন আন্দোলনও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। দেশ ও সমাজ স্থাণুবৎ থাকতে পারে না। "অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মত-বিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে।"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় সমস্ত বাংলা দেশকে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা দেখা যায়। সে-সময়ে যে নবজাগরণের সাড়া জাগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাকে সমৃদ্ধতর করেছিল। রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসতে চাননি যেহেতু তিনি জানতেন শিল্পী-জীবনের প্রশস্ততর ক্ষেত্রেই তাঁর আসন নির্দিষ্ট এবং তাছাড়া, রাজনৈতিক দলাদলির কদর্যতা গোড়া থেকেই তাঁর মনকে পীড়িত করে তুলেছিল। কিন্তু নেতাদের মুখ চেয়ে নয়, জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করবার জন্যেই তিনি সে সময়ে স্বদেশী আন্দোলনকে আবাহন করেছিলেন। সনাতনী হিন্দু ও সংস্কার-পন্থী হিন্দু, হিন্দু ও মুসলমান, মডারেট ও চরমপন্থী নেতৃত্ব—এই সর্বপ্রকার বিচ্ছেদ ও অব্যবস্থার উপরে উঠে স্বদেশী আন্দোলন সে-সময়ে অন্তত: কিছুকালের জন্যেও সার্থকতা লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই ভারতীয় নেতৃবর্গ উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের প্রবর্তন দাবি করেছিলেন। ১৮৯২ সনে দেখা গেল আইন সংশোধন করে ইংরেজ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি দেশের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো যারা ইংরেজ শাসকের সদিচ্ছার উপর অনেকটা আস্থাসম্পন্ন ছিলেন তাঁরা হতাশ হলেন। ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করবার জন্যে ইংরেজের এই ষড়যন্ত্রে ভারতীয় মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে বিডন স্ট্রীটের চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। আরো কয়েকটি পরিপূরক প্রবন্ধও ('ইংরেজের আতঙ্ক' 'রাজা ও প্রজা' 'সুবিচারের অধিকার') রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে লিখে পাঠ করেন। রচনাগুলো দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের আলোকে উদ্ভাসিত। সময়টা তখন খারাপ। হিন্দু জাতীয়তা ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা মাথা

চাড়া দিয়েছে ; দেশ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন কিছুকালের জন্যে বিভেদ ও অনৈক্যের অন্ধকারকে দূর করেছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হলো সে উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি লিখে অনুপ্রেরণা জোগালেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন, যেদিন বঙ্গচ্ছেদ সরকারীভাবে কার্যকরী হবে (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) "সেদিন অরন্ধন হবে, লোকে গঙ্গাস্নানে যাবে, পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধবে।" রবীন্দ্রনাথ নিজে মিছিলের সঙ্গে ঘুরলেন, পাড়ায় ভদ্র-অভদ্র স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার না করে সকলের হাতেই রাখী বাঁধলেন, পথের পাশে মুসলমান গাড়োয়ানের হাতে রাঙা রাখী পরাতে তারা বিস্মিত হল!" (রবীন্দ্রজীবনকথা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেমদৃপ্ত গানগুলো, বক্তৃতামালা এবং প্রবন্ধাদি ১৯০৫ সালের আন্দোলনকে অনন্য স্বকীয়তা ও দীপ্তি দান করেছিল বলতে পারা যায়। এই সময়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে অন্য নেতাদের মতপার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ সরে দাঁড়ান এবং তাঁর নিজের আদর্শ অনুযায়ী শান্তিনিকেতনে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হন।

স্বদেশী আন্দোলনের পরেই আন্দোলনের মধ্যে নানা গলদ দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সংস্পর্শ থেকে সরে দাঁড়ান। নেতাদের মধ্যে এই সময় নরমপন্থী গরমপন্থী এই ভেদাভেদ এসে যায়। আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদের ছোঁয়াচ লাগলো এবং বাংলা ছাড়াও বিহার, আসাম, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশেও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে দেশের যুবকরা মেতে উঠলো। স্বদেশীযুগে বয়কট আন্দোলনের না-পন্থী চিন্তাধারা রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। আন্দোলনজনিত মত্ততার পরিবর্তে আত্মশক্তি চালনা করে নেতৃত্বের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার জন্যে পল্লীসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। অর্থাৎ, সংহত গঠনমূলক কার্যসূচী গ্রহণের জন্যে বললেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কী রকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও শিক্ষাসমস্যা, জাতীয় বিদ্যালয়, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখে ও নানা সভায় পাঠ করে সুনির্দিষ্ট পথের নির্দেশ দিলেন। বলা বাহুল্য, প্রতিকূল ও সুবিধাবাদী শক্তিগুলোর জন্যে শান্তিনিকেতনের বাইরে অন্যত্র এই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান স্বদেশী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছিল কিন্তু গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না রেখে ক্ষণিক-উত্তেজনা মূলক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়ার ঝোঁককে তিনি শেষ পর্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের মুখ দিয়ে বিদেশী দ্রব্য বর্জন সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করানো হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিমলাকে যে শ্বেতাঙ্গ মহিলা (মিস গিলবী) বাড়িতে থেকে পড়াতেন, স্বদেশী মনোভাবের অনুষঙ্গ হিসেবে তাকে বিতাড়িত করা যে শোভন ও সঙ্গত নয় রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট ভাবেই তা জানিয়েছেন। "যথার্থভাবে, গভীর-ভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে, এই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্তি দিতে হইবে। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়া-মাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের দুর্বলতা, তাহাকে বড়ো নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতেছি, তাহা নহে, গর্ববোধ করিতেছি।" (সফলতার সদুপায়)।

রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যখনই ভারতবর্ষে কিংবা বাংলাদেশে প্রয়োজন দেখা গিয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান ও কবিতার সঞ্জীবনীস্পর্শে সে-আন্দোলনকে সমৃদ্ধ ও সুষমামণ্ডিত করেছেন। 'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে' কিংবা 'আমি ভয় করব না—ভয় করব না' কিংবা শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত কবিতা—এইসব সময়োচিত রচনাই তার প্রমাণ। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাংলার বিপ্লবী যুবশক্তির মনেও সময়োচিত প্রেরণা জুগিয়েছে ; 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' কিংবা, 'সময় এবার হয়েছে নিকট বাধন ছিঁড়তে হবে' এই সব কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বিপ্লবী তরুণেরা হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছিল। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' ইত্যাদি গানের মধ্যেই সমগ্র স্বদেশী যুগের ভাবোন্মাদনা বিধৃত।

১৯১১ সালে 'অচলায়তন' নাটকের সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় ঐতিহ্য এবং হিন্দুধর্মের মহান আদর্শের প্রতি

তিনি সর্বদাই শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই নাটকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়।' এই নাটক লিখে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করতে এবং সফলও হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। ১৯১৭ সালে মহাযুদ্ধ চলেছে। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ জনসভায় 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনালেন এবং সদ্যরচিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটিও গাওয়া হলো। পরবর্তী-কালে বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ হতে দেখা গেল। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ-স্বরূপ নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করলেন। হিজলি জেলে (১৩৩৮) রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর গুলিচালনার প্রতিবাদে মনুমেন্টের নীচে যে জনসভা অহ্বান করা হলো তাতে সভাপতিত্ব করলেন রবীন্দ্রনাথ। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর দেশে যে আন্দোলন শুরু হলো সে-সময়েই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'প্রশ্ন' কবিতাটি!

সংস্কার থেকে মুক্তি, জড়ত্ব থেকে মুক্তির মর্মবাণী ব্যক্ত হলো 'বলাকা'র কবিতায়। 'সবুজের অভিযান' 'শঙ্খ' ও 'আহ্বান' এই দিক থেকে উল্লেখ্য। ১৯৩৬ সালে জুলাই মাসে টাউন হলের সভায় প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি প্রবর্তনের উল্লেখ করলেন। পরে নেহেরুর অনুরোধে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংঘের সভাপতি হতে স্বীকৃত হলেন। শক্তিদম্ভে উন্মত্ত জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণের প্রতিবাদ জানালেন রবীন্দ্রনাথ। জাপানী কবি নোগুচিকে লেখা তাঁর চিঠি এযুগে নির্যাতিতের স্বপক্ষে ও অন্যায়ের প্রতিবাদে একটি ঐতিহাসিক দলিল বলে চিহ্নিত হয়েছে। জীবনের শেষ লগ্নে কবি যখন দুর্বল, অশক্ত ও পীড়িত সে-সময়ে মিস র‍্যাথবোনের প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর অবিস্মরণীয় চিঠি। তার

আগেই শেষ জন্মদিনে পড়েছিলেন 'সভ্যতার সঙ্কট।' রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার পূর্ণতর রূপ এই সব প্রবন্ধ ও চিঠি-পত্রে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পলায়নবাদী কিংবা দুঃখবাদী ছিলেন না। বয়স বৃদ্ধি হলে মানুষের মন সাধারণত রক্ষণশীল ও অবিশ্বাসী চিন্তাজগতে বিচরণ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। মানুষের অমিত শক্তি ও বীর্যে তাঁকে কখনো আস্থা হারাতে দেখা যায় নি। সমাজবোধ ও ঐতিহাসিক বোধ অহরহ তাঁর প্রাণের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। দেশ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে তাই তার ধারণা যথার্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে: "দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চ-কণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা যায়। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষের তৈরী। তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালুতলে ভূমির মতো।"... (রবীন্দ্ররচনাবলীর ভূমিকা: প্রথম খণ্ড)।

স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ যে সবার আগে কবি এ কথার প্রমাণ রয়েছে। রাজনৈতিক ভাবধারা বা সমাজচিন্তাকে তিনি সত্যের আলোকে যাচাই করেছেন। তাঁর বিশ্ববোধের মধ্যে যে সমগ্রতা প্রচ্ছন্ন তার অংশ হিসেবেই তিনি অজস্র খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারাকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। সে কারণে সমাজ-জীবনে যখনই সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে কিংবা নানা ঘটনা ও আন্দোলনের জটে সমগ্রতার অভাব হয়েছে তখনই রবীন্দ্রনাথ সরে দাঁড়িয়েছেন। "কবির পক্ষে সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করে নি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজার দরের ক্ষতি হয়, কিন্তু সত্যমূল্যের কমতি হয় না।" এই সত্যমূল্যের সন্ধানেই

রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ও স্বদেশচিন্তা পরিচালিত হয়েছিল বলা যেতে পারে। বহির্বিশ্বে যেখানেই কল্যাণের হাত সম্প্রসারিত দেখেছেন সেখানেই তাকে অভিনন্দিত করেছেন তিনি। রাশিয়ার চিঠি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। মুসোলেনীর শাসনকালে ইতালী পরিভ্রমণের সময় ফ্যাসিষ্টদের পক্ষ থেকে সত্য গোপনের পরিচয় পেয়েই রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বিলেতের ম্যানচেষ্টার গার্জিয়ান সংবাদপত্রে সে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। বাইরের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি মানবিক সম্পদ বৃদ্ধি না পায় তাহলে সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী এ কথার উল্লেখ বহুবারই বহু প্রসঙ্গে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যেখানেই সুযোগ পাওয়া গেছে ভারত-আত্মার বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যায় যত্নবান হয়েছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস যে য়ুরোপীয় ইতিহাসের মতো নেহাৎ রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়, রাজা, রাজত্বকাল ও রাজবংশের বিবরণকে অতিক্রম করেও সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র অব্যাহত রয়েছে এ কথার উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। "যে-ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা, তাহার ভালোমন্দ কর্ম কিছুই নাই। আত্ম-অনাত্মের যোগে ভালোমন্দ সকল কর্মের উদ্ভব। অতএব গোড়ায় এই আত্ম-অনাত্মের সত্যসম্বন্ধ-নির্ণয় এবং জীবনের কাজে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া চলা, ইহাই চিরদিন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টার বিষয় ছিল।" এই বক্তব্য তাঁর অজস্র কবিতা ও গানের মধ্য দিয়েও পরিস্ফুট হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্র-জীবন বলিষ্ঠ সত্যসন্ধানী জীবন; জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মানব মহত্ত্বের আদর্শের ব্যাখ্যায় তাই তাঁকে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। সত্যের আলোকে তিনি ঘটনাবলীকে বিচার করেছেন এবং জীবনের সুধাভাণ্ড থেকে রস আহরণ করে মহৎকে অভিনন্দিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায় জনকল্যাণের যে-কার্যসূচী রয়েছে আজকের দিনে তা নিয়ে বিশেষভাবে ভাববার প্রয়োজনীতা রয়েছে। নানা কর্মের আদর্শের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্রতার সন্ধান করেছেন আজকের দিনে তার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এখন তাঁর কার্য্যসূচী নিয়ে পরীক্ষায় নামলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। "অন্ধকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের

অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ কর যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এই সমস্তই আমাদের, এ সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ—এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্মে কর্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ এ আমাদেরই কীর্তি—যেদিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভরে কম্পমান।" (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে প্রদত্ত বক্তৃতা)। একালের বৃহৎ কর্ম-ব্যবস্থায় এই সঙ্কল্পের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট, বলা বাহুল্য।*

* এই প্রবন্ধে পরিবেশিত কোনো কোনো তথ্য রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমারের রচনা থেকে সংগৃহীত।

বিনোদিনী

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাসগুলো পাঠে একদিকে যেমন চরিত্র-চিত্রণের বিচিত্রতা ও গভীরতা এবং সামাজিক বিবর্তনের বিস্তার সম্পর্কে সচেতন হতে হয়, অন্যদিকে তেমনি বঙ্কিম যুগের মধ্যবিত্ত সমাজ এবং রবীন্দ্রনাথের কালের মধ্যবিত্ত সমাজের কালানুগ পার্থক্যের পরিচয়ও নজর এড়ায় না। বঙ্কিম যুগে মধ্যবিত্ত সমাজের সবে পত্তন হতে শুরু করেছে, বিদেশী বণিকশক্তির বনিয়াদ দৃঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসন কার্যে সহায়তা করার জন্যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিয়োগ অনিবার্য হওয়ার ফলেই সামন্ততন্ত্রের সামাজিক কাঠামোয় ভাঙন এবং নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা সহজ পথেই অগ্রসর হতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের কালে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই নয় নতুন ও পুরাতন আদর্শের মূল্যায়ন সম্পর্কেও উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিম যুগে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও এবং নব-বিদ্যালব্ধ চিন্তাধারায় উৎসাহী হলেও, সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শকে একেবারে নির্মূল করা হয়তো তখনো সম্ভব হয়নি। সামন্ত-সমাজ বিলুপ্ত হলেও সে সমাজের দীর্ঘকালের আচার ও সংস্কার তখন পর্যন্ত কোনো কোনো দিক থেকে শিক্ষিত মনকেও প্রভাবিত করে রেখেছিল। সে সমাজের বিস্মৃতপ্রায় রাজারাজরাদের বিক্রম ও সংগ্রামের নানা কাহিনী তখন পর্যন্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রাণেও থেকে-থেকেই শৌর্য-বীর্যের অনুরণন সৃষ্টি করায় নতুন ভঙ্গিতে সে সামন্ত-সমাজের মূল আবেদনগুলোর পুনরুদ্ধার উপন্যাসের মধ্য দিয়েও সম্ভব করার চেষ্টা চলেছিল বলতে পারা যায়। ইতিহাস-আশ্রিত উপাখ্যান সমূহের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে রোমান্টিক কবি কল্পনার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা থেকেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। বঙ্কিমের উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস না হয়ে যে ইতিহাস-আশ্রিত

আখ্যায়িকা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কারণ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য বাঙালী সম্প্রদায় ইতিহাস চর্চায় উৎসাহী হলেও তখন পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান সম্পূর্ণতা ও সমগ্রতা লাভ করতে পারেনি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীপ্রাণে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রীতির বিস্তার এবং যুক্তিবাদের বিকাশলাভ ঘটালেও, ঐতিহাসিক জ্ঞান খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থাকায় রোমান্টিক কবি-কল্পনা ও রোমান্স রস বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানেই ঐতিহাসিক তথ্য অনুপস্থিত এবং ইতিহাসের আলো অস্পষ্ট ও সংশয়াচ্ছন্ন, সেখানেই রোমান্সরসের ব্যাপ্তি নজরে পড়বে। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-জীবনের ভগ্নাবশেষ এবং অন্য দিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নবজ্ঞান-লব্ধ ভাবোন্মাদনা, এই দু-জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রোমান্সরসের সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টাকেই তখন সঙ্গত বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ('অঙ্গুরীয়-বিনিময়'), বঙ্কিমচন্দ্র ('দুর্গেশনন্দিনী', 'রাজসিংহ') এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ('বঙ্গ-বিজেতা', 'মাধবীকঙ্কন') ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার পটভূমিকায় এই রোমান্সরস পরিবেশনের কাজে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণের সুযোগ তেমন পাওয়া যায়নি। সে ক্ষেত্রে লেখকের বিচিত্র ঘটনাবলীর সমাবেশ ও সে সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের বর্ণনার মাধ্যমে মূল আখ্যানকে এগিয়ে নেবার চেষ্টাই লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র-বর্ণনা, সংলাপ-সংস্থান ও ঘটনাবলী-স্থাপনা এরূপভাবে বিন্যস্ত যে, পাঠকমন অভিভূত না হয়ে পারে না। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই বর্ণিত চরিত্রগুলো হৃদয়বৃত্তির আলোড়নে উদ্দীপিত নয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিক্ষোভের বিচিত্রলীলায় উদ্ভাসিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ও তাঁর সমকালীন লেখক-সম্প্রদায়ের উপন্যাসগুলো সম্পর্কেও বোধ হয় মোটামুটিভাবে এই কথাই বলা চলে। সেক্ষেত্রেও প্রায় সর্বত্রই বাহিরের জগৎ ও বাহিরের জগতের ঘটনাবলীই প্রধানত আখ্যায়িকার চরিত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করছে, বাহিরের ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতেই চরিত্রগুলো নড়েচড়ে উঠছে, ঘটনা সংস্থানই চরিত্রগুলোর ওপর আলো বিকীর্ণ করে বর্ণিত পাত্রপাত্রীদের পাঠকের চোখের সামনে উপস্থিত করছে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণের এই পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া সম্ভব ছিলনা, কেননা, মধ্যবিত্ত সমাজ ইতিমধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মস্থ হতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস দুটোতে ('বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি') বঙ্কিমযুগের প্রভাব থাকলেও এবং বঙ্কিমী রচনারীতির অনুযায়ী হলেও, ১৩০৮ সালে প্রকাশিত 'চোখের বালি' উপন্যাস পূর্বযুগের চিন্তাধারা ও রচনারীতির সঙ্গে বহুদিক থেকেই বিচ্ছেদের সূচনা করে। প্রথম দুটো উপন্যাস লেখার পর রবীন্দ্রনাথ যে আর কোনো ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লেখেননি, এ থেকে বোঝা যায়, লুপ্ত সামন্ত সমাজের শৌর্য-বীর্যের উপাদান কুড়িয়ে অতীতমুখী সাহিত্যসৃষ্টির অবসান তিনি ঘুচাতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের নরনারীর ক্রমবর্ধমান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মাদনা, তাদের হৃদয়মননজাত নানা চিন্তাধারা ও ভাবুকতার সমাবেশ রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিচিত্র শিল্পরূপের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। পূর্ববর্তীকালের উপাখ্যান-সর্বস্ব উপন্যাসধারায় অতএব 'চোখের বালি' নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব সংযোজন এবং এই সময় থেকে বাংলা উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ নতুন ও আধুনিক পর্যায়ের শুরু বলা যেতে পারে।

দুই

বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় 'চোখের বালি'র বরাবরই বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে, যেহেতু এই গ্রন্থেই প্রথম সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র সূচনায় লিখেছেন :

"আমরা একদা বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না।··· ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানাঘরে। শয়তানের হাতে 'বিষবৃক্ষে'র চাষ তখনও হত, এখনও হয়; তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্ততঃ গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে

দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব নষ্ট হয়। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না, তখন নামতে হলো মানবসংসারের সেই কারখানাঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি, হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় প্রকাশ পায়নি।...সাহিত্যের নব-পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।"

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত উদ্ধৃতির পট-ভূমিকায় রবীন্দ্র উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কেও সঠিক ধারণা করা সহজ হয়। 'সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।' এই উক্তির মধ্যেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণের মূল পদ্ধতির সূত্রানুসন্ধান সম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে 'চোখের বালি' থেকে শুরু করে 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' পর্যন্ত সমস্ত উপন্যাসেই চরিত্রচিত্রণের এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। মূল আখ্যানভাগের গতি কোথাও দ্রুত, কোথাও মন্থর, কোথাও সংলাপের ব্যাপকতায় গভীর। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই চরিত্রসৃষ্টিতে আখ্যানভাগের প্রাধান্য নেই। বরং মনে হবে, চরিত্র সৃষ্টির প্রাধান্যের কাছে মূল গল্পের আবেদন গৌণ হয়ে পড়েছে, যদিও সে কারণে সমগ্রভাবে উপন্যাসের আবেদন গৌণ হয়ে পড়েনি।

'চোখের বালি'র প্রধান চরিত্র বিনোদিনীতে বাংলা দেশের তখনকার সমাজের নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের আলোড়ন সুস্পষ্ট। বিনোদিনীর বিদ্রোহ, বিনোদিনীর ঈর্ষাপরায়ণতা, অন্ধ সংস্কার ও আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে নির্ভীক ঘোষণা যেভাবে বিমূর্ত হয়েছে, পূর্ববর্তীকালের চরিত্রচিত্রণে তার সমতুল দৃষ্টান্ত খোঁজার চেষ্টাই বাতুলতা। কুন্দনন্দিনী কি রোহিণী-চরিত্রের মতো এ চরিত্র লেখকের উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্রমাত্র নয় কিংবা দৈবানুগ অদৃশ্যশক্তির হাতের ক্রীড়নকও নয়, এ চরিত্রের সজীবতা হৃদয়দ্বন্দ্বের বিচিত্র বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। 'বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারি মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল,

তবু তাহার হুঁশ ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, টাকাকড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক।' এরূপ অবস্থায় একগ্রামের মেয়ে রাজলক্ষ্মীর ছেলে মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতেই মহেন্দ্র মাকে খুশী করবার জন্যে রাজী হলো বটে কিন্তু বিয়ের দিন এগিয়ে আসতেই বিমুখ হয়ে পিছপাও হলো এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধুবর বিহারীর সঙ্গেই বিনোদিনীর বিয়ে যাতে হয় তার জন্যে মাকে দিয়ে বিহারীকে বশে আনার চেষ্টা চললো। বলা বাহুল্য, বিহারীও রাজী হলো না। জোড়হাত করে রাজলক্ষ্মীকে জানালো: 'মা, ওইটে পারিব না। যে মেঠাই তোমার মহেন্দ্রর ভাল লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, সে মেঠাই তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি; কিন্তু কন্যার বেলায় সেটা সহিবে না।' ফলে, বিনোদিনীকে অন্যত্র বারাসতের নিরানন্দ পল্লীভবনে স্বামীর ঘর করতে যেতে হলো এবং অল্পকাল পরেই বিধবা হয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো মুহ্যমানভাবে জীবনযাপন করতে লাগলো।

কিন্তু গ্রামে বেড়াতে এসে বিনোদিনীর সেবায় প্রীত হয়ে রাজলক্ষ্মী তাকে নিয়ে এলেন কলকাতার বাড়িতে। 'সেবা ইহাকেই বলে! মুহূর্তের জন্যে আলস্য নাই। কেমন পরিপাটি কাজ, কেমন সুন্দর রান্না, কেমন সুমিষ্ট কথাবার্তা।' বিহারীকে সঙ্গে করেই রাজলক্ষ্মী বারাসতে এসেছিলেন। নব-বিবাহিত মহেন্দ্র তখন কলকাতার বাড়িতে বালিকাবধূ আশাকে নিয়ে চারুপাঠ পড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় রঙীন প্রহর যাপন করছে। বারাসতের অজ্ঞাত গ্রামে বসে বিনোদিনীর মন প্রথম দুলে উঠলো যেদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে লেখা মহেন্দ্রের চিঠি তাকে পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেন। বিনোদিনী পড়ে শোনাতে লাগলো। মহেন্দ্র প্রথমে মা-র কথা লিখেছে। কিন্তু সে অতি সামান্যই। তার পরেই আশার কথা। মহেন্দ্র রঙ্গে রহস্যে আনন্দে যেন মাতাল হয়ে লিখেছে। বিনোদিনী খানিকটা পড়ার পর লজ্জা পেয়ে থামলো, জানালো যা সব লেখা আছে তা না শোনাই রাজলক্ষ্মীর পক্ষে ভালো। রাজলক্ষ্মী বুঝতে পারলেন ছেলের চিঠিতে মায়ের কথা তেমন কিছুই নেই, বউয়ের কথাই সব। অমনি স্নেহব্যগ্র মুখের ভাব এক মুহূর্তেই পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠলো। চিঠি ফেরৎ না নিয়েই তিনি

উঠে পড়লেন। বিনোদিনীও তার ঘরে ফিরে এসে দ্বার রুদ্ধ করে বিছানার ওপর বসে চিঠিখানা ভালো করে পড়তে লাগলো।

"চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কি রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। তাহা কৌতুকরস নহে। বারবার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"

তিন

বিনোদিনী তার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তার নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন নিয়ে কলকাতার বাড়িতে উপস্থিত হবার পর থেকেই বাড়ির আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটলো। "বিনোদিনী সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণ, প্রভুত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ স্বভাবসিদ্ধ, দাসদাসীদিগকে কর্মে নিয়োগ করিতে, ভৎর্সনা করিতে ও আদেশ করিতে সে লেশমাত্র কুণ্ঠিত নহে।" বলা বাহুল্য, বালিকাবধূ আশা এই সর্বগুণশালিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত ছোটো মনে করতে লাগলো। আশার পক্ষে অবশ্য সঙ্গিনীর বড়ো দরকার। কারণ, তার ও মহেন্দ্রের ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দু-টি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না—সুখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্যে বাজে লোকেরও দরকার। এদিকে বিনোদিনীর মধ্যেও অন্য এক নতুন বিনোদিনী যেন জেগে উঠতে লাগলো।

"ক্ষুধিত-হৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।" বিনোদিনী জানতে পারলো—একদিন মহেন্দ্রের সঙ্গে তার বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল।

"আশার এই বিছানা, এই খাট একদিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সেকথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এঘরে আজ সে অতিথিমাত্র—আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে।" বিনোদিনী অপরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে আশাকে সাজিয়ে স্বামিসম্মেলনে পাঠিয়ে দেয়। "তাহার

কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিত হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত।" আশা-মহেন্দ্রের প্রেমরঞ্জিত সুখস্বপ্নে ঈর্ষান্বিতা বিনোদিনীর "শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যেদিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। 'এমন সুখের ঘরকন্না! এমন সোহাগের স্বামী! এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামিকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকী, এই খেলার পুতুল!"

বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের কাছে আশা একেবারেই নিষ্প্রভ, তার হাতের খেলার পুতুলমাত্র। তাই আশার চালচলন, কথাবার্তার ভঙ্গির মধ্যে মহেন্দ্র বিনোদিনীর অদৃশ্য হাতের প্রভাব অনুভব করতে পারে। আর সে কারণেই ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্রের বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি যেন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসতে থাকে। "পূর্বে যে সকল অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলা তাহার কাছে কৌতুকজনক বোধ হইত, এখন তাহা অল্পে অল্পে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।" আশার সাংসারিক অপটুতায় মহেন্দ্র বিরক্ত হতে থাকে, যদিও মুখে প্রকাশ করে না। আশাও মনে-মনে অনুভব করতে থাকে নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্যাদা ম্লান হয়ে এসেছে। আশার মধ্যস্থতায় বিনোদিনী মহেন্দ্র, পরস্পরের নিকটবর্তী হলো, তারপর এমন দিন অনতি-বিলম্বে এলো যখন বিনোদিনীর তৈরী পশমের জুতো মহেন্দ্রের পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তার গলায় কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করতে লাগলো। বিহারী এদিকে যখন উপলব্ধি করলো যে, তার ডাকখোঁজ কেউ করছে না, তখন সে নিজেই আশা-মহেন্দ্র-বিনোদিনীর চক্রের মধ্যে নিজের স্থান দখল করতে সচেষ্ট হলো।

মহেন্দ্র বিনোদিনীর দিকে ঝুঁকলেও, বিনোদিনীর পক্ষপাত যে বিহারীর দিকে, এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর মধ্যে নতুনতর পর্যায়ের সম্ভাবনায় পাঠক-মন সজাগ হয়ে ওঠে। দুর্বলচরিত্র মহেন্দ্রের পাশে দৃঢ়চরিত্র বিবেকবান বিহারীকে বিনোদিনীর আকর্ষণীয় মনে হবে, এটা স্বাভাবিক। বিহারীও দমদমের বাগানবাড়িতে বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের দীপ্তি প্রত্যক্ষ করে হৃদয়ঙ্গম করলো যে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরসকৌতুকবিলাসের দহন-

জ্বালায় এখনও নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হয়ে যায়নি এবং "বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।"

চার

মহেন্দ্রকে বিনোদিনী যে নানা বাণে বিদ্ধ করেছে, তার কারণ, আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত হৃদয়কে ঈর্ষাকাতর করে তুলেছিল। বিনোদিনী তার রক্তমাংসের শরীর নিয়ে উপস্থিত থাকতেও মহেন্দ্র আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে নিয়ে মেতে থাকবে, এটা বিনোদিনীর কাছে সহ্যাতীত ব্যাপার। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালো বাসে কি বিদ্বেষ করে, তাকে কঠিন শাস্তি দেবে না তার কাছে হৃদয় সমর্পণ করবে—এটা অনেক দিন পর্যন্ত সে নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি। "একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসা না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না। মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, 'কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে? আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।' কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে? ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, "সে যাইবে কোথায়? সে ফিরিবেই। সে আমার।" কিন্তু বিহারী সম্পর্কে বিনোদিনীর পক্ষে অনুরূপ দৃঢ় ঘোষণা করা সম্ভব হলো না। বিহারী আশার হিতাকাঙ্ক্ষী, আশার জন্যে করুণায় বিহারীর হৃদয় ব্যথিত—এটা জানামাত্রই বিনোদিনীর মুখে হিংসার বিদ্যুৎ স্ফুরণ হলো।

আশার কাশীযাত্রার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে যেদিন মহেন্দ্র বিহারীকে আক্রমণ করে কথার ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়লো, সেদিন থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিনোদিনীর মন বিহারীর কাছেই আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। সেদিন মহেন্দ্র বলেছিল :

"বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়াই

বলো। আমার সঙ্গে অসরলতা করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্যে তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহুদূরে লইয়া যাইতে। আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।"

বিনোদিনী ও আশা পাশের ঘরে থাকলেও, কথাগুলো তাদের কানে যায়নি, একথা বলা যায় না। যেহেতু বিহারী পাংশুমুখে টলতে টলতে ঘর থেকে বের হবার সময় মুহূর্তেই বিনোদিনী ব্যাকুলভাবে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে আর্তকণ্ঠে তাকে জানিয়েছিল, বিহারীর অভিপ্রায় অনুযায়ী সেও আশার সঙ্গে কাশীযাত্রায় প্রস্তুত আছে।

"বিহারী চলিয়া গেল। মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল। বিনোদিনী তাহার প্রতি জলন্ত বজ্রের মতো একটা কঠোর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সে ঘরে আশা একান্ত লজ্জায় সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছিল। বিহারী তাহাকে ভালোবাসে, একথা মহেন্দ্রের মুখে শুনিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার উপর বিনোদিনীর আর দয়া হইল না। আশা যদি তখন চোখ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভয় পাইত। সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে। মিথ্যা কথা বটে! বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসেনা বটে! সকলেই ভালোবাসে এই লজ্জাবতী ননীর পুতুলটাকে।..." তারপরেই নজরে পড়ে বিনোদিনীর অন্তর্জ্বালার অনবদ্য বর্ণনা। "ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্যে প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না? সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত, ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।"

আশার অবর্তমানে কলকাতার বাড়িতে বিনোদিনীর আকর্ষণ মহেন্দ্রর পক্ষে ক্রমশই দুর্দমনীয় হয়ে উঠছিল বটে কিন্তু মাঝে মাঝে বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর মনকে তার নিজের প্রকৃত অসহায়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলছিল। মহেন্দ্রের কাছে একদিন অপমানিত হয়ে ফিরে আসবার সময় বিনোদিনী বিহারীকে থামাবার জন্যে তার হাত ধরেছিল বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই বিহারী অপরিসীম ঘৃণার সঙ্গে তাকে ঠেলে ফেলতেই মাটিতে পড়ে গিয়ে বিনোদিনীর হাতের কনুইয়ের কাছে কেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হলো। অপমানিতা বিনোদিনী তারপরেই মহেন্দ্রকে জানাচ্ছে যে, মহেন্দ্রের ভালোবাসা সে তো পায়ে ঠেলবেই না বরং মাথায় করে রাখবে। কেননা, জন্মাবধি ভালোবাসা এতো বেশী পায়নি যে, 'চাইনে' বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বিনোদিনী অনুভব করেছিল মহেন্দ্রের ভালোবাসা লালসারই নামান্তর এবং নিতান্তই দেহাশ্রয়ী। তাই মহেন্দ্র যখন অধীর হয়ে 'বিনোদিনীর কাছে হাতে হাতে ক্ষমা ও ভালোবাসার একটা নিদর্শন পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল তখন বিনোদিনী তাকে কঠিন বিমুখতায় হটিয়ে দিয়েছিল। মহেন্দ্র উপলব্ধি করলো, 'বিনোদিনী অহরহ আকর্ষণও করে, অথচ বিনোদিনী এক মুহূর্ত কাছে আসিতেও দেয় না।' রাজলক্ষ্মী দেরিতে হলেও, ছেলে বিনোদিনীর কবলিত হয়েছে, জানামাত্র নির্মমভাষায় তাকে অপমান করলেন এবং অপমানিতা বিনোদিনীও মহেন্দ্রকে শাণিত বিদ্রূপবাণে উদ্দীপিত করে রাজলক্ষ্মীর সামনেই কবুল করিয়ে নিলে যে, সে বিনোদিনীর সঙ্গে পালাতে প্রস্তুত।

মহেন্দ্রকে না জানিয়ে বিনোদিনী এলো অবশ্য বিহারীর কাছে, উদ্দেশ্য, বিহারীর ভুল ভাঙিয়ে তার কাছে নিজের হৃদয় রহস্য উদ্ঘাটিত করা। জানালে, মহেন্দ্রকে সে পথভ্রষ্ট করেছে বটে কিন্তু তাকে সে ভালোবাসে না। আরো জানালে, বিহারীই ইচ্ছা করলে তার জীবনের মোড় ফেরাতে পারতো, তার সকল কাঁটা ধন্য করে জীবনের ফুল ফোটাতে পারতো। ব্যাকুলভাবে বিনোদিনী জানালে, "আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল? আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্জ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি—তুমিও আমাকে ভালো-বাসিলে না কেন?···যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত,

তাহার কাছে এই রাত্রে ভয় লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কত বড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আজ আশার এমন সর্বনাশ হইত না।"

এক্ষেত্রে বিনোদিনীর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে পালাতে প্রস্তুত হয়েছে—এ সংবাদ পেলে বিহারী যে আশার অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে উঠবে, এ অনুমান বিনোদিনীর পক্ষে করে নিতে দেরি হয়নি। পক্ষান্তরে বিহারী বিনোদিনীকে যদি গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়, তাহলেই একমাত্র বিনোদিনী মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাবার সংকল্প থেকে বিরত থাকতে পারে। কিন্তু দৃঢ়স্বভাব বিহারীর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানতে হলো বিনোদিনীকে। শেষ পর্যন্ত বিহারীর গলদেশ বেষ্টন করে বললে, জীবন-সর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, আজ কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাস, তার পরে আমি আমাদের সেই বনে জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো একটা কিছু দাও।' বলতে বলতে বিনোদিনী তার তপ্ত ওষ্ঠাধর বিহারীর মুখের কাছাকাছি এনেছিল বটে কিন্তু সে রাত্রে সেই ওষ্ঠাধর অচুম্বিত থেকে গেল, প্রধানত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিহারীর সুকঠিন আত্মসংযমের ফলেই। বিনোদিনীকে ফিরে আসতে হলো বারাসতে, জঙ্গলাকীর্ণ স্বামীর ভিটেয়।

পল্লীগ্রামে ফিরে এসে বিনোদিনী যখন মনেপ্রাণে বিহারীকে পেতে চাইছে, দুরাশার গোড়ায় হৃদয়ের রক্ত সেচন করে জগতের আর সমস্ত ছেড়ে কেবল বাঞ্ছিতের শুভানুগমন কামনা করছে, সে সময়ে একদিন তার সন্ধানে মহেন্দ্র হাজির হবামাত্র সঙ্গে সঙ্গেই বিনোদিনী তাকে দূর করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ততদিনে গ্রামেও বিনোদিনীর চরিত্রের কুৎসা রটনার ঢেউ এসে পড়েছে। গ্রামের মেয়ে পুরুষ সবাই এই ভ্রষ্টা বিধবাকে গ্রামে থাকতে দিতেই রাজী নয়। অতএব মহেন্দ্রকে নিয়ে বিনোদিনীকে কলকাতায় ফিরে এসে উঠতে হলো পটলডাঙার বাড়িতে। কিন্তু মহেন্দ্রের লোলুপতা সত্ত্বেও নাটক জমলো না, কেননা—বিনোদিনীর চোখের সামনে বিহারীর ছায়া, তার দিনের চিন্তায় রাতের ভাবনায় বিহারীর স্মৃতি। ফলে, মহেন্দ্রকে ফিরে আসতে হলো নিজের বাড়িতে, স্ত্রী ও জননীর আশ্রয়ে।

কিন্তু একদিকে আশা যেমন মহেন্দ্রের মনে তেমন কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারলো না, অন্যদিকে বিনোদিনীও তেমনি বিহারীর আশ্লেষের আশায় অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রের সঙ্গেই পশ্চিমে চলে গেল অধিকতর অনিশ্চিত পথেই।

কিন্তু আশ্চর্য বিনোদিনীর ক্ষমতা। কোনো চরম মুহূর্তেও মাত্রাজ্ঞান কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সে ভুল করবে না, এই তার পণ। তাই বিদেশে শনিগ্রহের মতো সে ঘুরেছে এবং মহেন্দ্রকে ঘুরিয়েছে। রেলগাড়িতে মহেন্দ্র যখন প্রথম শ্রেণীতে চেপেছে তখন সে স্থান সংগ্রহ করেছে ইন্টার ক্লাসে, মেয়েদের কামরায়। এরকম ভ্রমণ মহেন্দ্রের কাছে নিশ্চয়ই লোভনীয় হতে পারে না। মহেন্দ্র যখন আহার শেষে ঘুমের চেষ্টা করতো, বিনোদিনী ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। তারপর এই এলাহাবাদেই একদিন রাত্রে জ্যোৎস্নামত্তা মুহূর্তে বিনোদিনীকে নিবিড়ভাবে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তার কাছে এসেই মহেন্দ্র জানতে পারলে বিনোদিনী যাকে চায়, যার জন্যে সেজে থাকে, সে মহেন্দ্র নয়, বিহারী।

মার অসুস্থতার সংবাদ দিতে বিহারী এলাহাবাদে এলো মহেন্দ্রের সন্ধানে। বিনোদিনী সুযোগ পেল এবার তাকে সব কথা খুলে বলবার।··· 'আমি একেবারেই নষ্ট হইতে পারিতাম—কিন্তু তোমার কী গুণ আছে, তুমি দূরে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার—তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি—একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, কঠিন মাণিকের মতো আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে। দেবতা, এই তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, সে মূল্য নষ্ট হয় নাই।' এমন সময় মহেন্দ্র ঘরের কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাহ্নের ঘনায়মান অন্ধকারে বিহারীকে দেখে অনুমান করলে বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর পত্রালাপের মাধ্যমেই এই মিলন ঘটেছে। প্রত্যাখ্যাত মহেন্দ্রের গর্বে আঘাত লাগবে, এটা স্বাভাবিক। এতোদিন বিহারী বিমুখ হয়েছিল এখন যদি সে নিজেই এসে ধরা দেয়, তাহলে বিনোদিনীকে ঠেকাবে কে? ব্যর্থ রোষে তীব্র বিদ্রূপের সুরে সে তখন বিনোদিনীর চরিত্রভ্রষ্টতার উল্লেখ করে আক্রমণ করতেই সেই মুহূর্তে তাকে বাধা দিয়ে বিহারী জানালে যে, সে

বিনোদিনীকে বিয়ে করবে, সুতরাং মহেন্দ্র যেন এখন থেকে সংযতভাবে কথা বলে।

পাঁচ

কিন্তু এখানেই চরিত্র বিশ্লেষণের সমাপ্তি নয়। বিহারী উদ্যোগী হতেই বিনোদিনী পিছু হটে এলো। বিহারী যে তাকে ভালোবাসে, এই জানাতেই তার গর্ব ও তৃপ্তি; এই জানাই তার শেষ পুরস্কার; কেননা, বিনোদিনীর বিশ্বাস, এর অতিরিক্ত কিছু চাইতে গেলে 'ধর্ম কখনও তাহা সহ্য করিবেন না।' এবং তার পরেই বিনোদিনীকে বলতে শোনা যায়:

'ছি ছি, একথা মনে করিতেও লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনও হইতেই পারে না।' এবং তার পরেও রয়েছে, 'ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি একাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি মাথা তুলিতে পারিব না।' শেষ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া গেল, অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিনোদিনীর কাশীযাত্রাই স্থির হয়েছে। 'পল্লীসমাজে' রমার কাশীযাত্রার সঙ্গে বিনোদিনীর এ যাত্রার তুলনা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বিনোদিনীর চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ কবিত্বময় বিশ্লেষণ পদ্ধতির নিপুণ নিয়োগ করেছেন। কখনো বর্ণনার মাধ্যমে, কখনো সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের ক্রমবিকাশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কোথাও অতিক্রম করে যেতে পারেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে বিনোদিনী-চরিত্রের ক্রমবর্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্বই সমগ্রভাবে গল্পের মধ্যে গতি ও ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। 'চোখের বালি'র ঘটনাবিন্যাসে জমজমাট ভাব নেই; অনেক সময় মনে হবে ঘটনা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে অত্যন্ত শ্লথগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু বিনোদিনীর চরিত্রদীপ্তি এরূপ ব্যাপকভাবে বিচ্ছুরিত যে, ঘটনাস্থাপনার শৈথিল্য নজরে পড়তে চায় না। এ প্রসঙ্গে একজন সমসাময়িক সমালোচকের কথা উদ্ধৃতিযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

"বিনোদিনীই 'চোখের বালি'র একমাত্র সত্য ; সেই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গল্পটিকে উদ্দীপ্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার দৃপ্ত যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তিই উপন্যাসটির প্রাণ। সে শয়তানী নয়, সে তাহার অবরুদ্ধ কামনার, অতৃপ্ত যৌন বাসনার আগুনে সংসার পোড়ায় নাই, নিজেকে শুধু সে দীপ্তিমতী করিয়াছে। কোথাও সে পাঠকের শ্রদ্ধাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নাই। ক্ষুরের ধারের মত দুর্গম পথেই সে আনাগোনা করিয়াছে, অথচ কোথাও তাহার পায়ের নীচে এতটুকু ক্ষতচিহ্ন নাই। বিনোদিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর স্ফুটতর, স্পষ্টতর, বিস্তৃততর রূপ ; বিনোদিনী দামিনী, অভয়া, কিরণময়ীর পূর্বাভাস।" (নীহাররঞ্জন রায়)

বিনোদিনী চরিত্রের পরিণতিতে যে রকম দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে বিনোদিনীর কথাবার্তা ও আচরণের সামঞ্জস্য নেই বলে কোন কোন সমালোচক অভিযোগ করেছেন। বিনোদিনীর একটিমাত্র অসুবিধে এই ছিল যে, সে বিধবা। অন্যথায় তার যৌবন ছিল, রূপ ছিল, প্রেমে অভিষিক্ত হবার ও নীড় বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু বিনোদিনী যে সমাজের ও যে কালের নারী, সে সময়ে বিধবা নারীর পক্ষে ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন দেখা দুঃসহ স্পর্দ্ধা ও লজ্জাহীনতা বলে বিবেচিত হতো হয়তো। বিনোদিনী চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে স্ফুরণ গোড়া থেকেই নজরে পড়ে এবং চরিত্র-চিত্রণের যে বাস্তব ব্যাখ্যার ওপর যে চরিত্রকে বরাবর সঞ্চারিত দেখতে পাওয়া যায়, শেষ অধ্যায়ে সে চরিত্রে যেন এদু-টি বস্তুরই বিলুপ্তি কতকটা আকস্মিকভাবেই ঘটে এবং বিনোদিনীচরিত্র প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের অন্ধ দেবতার কাছেই আনুগত্যের শপথ জানিয়ে নাটকীয়তার সৃষ্টি করে।

তাহলেও বিনোদিনীচরিত্র কালানুক্রম অনুসারে রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রথম সার্থক সংযোজনা, এই সময় থেকেই বাংলাসাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের শুরুও বলতে পারা যায়। যে যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বিনোদিনী-চরিত্রচিত্রণের ভিত্তি, সেই পদ্ধতির অব্যাহত প্রসার রবীন্দ্র-উপন্যাসের পরবর্তী অনেক চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে নজরে পড়বে। বিনোদিনী-চরিত্র-চিত্রণের শেষ পর্যায়ে জাতীয় সংস্কারের প্রবলতা জয়ী হলেও পরবর্তী-চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধের অঙ্গীকরণ উপন্যাসেব পটভূমিতে

বিশালতা ও উদারতার আলোর স্ফুরণ ঘটিয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের উদার মানবতাবাদের পটভূমিকায় নারীচরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দীপ্তি পরবর্তীকালের উপন্যাসে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। এই দিক থেকে বিনোদিনী-চরিত্রচিত্রণ বাংলা উপন্যাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দামিনী

'চোখের' বালির বিনোদিনীর সঙ্গে চতুরঙ্গের দামিনীর চরিত্রগত মিল অত্যন্ত বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। যদিও উভয়েই অকাল-বৈধব্যের সংস্কারগত অপরিসর সীমামধ্যে বন্দিনী এবং পরবর্তীকালে প্রেমের নবাঙ্কুর উন্মেষের ফলে সত্ত্বাতীত সম্মোহনশক্তির পেষণে পীড়িত, তবুও, আচরণ ও ক্রমপরিণতির দিক থেকে বিবেচনা করলে এ দু-টি চরিত্র চিত্রণের মূলগত স্বাতন্ত্র্যও দৃষ্টি এড়ায় না। মহেন্দ্র, বিহারী ও বিনোদিনীর চিত্ত-চাঞ্চল্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চোখের বালির প্রধান ঘটনা; চতুরঙ্গেও শচীশ, শ্রীবিলাস ও দামিনীর সংগ্রামনিরত হৃদয়বৃত্তির বিশ্লেষণই আখ্যানভাগের মূল বিষয়বস্তু বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। বিনোদিনীর বাবা বিশেষ ধনী না হলেও নিজের একমাত্র মেয়েকে মিশনারী মেম রেখে বহু যত্নে পড়াশোনা ও কারুকার্য শিখিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে, দামিনীর অনুরূপ সুযোগ হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু বিনোদিনী যেমন মহেন্দ্রের বাড়িতে, দামিনীও তেমনি লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমবাড়িতে বই পড়ে ও আলোচনায় মাতে। বিনোদিনীকে দেখা যায় বিষবৃক্ষ বইখানা পড়তে। অর্থাৎ, সেকালের আরো অনেক কিছু লেখাপড়া জানা মেয়েদের মতোই নভেল তার অবসরবিনোদনের নিত্যসঙ্গী। দামিনীও শ্রীবিলাসের মারফৎ ভালো বাংলা বই আনিয়ে রাখতো। বলা বাহুল্য, ভালো বই বলতে দামিনী কিন্তু 'ভক্তি-রত্নাকর' বুঝতো না। কেননা, সে ছিল জীবনরসের রসিক।

চোখের বালিতে বিনোদিনী সর্বদাই প্রতিবাদমুখর, ঈর্ষাপরায়ণ ও ক্ষিপ্র-বেগসম্পন্ন। বিহারী তাকে দেখেই বুঝেছিল এ নারী বারাসতের জঙ্গলে ফেলে রাখবার মতো বস্তু নয়। 'কিন্তু শিখা একভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর একভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়'—সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল। বিনোদিনী সুচতুর বাক্যবাণে সবাইকে বিদ্ধ করতে চায়। মহেন্দ্র, বিহারী এমন কি শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মীও তার শাণিত কথার দীপ্তিতে স্তব্ধ হয়ে যান।

বিনোদিনীর মূল লক্ষ্য বিহারী। বিহারীর ভালবাসার আশ্রয়ে নতুন নীড় বাঁধবার বাসনাই তাকে বিদ্রোহ, ব্যর্থতা, বেদনার লীলালোকে দীপ্তিময়ী করে তুলেছে। এক সময়ে দেখা যাবে বিহারীর কাছ থেকে প্রতিদান পাবার আশায়, বিহারীর উদাসীনতাকে ভাঙবার ইচ্ছায় এমন পথে সে অগ্রসর হয়েছে যে পথ ঘর ভাঙবার, ঘর জ্বালাবার পথ। একদিকে মহেন্দ্রকে নানা-ভাবে আকর্ষণ করে উন্মত্ততার পথে ঠেলে দিতে ইতস্তত করেনি। অন্যদিকে অন্ততঃ আশাকে তার আশু সর্বনাশ থেকে উদ্ধার করার জন্যে বিহারী এগিয়ে এসে বিনোদিনীর প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করুক এমনই একটা পরিণতির দিকে সে ঘটনাস্রোতকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছিল। অবশ্য বিহারীর অনমনীয় ব্যক্তিসত্তা বিনোদিনীর আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি এবং যতোদিন পর্যন্ত না বিজয়িনী রঙ্গিণীর ভূমিকা ত্যাগ করে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নিজের হৃদয়ের মর্মকথা সে বিহারীর কাছে উন্মোচিত করেছে ততদিন পর্যন্ত বিহারীও দূরে-দূরেই থেকেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীর অশ্রুসজল করুণ স্বীকারোক্তিতে বিহারী অভিভূত না হয়ে পারেনি। বিনোদিনীর পুষ্পমঞ্জরী তুল্য চুম্বনোন্মুখ মুখের স্মৃতি বিহারী তার স্মৃতিলোক থেকে নির্বাসিত করে দেওয়ার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীর অসহায়তায় বিচলিত হয়ে সে বিনোদিনীকে বিয়ে করতেও রাজী হয়েছে। তারপরেই দেখা যায় বিনোদিনী পশ্চাদপসরণের পক্ষপাতী। বিহারী তাকে বিয়ে করলে সমাজে খাটো হয়ে পড়বে, ধর্ম এরূপ কাজ সহ্য করবে না এসব যুক্তি দেখিয়ে বিনোদিনী তখনকার দিনে বিধবা ও বৃদ্ধাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল কাশীতে গিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে।

দামিনী কিন্তু এই আত্মত্যাগ দেখাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শচীশকে ভালোবাসলেও সে ভালোবাসার প্রতিদানে সে কিছুই পায়নি। শচীশ যে সময়ে উদাসীন এবং কোথায় ফিরছে তার সন্ধান নেই, লীলানন্দ স্বামীর কাছে যাওয়াও যখন আর সম্ভব কি সঙ্গত নয় ঠিক সে সময়েই শচীশের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দামিনীর শুভানুধ্যায়ী শ্রীবিলাস দামিনীকে বিয়ে করে নতুন সংসার সাজাবার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়। শ্রীবিলাসের হৃদয়ে উদারতা, ভদ্রতা, মমত্ববোধ ও ভালোবাসা—এসবের কোনোটারই অভাব কখনো

দেখা যায় নি। দামিনীর জীবনের সমগ্র পর্বের ইতিহাস জেনেই সে দামিনীকে গ্রহণ করেছে এবং দামিনীর ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা যাতে দূর হয় তার জন্যে কতো দিক থেকেই না চেষ্টা করেছে। কিন্তু দামিনী ভদ্র ও অমায়িক শ্রীবিলাসের বন্ধনকে অঙ্গীকার করে নিয়েও খুব অল্পকালই সে নীড়ের ছায়ায় থাকতে পেরেছে। "যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই'।"

দামিনীর চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ যে অব্যর্থ মিতব্যয়িতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন বাংলা উপন্যাসে তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। অলঙ্কারবর্জিত রেখাচিত্রময় বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে দামিনীচরিত্র আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। চোখের বালিতে বিনোদিনীর বক্তব্য অনেক জায়গায় এরূপ প্রতিবাদমুখর যে, কথার পর কথা গেঁথে শাণিত যুক্তির অবতারণায় সে প্রতিবাদ বিস্তারিত হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে, দামিনীর বিদ্রোহে, দামিনীর প্রতিবাদে বাক্যবিন্যাসের সুযোগ থাকে না। দামিনী সজাগ হলেও স্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুটি একটি তীক্ষ্ণ কথায় সে তার হৃদয়লোককে অল্পক্ষণের জন্যে উদ্‌ঘাটিত করে মাত্র। অন্ধ সংস্কার ও অচল অভ্যাসের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম কোথাও ভারাক্রান্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠেনি।

দামিনীর আকাঙ্ক্ষা আপন হাতে মনের মতো করে সংসার সাজাবার। কিন্তু বিয়ের অল্প কিছুকাল পরেই তার স্বামী শিবতোষকে দেখা গেল লীলানন্দ স্বামীর কাছে মন্ত্র নিয়ে জীবন্মুক্ত হবার প্রয়াসী হতে। কিন্তু দামিনী জীবন-রসের রসিক, গুরুবাদের মহিমায় আত্মস্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি ঘটাতে সে রাজী হতে পারে না। ফলে, শিবতোষ মরবার আগে সম্পত্তিসমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করলেও দামিনী গুরুর ঘরের অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউয়ের মধ্যে তলিয়ে যেতে আপত্তি জানাবে এটা স্বাভাবিক। দামিনীর বেশভূষা বিধবার মতো নয়, গুরুর উপদেশবাক্যের কাছ দিয়েও সে যায় না। এতো বড়ো একজন মহাপুরুষের কাছে থাকলেও সংযমে শুচিতায় তার শরীর মন আলো হয়ে উঠলো না। লীলানন্দ স্বামী ক্ষমাশীল

মহাপুরুষ। কিন্তু গুরু তাকে ক্ষমা করবে এ চিন্তাও যেন দামিনীর কাছে অসহ্য। লীলানন্দ স্বামীর মহানুভবতাকে দামিনী কখনও মনে মনে, কখনও সঙ্গিনীর কাছে কথাবার্তায়, প্রকাশ্যভাবেই পরিহাস করতে থাকে। কিন্তু নিজেরই অজ্ঞাতে ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহের কর্কশ আবরণ দীর্ণ করে আত্মোৎসর্গের ফুল ফুটে উঠলো। দামিনীর সেবাপরায়ণতায়, প্রাত্যহিক কর্মনিষ্ঠায় বাড়িতে মাধুর্যের সঞ্চার অচিরেই সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু দামিনীর জীবনে তারপরেই অস্থিরতার তরঙ্গ তুললো শচীশ। যে দামিনী লীলানন্দ স্বামীর সম্প্রদায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় ছিল সে দামিনীই শচীশের আকর্ষণে বসন্তের পুষ্প-বনের মতোই লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে ভরপুর হয়ে উঠতে লাগলো। তখন থেকেই সন্ন্যাসীকে সে ঘরে স্থান দিতে নারাজ। বসন্তের হাওয়া যার অঙ্গ স্পর্শ করেছে উত্তুরে হাওয়াকে সে সিকি পয়সা খাজনা দিতে চাইবে না এটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

দামিনী সম্পর্কে শ্রীবিলাসের বক্তব্য: 'দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ, অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে।' শচীশ দামিনীর শোভা দেখেছে কিন্তু কেবল শোভার দিকেই তার দৃষ্টি, দামিনীকে সে দেখতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

দামিনী মনেপ্রাণে চেষ্টা করেছে শচীশের উদাসীন ও সংসারবিমুখ মনকে সংসারের দিকে, ভোগের দিকে আকর্ষণ করতে। শচীশের অজ্ঞাতসারে শচীশের ঘরে এসে লীলানন্দস্বামীর ধ্যানমূর্তির ফটোগ্রাফখানা ভেঙ্গে দামিনীই যে মেঝের ওপর টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু শচীশ তখন পর্যন্ত অন্যমনস্ক। তাই, তার পোষা বেড়ালটা এই কাণ্ড করেছে বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তার দেরি হয় না। অন্তর বেদনায় দামিনী ক্লিষ্ট হতে থাকে।

কিন্তু একদিন ভয়ে শচীশের সারা শরীর কেঁপে উঠলো দামিনীর এই অন্তর বেদনার পরিচয় পেয়ে:

"একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কি একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া

চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেঝের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, 'পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেল।" বলাবাহুল্য, যেমন নিঃশব্দে এসেছিল ঠিক তেমনি নিঃশব্দেই কিন্তু দ্রুতগতিতে সেদিন বজ্রাহত শচীশকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

তারপর গুহার অন্ধকারে সেই অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেদিন আদিম জন্তুকে শচীশ স্পষ্ট করে চিনতে না পারলেও সে তার অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছে তা থেকে দামিনীর হৃদয়ের বুভুক্ষা ও অন্তর্জ্বালার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে। শচীশ রূপের বন্ধন স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, রসের সমুদ্রে মুক্তিই তার কাম্য। দামিনী শচীশকে রূপের বন্ধনে বাঁধতে চায় এবং যেহেতু দেহ রূপের আধার তাই দেহকে বাদ দিয়ে সে বাঁচার কথা চিন্তা করতে পারে না। পক্ষান্তরে শচীশ দেহনির্ভর রূপের বন্ধনকে অতিক্রম করে অরূপরসের স্বর্গলোকের স্বর্ণদ্বার খুঁজে বেড়ায়, দামিনীর রক্তমাংসে গড়া শরীরের অভ্যন্তরে সে আদিম জন্তুর ক্ষুধাকেই প্রত্যক্ষ করে। শচীশ যে কেমন করে কোন্ বলে রক্ত মাংসের আবেদনকে, রূপের আধাবকে এতো সহজে এড়িয়ে যেতে পারে দামিনীর কাছে সে এক রহস্য। দামিনী গোড়ার দিকে ভেবেছিল শচীশ বোধ হয় রসের সন্ধানে, রূপহীন অবাস্তবের পশ্চাতে অধিক-কাল ঘুবতে পারবে না ; তাকে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিতে হবেই রূপের আহ্বানে, যে-রূপ দামিনীর দুর্বার যৌবনের বন্যার মধ্যে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। লীলানন্দ স্বামীর আখড়ায় যে রসের লীলা চলেছে তার মধ্যে শচীশের অবস্থান দামিনীর কাছে বেমানান ঠেকে। দামিনী যেমন এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে চায় শচীশের হৃদয়মনকে নিজের দিকে টেনে এনে সে তেমনি শচীশকেও মুক্ত করতে চায়।

কিন্তু লীলানন্দ স্বামী ও তাঁর অন্য অনুগামীদের সঙ্গে শচীশের পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে দামিনীর বিলম্ব হয় না। লীলানন্দ স্বামীর কাছে দল আগে, আখড়ার বিস্তৃতি আগে, ভাবরসের চর্চা তার পরের ব্যাপার। দামিনীর বুঝতে কষ্ট হয়নি যে শচীশ যে ভাবে শারীরিক ক্লেশ বরণ করেছে, যে রকম নির্লিপ্তভাবে রসের সন্ধানে ঘুরেছে তার মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই, আড়ম্বরের কোনো ভূমিকা নেই। শচীশের এই নির্লিপ্ত তন্ময়ভাব দামিনীর

অন্তরলোকে সেবার জন্যে উন্মুখতা সৃষ্টি করেছে, শচীশের অবহেলিত দেহটাকেই সে দেহ দিয়ে প্রাণ দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছে!

দামিনীর টান মাটির বাসার দিকেই, আকাশের দিকে নয়। লীলানন্দ স্বামী এসত্য জানতেন বলেই গানে কীর্তনে মন দিলেন যাতে 'মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে।' কিন্তু হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে উপচে পড়লেও দামিনী তো ধরা দেয় না। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দামিনীর অনুপস্থিতি শচীশ ও শ্রীবিলাস উভয়ের কাছেই উপলব্ধির বিষয় হয়ে উঠেছিল। দামিনীর কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হতে হয় রসতীর্থের পথিক শচীশকেও। কতো মানী গুণী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করে অথচ দামিনীর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ। দামিনীর টান যে মাটির দিকে তার প্রমাণ পেতে দেরি হয় না। টেলিগ্রাফের তারে ঘা খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া চিলকে লোভী কাকের দলের হাত থেকে সে উদ্ধার করে আনে। দিনের পর দিন শুশ্রূষা চলে। কোথা থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা জুটিয়ে আনে। কিংবা বাড়ির ছাদের কোণে ভাঙা হাঁড়িতে ফুলগাছের চর্চায় অধিকমাত্রায় মনোযোগী হয়ে পড়ে। শচীশ দামিনীর অশান্ত মনকে শান্ত করতে চায়। কিন্তু দামিনী যে তাকেই অবলম্বন করে কৃতার্থতার ফুল ফোটাতে চায়, এসত্য তার উপলব্ধির মধ্যে নেই। শচীশ গুরুজীর কাছে দামিনীকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করে। বলাবাহুল্য, সে প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই উপেক্ষিত হয়। 'তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়? জোড়হাত করি তোমাদের, রক্ষা করো আমাকে—আমি শান্তিতেই ছিলাম, আমি শান্তিতেই থাকিব।' বলতে বলতে সে জ্বলে ওঠে।

শচীশের বিবেচনায় মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করবার জন্যেই তারা নানারূপে সজ্জিত হয়ে পুরুষের মন ভোলায়। তাই দামিনীকে সে দূরে দূরে রাখতে চায়। শচীশ কিছুকালের জন্যে সমুদ্রের ধারে একলা বেড়িয়ে আসতে প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের ধার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার চেহারা দেখে স্তব্ধ হয়ে যায় দামিনী। 'প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপট-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা: চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।'

"শচীশ বলিল, 'দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম—আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।'

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ও কী কথা আপনি বলিতেছেন।'

'না, আমাকে মাপ করো। আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামতো ছাড়িতে বা রাখিতে পারি এত বড়ো অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না—কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।'

দামিনী তখন নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, 'আমাকে হুকুম করো তুমি।'

শচীশ বলিল, 'আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাৎ হইয়া থাকিও না।'

দামিনী কহিল, 'তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না।'

শচীশ ভেবেছিল দামিনীকে যখন দূরে দূরে রাখা সম্ভব নয়, অন্যত্র কোথাও ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয় তখন তাকে বরং কাছেই রাখা হোক, গুরুজী ও শিষ্যদের মধ্যেই সে সেবা ও ত্যাগের মহিমায় সার্থক হয়ে উঠুক।

'পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চনায় সেবায় মাধুর্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। যখন কীর্তনের আসর জমিত, গুরুজী যখন আলোচনায় বসিতেন, যখন তিনি গীতা বা ভাগবত পাঠ করিতেন, দামিনী কখনো একদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিত না। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল; দিনের মধ্যে যখনই তাকে দেখা গেল মনে হইল, সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।...'

কিন্তু গুরুজীর সঙ্গে ব্যবহারেই দামিনীর সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। লীলানন্দ স্বামীর অনুরোধ কিংবা উপদেশকে সে খুব কদাচিৎ বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেছে। শচীশের কাছে সে প্রতিশ্রুত, সে কোনো অপরাধ করবে না। তাই গুরুজীর কাজে সে যতোটুকু নত হতো সে শচীশের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখেই। কিন্তু সেখানেও দামিনী যখন নত হতো তখনও তার চোখের কোণে রুদ্র তেজের ঝলক দেখা

যেতো। দামিনী গুহামধ্যে শচীশের পদাঘাত যেদিন গ্রহণ করেছিল সেদিন থেকেই শচীশকে সে সত্যের উপাসক বলে জেনে এসেছে, লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে তুলনা করে শচীশের জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করেছে। শচীশের জীবনদর্শনের তত্ত্বকথা বোঝা দামিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু স্বকীয় লক্ষ্যে পৌছাবার চেষ্টায় শচীশ যে অমানুষিক ক্লেশ বরণ করেছে, স্থূল রূপের আকর্ষণ এড়িয়ে পথে পথে ঘুরেছে তার তুলনায় লীলানন্দ স্বামীর আখড়ায় শাস্ত্র-আলোচনা ও নাম কীর্তনেব গতানুগতিক ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়েছে। তাই গুরুজী যখন শচীশকে নিজের সেবায় ডাকেন, যখন শচীশ গুরুজীর কলিকায় ফুঁ দিতে থাকে তখন সেই ব্যাপারটা দামিনীর কাছে একেবারেই অসহ্য মনে হয়। কিন্তু অন্তরে দগ্ধ হলেও দামিনী আগের মতো প্রকাশ্য বিরোধিতায় তার বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে না। কেন না, সে শচীশকে কথা দিয়েছে : অপরাধ করবে না।

নবীনের স্ত্রীব আত্মহত্যার সংবাদে দামিনীর মনে আবার আলোড়নের সৃষ্টি হলো। নিছক রসের চর্চায় পৃথিবীর কী প্রয়োজন সে প্রশ্নই তার শচীশের কাছে জিজ্ঞাস্য :

‘তোমরা দিনরাত ‘রস রস’ করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান ; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করবার কি উপায় তোমরা করিয়াছ?’

দামিনী আরো জানায় যে শচীশের গুরুর কাছ থেকে সে তেমন কিছুই গ্রহণ করতে পারে নি যাতে তার উতলা মন এক মুহূর্তের জন্যেও শান্ত হতে পারে। দামিনী আরো জানায় যে, আগুন দিয়ে আগুন নেভানো সম্ভব হতে পারে না। শচীশের গুরু লীলানন্দ স্বামী যে পথে সবাইকে আহ্বান করছেন সে পথে ধৈর্য নেই, বীর্য নেই, শান্তি নেই। ‘ওই যে মেয়েটা মরিল রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে?’ দামিনীর অনুরোধ ঐ রসের রাক্ষসীর কাছে তাকেও যেন বলি না হতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে জানালে যদি কেউ দামিনীকে বাঁচাতে পারে তো সে শচীশ। দামিনী শচীশের কাছে

এরকম মন্ত্র চাইলো যাতে সে বেঁচে যেতে পারে। দামিনী শচীশকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে এ প্রস্তাবে শচীশকে রাজী হতে হলো। দামিনী শচীশের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললে: 'তুমি আমার গুরু, আমাকে সকল অপরাধ থেকে বাঁচাও'।

দামিনী ছায়ার মতই শচীশকে অনুসরণ করতে চায়। যেখানেই শচীশের শারীরিক ক্লেশ সেখানেই দামিনীর সেবাপরায়ণ বাহু উত্তোলিত হবে দামিনীর আকাঙ্ক্ষা এ ছাড়া আর কিছুই নয়। শচীশের মনের ওপর সে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি বটে কিন্তু শচীশের শারীরিক যন্ত্রণার নিরসন তার কাম্য। কখন শচীশের মত বদল হয়, কখন সে আবার রসের সন্ধানে পথে নেমে উধাও হয়, এই ভয় দামিনীর থেকে যায়।

লীলানন্দ স্বামীর দল থেকে যেদিন শচীশ তার বন্ধু শ্রীবিলাস এবং দামিনীকে নিয়ে চলে এলো সেদিন দামিনীর পক্ষে স্মরণীয় ঘটনা বলা যেতে পারে। লীলানন্দ স্বামীর পথ যে শচীশের পথ হতে পারে না দামিনীর কথা ও বিতর্কের মাধ্যমে এ সত্য শচীশ হৃদয়ঙ্গম করছে বলতে পারা যায়। বন্ধু শ্রীবিলাসের কাছে শচীশ যখন বলে: 'একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম, সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম, সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই।' তখন বুঝতে বাকী থাকে না যে শচীশ নতুন উপলব্ধির পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে। দামিনীর সামীপ্য তার এই আত্মানুসন্ধানকে জাগ্রত করেছে বলতে পারা যায়।

লীলানন্দ স্বামীর আশ্রয় ছাড়বার পর নদীর ধারের পোড়ো বাড়িতে বাস করবার ব্যবস্থা হতেই দেখা গেল আবার শচীশ সাধনার ব্যাকুলতায় অধীর হয়ে উঠেছে। শ্রীবিলাসের জবানীতে বলতে পারা যায় শচীশ যেন জ্বলছে, তার জীবনটা একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। 'আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।' অথচ এই খাপছাড়া মানুষটাকেই দামিনী নাকি নিয়মে বাঁধতে চায়। কতরকম কৌশলেই না সে শচীশকে সময়মতো নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টায় উদগ্রীব হয়। কিন্তু শচীশ ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকে যে তার সাধনার পথে এ

ব্যাপারটাও প্রচণ্ড একটা বন্ধনের মতো। তাই নদী পার হয়ে ওপারের বালুচরে গিয়ে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশকে বসে থাকতে দেখা যায়। শ্রীবিলাসের কাছে দামিনী বলে: 'আমি যে স্ত্রীজাত—ওই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।' কিন্তু শচীশ এদিকে নতুন উপলব্ধির পথে পা বাড়িয়েছে; রূপ থেকে অরূপের দিকে ছুটে যাবার সাধনায় ব্যাকুল। তাই, শেষ পর্যন্ত, দামিনী তাকে রূপের বন্ধনে গণ্ডীবদ্ধ রাখতে পারলো না।

শ্রীবিলাস যেদিন নদীতীরে পোড়ো বাড়িটাতে থাকার প্রস্তাব করেছিল সেদিন বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত প্রসঙ্গে শচীশ দামিনীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েছিল। 'সে চাহনিতে হয়তো একটু ভয় ছিল।' কাজেই একদিন যখন ঝড়ের রাতে তুমুল মুষলধারায় বৃষ্টিবর্ষণের মধ্যে শচীশের অন্ধকার ঘরের মধ্যে দামিনী খোলা জানালা বন্ধ করবার জন্যে ঢুকলো সেদিন শচীশ মুহূর্তকালের জন্যে একটু দ্বিধা করেই তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে ছুটে যায়। দামিনীও এক দৌড়ে তার পায়ের কাছে ছুটে এসে পড়ে। বলে: 'এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ।' শচীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দামিনী জানায় শচীশ বরং তাকে পদাঘাতে নদীর মধ্যে ফেলে দিক কিন্তু তবুও শচীশ যেন ঘরে ফিরে যায়। ঘরে ফিরে এসেই শচীশ দামিনীকে বলে: 'যাকে আমি খুঁজিতেছি তাকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।'

দামিনী সেদিন শচীশের এ প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল। কলকাতায় যখন সে ফিরে এলো তখন তার একমাত্র অবলম্বন শ্রীবিলাস। শ্রীবিলাসকে বিয়ে করতে দামিনীর বাধে নি; কারণ, শচীশের সান্নিধ্যে এসে তারা উভয়ে উভয়কেই নিবিড়ভাবে জানতে ও বুঝতে পেরেছিল। শ্রীবিলাস সম্পর্কে দামিনীর সচেতনতা কখনো এর আগে দৃঢ়নিবদ্ধ হতে পারে নি। কারণ, অন্য দিক থেকে তার চোখে বেশী কিছু আলো এসে লেগেছিল। সে আলোর

উৎস শচীশ। কিন্তু শচীশকে ছেড়ে আসতেই, অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে শ্রীবিলাসের দিকে চোখ মেলে তাকাতে হলো, তার উদারতা, মমত্ববোধ ও নিভৃত ভালবাসার মধ্যে নীড়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে তাই দামিনী কুণ্ঠিত হলো না। শুধু তার অনুরোধে শচীশকে বিয়ের সময় উপস্থিত থাকবার জন্যে নিয়ে আসা হলো।

কিন্তু দামিনী শেষ পর্যন্ত দামিনীই। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে। তাই শ্রীবিলাস বিয়ের পর যাকে কাছে পেল 'সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল।' শ্রীবিলাসের কথা থেকে জানা যায় সুখ তার কাম্য হলেও সুখ দাবি করার অধিকার তার ছিল না। তার কারণ, সে নিজেই দামিনীকে বিয়ে করতে রাজী করিয়েছিল। 'কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে শাহানা রাগিণীর তানে তো আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই। দিনের আলোতে সব দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।'

শ্রীবিলাসকে বিয়ে করে দামিনী সহজ ও সুস্থির হতে পারেনি, কারণ, বাইরের সহজ আচরণ মনকে সহজ করে না। গুহা থেকে ফিরে আসার পর দামিনীর বুকের মধ্যে যে ব্যথার সূচনা হয়েছিল তার ফলেই দামিনীর মৃত্যু হলেও এ ব্যথা আসলে মানসযন্ত্রণার প্রতীক এবং দীর্ণ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দামিনী শ্রীবিলাসকে বলেছিল : 'এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য ?'

চোখের বালির শেষ পর্যায়ে বিহারী যখন বিনোদিনীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে তখনই বিনোদিনী তার পরম আকাঙ্ক্ষিত অধিকারবোধ সম্বন্ধে সজাগ হয়েছে, ভালোবাসার প্রতিদানের সূচনায় পরিতৃপ্ত হয়েছে। সে যে বিহারীকে বিয়ে করতে রাজি হলো না তার কারণ সমাজ-জীবনে সে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, উভয়ের গৌরবকে অব্যাহত রাখতে চায়। সে-কারণেই বিনোদিনী শোকান্তিকার নায়িকায় পরিণত হয় না, পাঠকমন আশ্চর্য হয় মাত্র। পক্ষান্তরে দামিনীকে পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডির নায়িকা বলা চলে। সে চিড়খাওয়া আকাশ কিংবা বিদ্যুৎ-দীর্ণ নীড়। দামিনী চেয়েছিল রূপের জগতে শচীশকে বাঁধতে ; শচীশ প্রথম দিকে তার শোভা দেখেছে কিন্তু

দামিনীকে দেখেনি। কিন্তু শচীশ যখন একসময় দামিনীর যৌবন জড়িত রূপের দিকে আকর্ষণ অনুভব করলো তখন পাছে রূপের বন্ধন তার রসের আনন্দ নিকেতনে পৌঁছাবার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটায় এই আশঙ্কায় অন্তর্দ্বন্দ্বে অবিরত বিক্ষত হতে থাকে। শচীশের এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব সম্পর্কে দামিনীর সচেতনতা কখনো হ্রাস পায়নি বলেই দামিনী তাকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়ে পরস্পরের মধ্যকার বন্ধনটাকে স্বাভাবিক করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু শচীশ সে সম্পর্কটাকেও শেষ পর্যন্ত ভয় করেছে, দামিনীর সেবাযত্নকে কিছুদিন স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করবার পরেও হঠাৎ বন্ধনের ব্যাপ্তিকে অনুভব করে অতর্কিতভাবেই দামিনীর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসে নায়ক নায়িকার মৃত্যুদৃশ্যে আখ্যানভাগের পরিসমাপ্তি নজরে পড়ে না। চতুরঙ্গের নায়িকা দামিনীর মৃত্যু এই দিক থেকে উল্লেখ-যোগ্য ব্যতিক্রম। মহৎ উপন্যাসে এবং নাটকে ট্র্যাজিক হিরোর অভাব নেই, আঙ্গিকের দিক থেকে বিবেচনা করলে চতুরঙ্গ হয়তো সর্বতোভাবে মহৎ উপন্যাসও নয়, কিন্তু দামিনী চরিত্রে যে ট্র্যাজিক হিরোয়িনের অনেক রূপকলক্ষণ বর্তমান সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সঙ্কেতে, ব্যঞ্জনায় ও আভাসে দামিনীচরিত্রের অন্তর্নিহিত চরিত্ররূপ বিমূর্ত। চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে এরূপ সুন্দর রূপকল্পনা রবীন্দ্র-উপন্যাসে এবং পরবর্তী আধুনিক বাংলা উপন্যাসেও বেশী নেই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাইকমল চরিত্রসৃষ্টিতে এই অনন্য রূপকল্পনার ভিন্নতর বিকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারে। চরিত্রচিত্রণের এই বিশেষ ধারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। শচীশকে যখন দামিনী মনে মনে বরণ করেছিল, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধামিশ্রিত হৃদয় নিয়ে তার জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল তখন ঘর বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা, একটা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে ভালোবাসাকে মধুর করে তুলবার তীব্রতা, তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে ক্রমশই দামিনীকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে ফেলছিল হয়তো। শ্রীবিলাসকে বিয়ে করে দামিনী কিন্তু নিজের মনটাকে ঘরমুখী করতে পারল না। সুখকে নানা কর্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সে আশ্বস্ত হতে চেয়েছিল। শ্রীবিলাসের সঙ্গে কর্মের প্রতিযোগিতায় হার মানবে না, এই তার পণ। কাছাকাছি থেকেও পরস্পরকে দূরে রাখার এ একটা সৎ উপায় সন্দেহ নেই। দামিনী সম্ভবত এ কারণেই শ্রীবিলাসের কাছে কৃতজ্ঞ;

যাকে সে এজীবনে দিতে পারল না তাকে জন্মান্তরে পাবার বাসনা রইলো এই আকাঙ্ক্ষাই তাই মৃত্যুকালে দামিনী প্রকাশ করে গেল সঙ্গতভাবেই।

দামিনীচরিত্রের শিল্পরূপায়ণ সাঙ্কেতিকতার দিক থেকেও সার্থক। শচীশ যদি আকাশ হয় দামিনী নীল আকাশের নীচে অবস্থিত নীড়। আকাশময় যেখানে বিস্তৃতির অবকাশ সেক্ষেত্রে নীড়ে মায়াময় বন্ধনের সজীব আকর্ষণ। শচীশ রসের জগতে সমুদ্রসন্ধানী, দামিনী রূপের জগতে মায়াসঞ্চারী আশা। শচীশ যদিও বিবাগী তবু শেষ পর্যন্ত রসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেছে কিনা সন্দেহ। দামিনীও নীড় বাঁধতে চেয়েছে কিন্তু রূপের জগতে প্রকৃত শান্তি খুঁজে পায়নি একথা মেনে নেওয়া চলে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে নিছক রস কিংবা রূপ যে পরিতৃপ্তির সঙ্গে জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে পারে না এ বোধ পাঠকমনে সঞ্চারিত হওয়াও স্বাভাবিক। রূপ ও রসের যে সমন্বয়সাধন শচীশ ও দামিনীর জীবনসাধনাকে মহিমান্বিত করতে পারতো তার অভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে মূল আখ্যানভাগ শোকান্তিকায় পরিণত হয়েছে।

কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র শচীশ না দামিনী এ প্রশ্ন যখন পাঠকসমাজের মনে জাগে তখন আখ্যানভাগের গোড়া থেকেই শচীশচরিত্র যে ভাবে ঘুরেছে ফিরেছে তা দেখে শচীশকেই মূল চরিত্র বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। জ্যাঠামশাই জগমোহন, লীলানন্দ স্বামী, দামিনী ও শ্রীবিলাস এই চারটি চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়েই শচীশ আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে, দামিনী নানা ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে থেকে থেকেই উঁকি মেরেছে, অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের জন্যে দেখা দিলেও আখ্যানভাগের মূল ঘটনা-প্রবাহকে তার দীপ্তি ও তেজের আলোকে বিকীর্ণ করেছে। শেষ অধ্যায়ে দামিনীর মৃত্যুকালীন করুণ উক্তি শাণিত শরের মতোই হৃদয়কে বিদ্ধ করে অথচ শচীশের পরিণতির আর কোনো উল্লেখই থাকে না। বেদনাক্ষত দামিনীর অতৃপ্ত মনের আলোড়ন কান্নার জোয়ারে ফুলে ফুলে ওঠে। তখন শচীশের কথা পাঠকের মনে থাকে কিনা সন্দেহ। এই দিক থেকে দামিনীকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বলে মেনে নিতে বাধা থাকে না।

বিমলা

*

চোখের বালির বিনোদিনী চরিত্রে বাঙ্গালী নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রথম স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। যে বিধবা নারী যৌবনজ্বালায় নিপীড়িত, সামাজিক অন্ধ সংস্কারের বাধানিষেধের অন্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ এবং যৌন-জীবনের ব্যর্থতাজনিত বিদ্বেষের নাগপাশে একান্ত জর্জর সেরকম এক অকৃতার্থ নারীর বঞ্চনাবেদনার অনবদ্য বর্ণনায় চোখের বালির মূল আখ্যান-ভাগ মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছে। আচারলুপ্ত প্রথার এবং সামাজিক অন্ধ সংস্কারের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিনোদিনীর প্রকাশ্য বিদ্রোহ, বাস্তবস্পর্শহীন অবাঞ্ছিত সঙ্কীর্ণ আদর্শের প্রতি উপেক্ষা, প্রেমে অভিসিক্ত ও স্পন্দিত হবার জন্যে ব্যাকুল ও কাতর উজ্জীবন বিনোদিনীর চরিত্র চিত্রণে যে স্বাতন্ত্র্য এনেছে তার মধ্যেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাথমিক সূচনা বলা চলে।

ঘরে বাইরে উপন্যাসে বিমলাচরিত্রে নারীর এই নবলব্ধ ব্যক্তিকতার আরো সুপরিণত শিল্পরূপায়ণ সুস্পষ্ট। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীজীবনের নানা সংস্কারের যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিনোদিনীর চরিত্ররূপায়ণ সীমিত বিমলা-চরিত্রে তার আরোও বিস্তৃতি, আরোও ব্যাপ্তি নজরে পড়বার সুযোগ রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, বিমলা বিনোদিনীরই আরো মার্জিত, সংহত ও পরিণত রূপ, বিশ্বসাহিত্যের নারীচরিত্র চিত্রণের বিস্তৃত আদর্শের পটভূমিকায় বিকীর্ণ। বিনোদিনী যে সমাজ-ব্যবস্থার পটভূমিকায় চিত্রিত বিমলার কালে তার প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে এসেছে, অন্ধ সংস্কারের বন্ধন অনেক পরিমাণেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে, বিমলা অধিকতর রূপ ও দীপ্তি নিয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত হতে পেরেছে।

ঘরে বাইরের বিমলাচরিত্র উপন্যাসের শুরু থেকেই আত্মানুসন্ধানের পক্ষপাতী। বলতে গেলে বিমলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আত্মসচেতন এবং অনেক পরিমাণেই আত্মকেন্দ্রিকও বটে। তার স্বামী নিখিলেশ সুশিক্ষিত, উদারতাসম্পন্ন ধ্যানধারণায় নিবিষ্টচিত্ত। বিমলাও লেখাপড়া করেছে এবং মিস গিল্‌বির কাছে আধুনিক কালের নিঃসঙ্কোচ পাঠ গ্রহণ

করেছে। বিমলার শ্বশুর পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। 'তার কতক কায়দাকানুন মোগল পাঠানের, কতক বিধিবিধান মনু পরাশরের'। কিন্তু বিমলার স্বামী নিখিলেশ একেবারে একেলে। তার বড়ো দুই ভাই মদ খেযে অল্প বয়সে মারা গেছে। কিন্তু নিখিলেশ মদ খায় না। এ বংশে সেই প্রথম লেখাপড়া শিখে এম-এ পাশ করেছে। বিমলা কিশোর বয়সে এই সংসারে প্রবেশ করেছে। যৌবনের মাঝামাঝি পৌঁছতে না পৌঁছতে সে উপলব্ধি করেছে সে যেন আর এক যুগে এসে পড়েছে। স্বামীর কাছে বিমলা জেনেছে স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। কিন্তু তার মন যেন এ সিদ্ধান্তে সায় দিতে চায়নি। বিমলা চেয়েছিল নারীর স্বাভাবিক সংস্কার সূত্রেই স্বামীকে ভক্তি করতে, পূজো করতে। তার ধারণা, এই মনোভাব থাকলেই স্ত্রীলোকের ভালোবাসাও পরিশুদ্ধ ও পরিশোধিত হতে পারে।

বিমলার আসার আগে নিখিলেশদের বাড়িতে খুব অল্প স্ত্রীই নাকি যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছে। পূর্বপুরুষদের মদের ফেনা আর নটির নূপুরনিক্কণের তলায় স্ত্রীদের সমস্ত কান্না তলিয়ে যেতো। কেবলমাত্র 'বড়ো ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে এই প্রবঞ্চিত স্ত্রীরা মাথাটাকে কোনরকমে উপরে ভাসিয়ে রাখতেন। অথচ নিখিলেশের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। মদ সে স্পর্শ করেনি, পূর্বপুরুষদের অনেকের মতো 'নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে' ফেরবার কথা তার ধারণায় কখনোই আসতে পারেনি। বিমলা মাঝে মাঝে ভাববার চেষ্টা করেছে এই অঘটনের সমস্ত কৃতিত্ব তার নিজের কিনা। বিমলার সাজসজ্জায় আধুনিকতার আধিক্য নিঃসন্দেহে স্বামীর সমর্থন পেয়েছে। স্বামী যে তাকে হালফ্যাসানের সাজসজ্জায় সাজিয়েছে, রঙ বেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ পেটিকোটের শোভায় সুসজ্জিত করতে চেয়েছে এঘটনায় তার দুই সুন্দরী বিধবা জায়ের ঈর্ষার উদ্রেক স্বাভাবিক। 'রূপ নেই রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো—লজ্জা করে না'! তাদের ধারণায় বিমলা যেন স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে আত্মসাৎ করছে। 'কেবল ছলনা, তার সমস্তটাই কৃত্রিম, এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা। জায়েদের এই কটুক্তিতে মনে পীড়িত হলেও স্বামীর নিভৃত সমর্থনের সবলতায়

এ সব কটুভাষণকে বিমলা শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতেই শিখেছে। মেয়েদের সব রকমের ক্ষুদ্রতাকেই উড়িয়ে দিতে নিখিলেশের মতো আর কে আছে!

স্বামীর ইচ্ছানুসারেই বিমলা ঘর থেকে বাইরে এসেছে। ঘরের অভ্যাস-গড়া ঘরকরনার মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে, অপূর্ণতা রয়েছে। তাই স্বামী তাকে জানিয়েছে: 'আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে'। আহ্বান জানিয়েছে বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত বুঝে নিতে। 'সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি প'কা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে'। এই উক্তি বিমলার শিক্ষিত উদারচিত্ত স্বামী নিখিলেশেরই। কিন্তু বিমলার স্বাভাবিক নারীসুলভ সংস্কার বৃহৎ পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই আত্মবিকাশ ও আত্মতৃপ্তির সমর্থন খুঁজে বেড়িয়েছে। বনেদী এই পরিবারের আরো অনেক মেয়ের মতোই ঘরকেই একসময় একমাত্র কর্মক্ষেত্ররূপে মেনে নিতে চেয়েছে। তাই দেখা গেল দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পরে কলকাতায় গিয়ে থাকবার প্রস্তাবে সে রাজী হতে পারেনি। (১) স্বামী অবশ্য তাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু না, ঐখানেই নিখিলেশের স্বাতন্ত্র্য। বিমলা জানে, স্বামীত্বের দাবি খাটিয়ে যারা স্ত্রীর ওপর ভোগদখলের দৌরাত্ম্য করে থাকে তার স্বামী সে রকম লোক নয়। নিখিলেশ যে আদর্শকে মনেপ্রাণে লালন করে এসেছে সে আর্দশই তাকে স্ত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেও সম্মান করতে শিখিয়েছে। (২) তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় পরবর্তী কালের অনেক আবর্তিত ঘটনার ফলে স্বামী-স্ত্রী এক এক সময় পরস্পরের নিকট থেকে অনেক দূরে সরে গেলেও স্বামীত্বের রুদ্রতেজের চোখরাঙানী বিমলাকে কখনো সহ্য করতে হয়নি। এমন কি পরপুরুষের প্রতি তার আসক্তি যখন স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে তখনও নিখিলেশ গোপন মানসযন্ত্রণাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে মাত্র। সে মনে

(১) এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে একে এতকাল আগলে এসেছেন। ভাগ্য তাঁর বুকে একটার পর একটা কত বাণই হেনেছে কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছলে উঠেছে। এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে কী করব? (বিমলার আত্মকথা)

(২) 'স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে, তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না'। (বিমলার আত্মকথা)

মনে ভেবেছে : 'একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ পর্যন্ত তার পরীক্ষা হয়নি। এবার বুঝি সময় এল'।

নিখিলেশের উৎসাহে বিমলা ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। সে সময়ে স্বদেশী ভাবনা ও চিন্তাধারা বাঙ্গালীর মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। বিদেশী বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলন সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। এই সময়টা এমন যে এক এক সময় উন্মাদনা ও উন্মত্ততায় পার্থক্য থাকেনি, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে যুক্তির খেই হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (৩) ফলে, বিমলার মনও একটা কিছু করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিমলা তার স্বামীর কাছেই পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। দেখেছে তার স্বামীর গঠনমূলক কাজের জন্যে স্বার্থত্যাগ। অনেক টাকা ক্ষয় হয়েছে নানা গঠনকর্মের পরীক্ষায়, সহযোগিতায়। স্বামীর কাছেই সে জেনেছে দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরও গুরুতর। অথচ বিলিতি বর্জন প্রসঙ্গে বিমলা দেখেছে তার স্বামীর বিচারের দৃষ্টিকোণ একেবারেই আলাদা। তাই যেদিন বিলিতি জিনিসে তৈরী তার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলবার প্রস্তাব সে স্বামীর কাছে পেশ করেছে সেদিনই নিখিলেশের কঠিন বিরোধিতায় সে অবাক হয়েছে। 'গড়ে তোলবার কাজে সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই'। মিস গিলবিকে ছাড়িয়ে দেবার প্রশ্নেও সেই একই ধরনের উত্তর বিমলা পেয়েছে স্বামীর কাছে থেকে। মিস গিলবি কেবলমাত্র ইংরেজ বলে তাকে ঝাপসা করে দেখতে নিখিলেশ রাজী নয়।

(৩) 'সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবীরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগেছিল, সেদিনও তার বেড়া ভাঙেনি বটে কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুমনা কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল'।

(বিমলার আত্মকথা)

এরকম যখন বিমলার মানসিক অবস্থা তখন সন্দীপ এলো তার দলবল নিয়ে স্বদেশী প্রচারের জন্যে। বিমলার সামনে সন্দীপের প্রথম আত্মপ্রকাশ অভিনবও বটে। 'বন্দেমাতরম্' অবিরাম ধ্বনির সিংহনাদের মধ্যে পাগড়ি বাঁধা গেরুয়াপরা যুবক ও বালকের দল খালি-পায়ে একটা বড়ো চৌকির ওপর বসিয়ে সন্দীপকে কাঁধে করে নিয়ে এসেছে। সেদিন সন্দীপের বক্তৃতা শুনে, তার মূর্তি, কাল-পুরুষের নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল দুই চোখ দেখে বিস্তৃত এক দিগন্ত সম্বন্ধে সচেতন হতে হলো বিমলাকে। (৪) বিমলা বাড়ি ফিরে এল অপূর্ব আনন্দ এবং অহঙ্কারের দীপ্তি নিয়ে। এতদিনে বিমলা বুঝি খুঁজে পেল তার অনেক কালের আকাঙ্ক্ষিত বীরকে। বীরমহিমায় অভিভূত হয়ে বিমলার ইচ্ছা হয়েছিল তার আজানুলম্বিতচুল কেটে দেয় এই বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্যে।

সন্দীপকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবার প্রথম দিন বিমলার মনে হয়েছিল ঈশ্বর কেন তাকে আশ্চর্য সুন্দর ক'রে গড়লেন না। বিমলা চেয়েছিল সন্দীপ যেন তার মতো নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে দেশের জাগ্রত শক্তিকে, শক্তি-রূপিনী জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ বোধহয় সেইদিক দিয়ে গেল না। বিমলা শুধু অনুভব করতে লাগলো সন্দীপের বক্তৃতার আশ্চর্য বিন্যাস এবং বিমলাকে খুসী করার জন্যে তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অনেক সুনির্বাচিত মধুর কথার মাল্যরচনার দুর্মর প্রয়াস।

নিখিলেশের সঙ্গে সন্দীপের বিতর্ক চলতে থাকার সময় বিমলা অনুভব করেছে সন্দীপের সঙ্গেই যেন তার মতের মিল বেশী। সে আরো লক্ষ্য করেছে সে উপস্থিত থাকলেই সন্দীপ নিখিলেশের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দেবার সামান্য উপলক্ষটুকু ছাড়তে চায় না। বিমলা দেখেছে তর্কে সন্দীপের তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক ঝক করে উঠতে থাকে। বিমলা কখনো স্বামীকে বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শোনেনি। বিমলার সঙ্গে যখন তর্ক হয়েছে তখন স্ত্রীর প্রতি অসীম করুণায় স্ত্রীকে হার মানাতে নিখিলেশের কষ্ট হয়েছে। কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে বিতর্ককালে নিখিলেশও নির্মম, যুক্তির অস্ত্রচালনায় তার ক্লান্তি দেখা যায়নি। কিন্তু যুক্তি থাকলেও

(৪) 'আমার হুঁশ ছিল না।. আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ওই ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কী করে'? (বিমলার আত্মকথা)

নিখিলেশের কথাবার্তার সময়োচিত উত্তেজনা কোথায়। পক্ষান্তরে সন্দীপের কথায় ও যুক্তিতে রয়েছে উত্তেজনার কড়া মদ। এই কড়া মদের আকর্ষণেই বিমলা যেন সন্দীপের সম্মোহনশক্তির আওতায় গিয়ে পড়ছে।

নিখিলেশের জবানীতেই জানা যায় যে তারা স্বামী ও স্ত্রী আলাদা ধাতুতে গড়া। নিখিলেশ উত্তেজনা অপছন্দ করে; উন্মত্ততা তার কাছে পায় তীব্র তিরস্কার। কিন্তু বিমলার পক্ষপাত এই উত্তেজনার প্রতি, উন্মত্ততার প্রতি। অন্যান্য মেয়েদের মতো বিমলার ধারণা, পুরুষমাত্রেই মেয়েদের ওপর তাদের অধিকার জোর করে খাটাবে। স্বামীর স্বভাবে সেই জোরের অভাব দেখে শেষ পর্যন্ত তাকে নিষ্প্রভ নির্জীব মনে হয়েছে বিমলার কাছে। ফলে, সন্দীপের মায়াজালে সে আস্তে-আস্তে ধরা দিতে থাকে। সন্দীপের মধ্যে যে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি, অন্যায়কারী ব্যক্তিটি রয়েছে তাকেই যেন বিমলা ফুলের মালা গলায় দিয়ে বরণ করতে চায়। নিখিলেশ তার স্ত্রী:কে যতোটা জানে ততোটা আর কে-ই বা জানবে। 'ভেবেছিলুম, বড়ো জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড়ো করে দেখবে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন করে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়। অন্য সমস্ত স্বাদকে সে এক রকম অবজ্ঞা করে'।

সন্দীপের দেশমাতৃকাবন্দনা যখন ক্রমে-ক্রমে বিমলাবন্দনায় পরিণত হতে থাকে তখন লজ্জায় ও গৌরবে বিমলার মুখ লাল হয়ে ওঠে বটে কিন্তু এ ব্যাপারটাকে সে তার প্রাপ্যের অধিক বলে মনে করে কিনা সন্দেহ। সন্দীপের বিমলাবন্দনা ক্রমে লজ্জাহীন স্তাবকতায় পরিণত হয়। (৫)

(৫) 'আমার অন্তরকে সব সময় পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো একজায়গায় পাইনি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী।...দেশের নায়ক হবার গর্ব আর রাখিনে। আমি উপলক্ষ্যমাত্র হয়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব। আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরানী—আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ করব—কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার থেকে দূরে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট, আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।' (সন্দীপের উক্তি)

ব্যাপারটা স্বামীর সম্পূর্ণ গোচর হলেও বিমলার স্বামী তো তেমন ব্যক্তি নন যে অধৈর্যের প্ররোচনায় প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠবে। একমাত্র বিমলার অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা মেজ বৌ হাসতে-হাসতে কথাবার্তার ফাঁকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে বিমলাকে সচকিত ক'রে তোলে কখনো-কখনো। কিন্তু বিমলার সমস্ত প্রকৃতি তখন আপনার ভিতর থেকে কাজ করছিল বলেই বাইরের বিদ্রূপের দিকে তার খেয়াল ছিল কিনা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সন্দীপের মনের মতো ক'রে বিমলা সাজগোজ করবার চেষ্টা করছে। বিনিময়ে পেয়েছে সন্দীপের স্তুতি ও কামনার রসসিক্ত চাটুবাক্য। বিমলার তখনকার অনুভূতি এই : 'এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোটো নদী—তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা—কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়েই সমুদ্রের বান ডেকে এল—আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল ; আমি আপনার রক্তের ভিতরকার ঠিক অর্থ টাতো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল ? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল' ? বিমলা সুস্পষ্ট অনুভব করতে লাগলো, সন্দীপের দুই অতৃপ্ত চোখ তার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠলো। রূপের শক্তিতে বিমলা যে আশ্চর্য সে-কথা সন্দীপের 'সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাসরঘন্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিল'।

বলা বাহুল্য, দেশের কাজে সন্দীপ আত্মসমর্পন করেছে, বিমলার এই গোড়াকার ধারণার ভিত্তিমূল নড়ে উঠতে বিলম্ব হয়নি। বিমলা বুঝতে পেরেছে যে সন্দীপ ক্রমশই যে-ভাবে নিজেকে স্পষ্ট করে তুলছে তাতে তাদের মধ্যকার সম্বন্ধটা অস্থির হয়ে সর্বনাশের পথ ধরেছে। সন্দীপের কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে বিমলাকে অনুভব করতে চায়, তার তৃষিত চোখের দৃষ্টি যেন ভিক্ষুকের মতোই বিমলাকে পায়ে ধরে সাধে। সন্দীপের মধ্যে বিমলা দেখেছে দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয় মূর্তি। সে ইচ্ছা যেন নিষ্ঠুর ডাকাতের মতো বিমলার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে বিমলার এ কথাও মনে হয় : 'বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে'। বিমলা ক্রমশঃ

বুঝতে পারে তার স্বামী নিখিলেশের সঙ্গে সন্দীপের তুলনাই হয় না। তাই গোড়ার দিকে সন্দীপকে ভক্তি করতে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত জমে উঠলো অশ্রদ্ধা। অতএব সন্দীপের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটাকে আড়াল দিয়ে যে-কোনো অন্য কাজ করতে পারলে সে যেন বাঁচে। মাষ্টার-মশাই চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করবার সময় জীবনের পরিধিটাকে বিমলা বড়ো ক'রে দেখবার অবকাশ পায়, উপলব্ধি করে, বরাবর যেটাকে সে সীমা বলে মেনে এসেছে সেটাই সীমা নয়, সেখানেই জীবনের সব কিছুর পরিসমাপ্তি নয়। কিন্তু, সন্দীপের কথা মনে হলেই বিমলাকে যেন নেশায় ধরে 'সংসারের দুঃখ ঘটুক, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে-পলে কালো হয়ে মরুক, কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিঁকে থাক, এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়তে পারছিনে' বিমলার এই স্বীকৃতিতে শোকান্তিকার সূচনা রয়েছে। 'কেন যে সন্দীপবাবু দিনের পর দিন বিনা কারণে এমন করে কাটাচ্ছেন, কেনই যে আমি যখন-তখন তার সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের আলাপ-আলোচনা করছি, আজ তার কিছুই জবাব দেবার নেই।' বিমলা যে এক-এক সময় এই আত্মক্ষয়কারী প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা না করেছে এমন নয়। দু'দিন সে বাইরের ঘরে যায়নি পাছে সন্দীপের সঙ্গে দেখা হয়। বিনা প্রয়োজনে নিজের শোবার ঘরের জিনিষ পত্র বিছানা বালিশ ঝেড়ে ঝুড়ে অন্যরকম করে সাজিয়েছে। কিন্তু তৃতীয় দিনে আর মনকে বশ মানানো সম্ভব হয় না, বিমলা বাইরের ঘরে সন্দীপকে একবার দেখবার জন্যে ছুটে যায়।

বিমলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধ নিখিলেশ বরাবর এড়িয়ে এসেছে। নিখিলেশ আর সন্দীপের মধ্যে বিতর্ক কালে বিমলা এক-এক সময় লক্ষ্য করেছে সন্দীপ যেন বাড়াবাড়ি করছে কোনো-কোনো প্রসঙ্গে। অথচ তবু উপায় নেই। সন্দীপের মুখোশ ক্রমে-ক্রমে উন্মোচিত হচ্ছিল বিমলার কাছে তবু ভেতর থেকে বাধাদানের শক্তি তার কোথায়। (৬) এদিকে

(৬) 'সন্দীপের মধ্যে যে-জিনিষটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য-মাত্র। তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওরই হাতে বাজতে লাগল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে—কিন্তু বীণা তো বাজল। আর, সেই সুরে যখন আমার দিন রাত্রি ভরে উঠল তখন আমার আর দয়া মায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা কিছু আছে সব মজিয়ে দাও, এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন, আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বলতে লাগল।' (বিমলার আত্মকথা)

সন্দীপ বুঝেছে যে বিমলা তার এতো কাছে এসে পড়েছে যে ফিরে যাওয়া শক্ত। 'বিমলা যে আমার কামনার বিষয় হয়ে উঠছে সে জন্যে আমার কোনো মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখেছি ও আমাকে চায়—ওই তো আমার স্বকীয়া।' (৭) নিখিলেশও ভাবে: সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ, কিন্তু, বিমলা দেশের নাম করে যে-কথাগুলো বলছে সে কেবল মাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়—এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে।'

সন্দীপ বিমলাকে অভিভূত করেছে বারংবার দেশের কথা বলেই। দেশের জন্যে যে-কোনো এক ধরণের আত্মত্যাগ করার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিমলার মধ্যে ছিল তাকে উদ্দীপ্ত করেই সন্দীপ নিজ কার্যসিদ্ধির আয়োজনে অগ্রসর হয়েছে। 'আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনরী হার।' এরূপ এবং আরও অনেক আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় কথার স্তবে বিমলার চোখ যদি বুজে আসে তাহলে বিস্মিত হবার কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে সন্দীপের দুই পা জড়িয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে হয়েছে তাকে।

মানুষ যখন সর্বনাশের স্রোতে পা বাড়ায় তখন ফিরে আসতে পারবে কিনা এ চিন্তা মনে থাকে না। কিন্তু হঠাৎ এক-একটি ঘটনা অদ্ভুত ভঙ্গিতে মানুষের জীবনের মোড় ফেরায়, যে-মানুষ প্রায় ধ্বংস হতে চেয়েছিল দেখা যায় সর্বনাশা অকল্যাণের পথ থেকে সে ফিরে এসেছে। অমূল্যর সঙ্গে বিমলার পরিচয়ের ঘটনাকেও এই দিক থেকে বিচার করে দেখা যেতে পারে। সন্দীপের বাধা বুলি অমূল্যর মতো কচি বালকও যখন বলেছে তখনই বিমলা তার নিজের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে সচেতন হয়েছে। সন্দীপের প্ররোচনায় যে-বিমলার স্বামীর শোবার ঘরের আলমারী থেকে মোহর চুরি করতে বাধেনি সেই বিমলাই সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে কেঁপে উঠলো। সন্দীপের কার্যকলাপের নৃশংসতা প্রকট হলো তার কাছে। স্বামীর লোহার সিন্দুকের ভাগ-করা গিনিগুলো সরাবার সময়ও আত্মপ্রবঞ্চনার চেহারা স্পষ্ট হয়েছে বিমলার কাছে: 'নিস্তব্ধ রাত্রি আমার

(৭) সন্দীপের আত্মকথা।

শিয়রের কাছে তর্জনী তুলে রইল। ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি—এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর'। এই অনুভবের মধ্যেই বিমলার আত্মজাগরণের আভাস, তার প্রায়-অবলুপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নবঅরুণোদয়ের ইঙ্গিত। (৮) তারপরেই কিশোর অমূল্যকে দেখে, তার নিঃস্বার্থ আচরণ ও প্রীতির পরিচয় পেয়ে বিমলা আরোও সচেতন হলো। তার মধ্যে এলো মাতৃত্বের স্নেহ রসের ধারা ; স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠলো মঙ্গলময়ী শুভেচ্ছা। (৯) এই ছেলেটিকে সন্দীপের হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে বাঁচাবার জন্যে সে অতঃপর ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এদিকে সন্দীপ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জ্বলে ওঠে। বিমলা অমূল্যকে তার প্রভাবের বাইরের জগতে নিয়ে যাবে এরূপ চিন্তাও তার কাছে দুর্বিসহ। বিমলার বুঝতে বাকী থাকে না যে সন্দীপ দুর্বল ; দুর্বল বলেই তার এই অসংযত রাগ। সন্দীপের কথাবার্তায় কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ শুনতে পায় বিমলা।

বিমলা ও সন্দীপের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তি সন্দীপের অর্থলিপ্সা ও সুবিধাবাদের জন্যেই দৃঢ় হতে পারেনি। শেষ অধ্যায়ে অতএব সন্দীপকে বিদায় নিতে হয়েছে হৃতশক্তি ব্যর্থকাম নায়কের মতোই। বিমলা ফিরে এসেছে আবার তার স্বাভাবিকতায়, দীর্ঘকাল পরে ফের স্বামীর কাছে, নিখিলেশের উদার সান্নিধ্যে। একজন সমালোচক ঠিকই বলেছেন, নিখিলেশের প্রেমের আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করেই যে বিমলা শেষ পর্যন্ত তার কেন্দ্রে ফিরে আসতে পেরেছে তা হয়তো নয়। পক্ষান্তরে সন্দীপের নগ্ন নির্লজ্জতা এবং স্থূল ভোগলিপ্সা প্রকট হওয়ায় এবং অমূল্যকে আশ্রয় করে তার হৃদয়ের যে কল্যাণ স্নেহ উৎসারিত হলো তার জন্যেই বিমলার পক্ষে মোহগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, বিমলা সুবৃহৎ বনেদী পরিবারের মেজরানী, মেজো জায়ের কটাক্ষ ও স্থূল ইঙ্গিতময় উক্তির হাত

(৮) 'আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম, এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হতো পুজো, দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরি তো পুজা নয়—এ জিনিস কেমন করে দেশের হাতে তুলে দেব। চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে বসলুম গো। নিজে মরতে বসেছি কিন্তু দেশকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি'।

(৯) 'আহা, ওই কচি মুখ, ওই স্নিগ্ধ চোখ, ওই তরুণ বয়স! আমি মেয়েমানুষ, আমি ওর মায়ের জাত'। (বিমলার আত্মকথা)

থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টাও তার কেন্দ্রানুগ হওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। বিমলা যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখোমুখী হোক না কেন, তাকে সন্দীপ যেভাবেই আকর্ষণ করুক না কেন, পরিবারের সুদীর্ঘ কালের বংশগৌরব, আত্মসম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধও তাকে সন্দীপের সম্মোহন থেকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে।

বিমলার চরিত্রচিত্রণ রবীন্দ্র-উপন্যাসের সার্থক স্ত্রীচরিত্রচিত্রণের অন্যতম। বিমলা নিজেই নিজের আত্মকথার লিপিকার। সুতরাং তার মনের আলোড়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের খুঁটিনাটি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পেতে অসুবিধে হয় না। বিমলা নিজেই নিপুণ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে নিজের হৃদয়ের নিভৃত ভাবনা ও ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন বিমলা সারা উপন্যাসের মধ্যেই অতিমাত্রায় সচেতন। অধিক মাত্রায় সচেতন হয়েও নিষ্ঠুর নিয়তির হাতের অন্ধ ক্রীড়নকের মতোই সে অপ্রত্যাশিত কল্যাণকর ঘটনাস্রোতের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই দিক থেকে বিমলা চরিত্রচিত্রণে খুঁত রয়েছে হয়তো। কোনো-কোনো সমালোচক মনে করেন বিমলাকে আরো একটু কম সচেতন করলে আর্টের দিক থেকে সে হয়তো অধিকতর পরিণতিলাভ করার সুযোগ পেতো। কিন্তু যদি মনে রাখা যায় যে বিমলা ঘরবদলের পালা শুরু হবার যুগের চরিত্র এবং বাইরের ঘটনাতরঙ্গে আবর্তিত হলেও আত্মবিশ্লেষণের পক্ষপাতী তাহলে এই চরিত্রের অতি-সচেতনতা সম্পর্কে হয়তো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয় না। বিমলার আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারা-বিবরণীর বিস্তারের জন্যেই শুধু তার নিজের চরিত্র সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য সমস্ত উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো সম্বন্ধেও পাঠকসমাজের সচেতনতা অব্যাহত থাকে, উপন্যাসের সমগ্র স্বরূপ উপলব্ধির পথে আর বাধা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাব্য-আন্দোলন

বাংলা কবিতার সুবিস্তীর্ণ কাব্য-অবয়বে একালে যে অংশটি আধুনিকতার স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত তার উৎস রবীন্দ্রনাথ নন এরূপ হঠোক্তির বিপদ একাধিক। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ষাট বছরের অধিককালের নব নব বিস্ময়-প্রসূত কাব্য-সাধনার আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত গঙ্গোত্রী স্রোতে এমন কোনো ক্ষুদ্রতম উপনদীরও প্রবাহ মিলিত হয়নি যার স্বাতন্ত্র্যবন্দনায় উচ্ছ্বসিত হওয়া আধুনিক কাব্যপাঠকের পক্ষে সম্ভব! প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় চল্লিশ বছর আগে যে অতি-তরুণ কবিগোষ্ঠী প্রধানতঃ ইংরেজী ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা কবিতার প্রসঙ্গে ও উপকরণে নতুন উপাদান সংগ্রহের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের পক্ষেও রবীন্দ্র-কাব্য ধারার আস্বাদন ব্যতীত কাব্য-জীবনের লালন ও পরিবর্ধন সম্ভব ছিল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রভাবে যে-সব লেখক নতুনতর রসাস্বাদনের সন্ধানী তাঁরা যেমন সমৃদ্ধ হয়েছিলেন অন্যদিকে প্রচলিত কাব্যরীতি ও সাহিত্যাদর্শের মুখাপেক্ষী জড়ত্ব-গ্রস্ত বহু সাহিত্যকীর্তিও তেমনি সমৃদ্ধতর অমৃতময় রসধারায় পুনরুজ্জীবনের সুযোগ পেয়েছিলেন। মূককে বাচাল হবার এবং পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনের এমন সুযোগ আর কোনো প্রতিভা দিয়েছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্তরসূরীর ঋণ অপরিসীম তো বটেই, সে-দেনা শুধবার চেষ্টাই বিড়ম্বনা। রবীন্দ্রনাথ যে-কালে তাঁর মহিমার মধ্যগগনে প্রতিভাসূর্যরূপে অধিষ্ঠিত সে-সময়ে সমসাময়িক ও অনুগামী কবিসম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই তাঁর অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে অভিভূত হয়ে থাকলে অবাক হবার কিছুই নেই। সে সময়ে মূল্য-বিচারের বদলে বন্দনা গানের আতিশয্যই স্বাভাবিক, মূল্যায়নের স্থলে মুগ্ধতা, এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পরিবর্তে অনন্য প্রতিভার বিরল জোয়ারস্রোতে আত্মনিমজ্জন। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের এই অমোঘ ও অনিবার্য পরিণাম প্রত্যক্ষ করেই কল্লোল যুগের তরুণ কবিগোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্বগ্রাসী প্রভাবের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে আধুনিক বাংলা কবিতাও শুধু রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতিধ্বনি

হয়ে দাঁড়াবে, স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার জগৎ সৃষ্টি করতে পারবে না। অথচ রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তি যে সহজ ব্যাপার নয় এ সত্যও এই তরুণ কবিগোষ্ঠি শুরুতেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এক দিকে রবীন্দ্র-প্রতিভার দুর্নিবার আকর্ষণ, অন্যদিকে নতুন বিষয়-বস্তু ও আঙ্গিকের সাহায্যে সমসাময়িক কালের উপযোগী কাব্য-রচনার আকাঙ্ক্ষা, এই ভিন্নমুখী সংঘাতে সেদিনের নবীন কবি মাত্রেই পীড়িত হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। এই পটভূমিকায় নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদারের আবির্ভাব। এঁদের কবিতা যে তখনকার মতো পাঠক-সমাজকে সচকিত করেছিল তার কারণ, নজরুলের বিদ্রোহ, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এবং মোহিতলালের দেহবাদী প্রাণময়তা তৎকালীন প্রবহমান পদ্মলালিত্যে তীব্র, বেদনা-কঠিন প্রশ্নজর্জর সুরের আবেগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বি-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম,
আমি ধন্যি।

(নজরুল ইসলাম)

দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান!
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা।
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি?

(যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

জীবনের দুঃখ-সুখ বার বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!

(মোহিতলাল মজুমদার)

গভীরতর, পরিব্যাপ্ত রবীন্দ্রমুখিতার মধ্যেও কোথায় যেন ভিন্নতর জীবনজিজ্ঞাসার সুর, ভিন্নতর ব্যঞ্জনার অনুরনন। উৎকর্ষের দিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও ক্ষতি নেই, এই কবিতাগুলো যে উপকরণ ও প্রসঙ্গের দিক থেকে পাঠক সমাজকে ভাবিয়ে তুলতে পেরেছিল সেইটেই উল্লেখ্য। রবীন্দ্রকাব্যপাঠে সদাতৃপ্ত পাঠক চমকে উঠেছিল এই প্রথম। যে তরুণ কবি-সম্প্রদায় রবিপ্রতিভার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজেছিলেন তাঁরাও এইবার যেন নতুন কোনো আত্মপ্রকাশের সংকেত খুঁজে পেলেন। কল্লোল যুগে (১৩৩০-৩৫) এই আত্মপ্রকাশের তাগিদ প্রায় আন্দোলনের আকার গ্রহণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পথ ভিন্নও অন্য পথ বাংলা কবিতায় আছে এবং নিজের কথা নিজের মতো করেই বলতে হবে—এই সচেতন ঘোষণা তখনকার দিনে রবিপ্রতিভার পূর্ণ দীপ্তির মধ্যে, স্পর্দ্ধার মতো শোনালেও একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রায় শুরু থেকেই এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যণীয়।

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই !
মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু,
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারী আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাই যে হায় !

(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরী নাই—রূপ ঝ'রে পরে তার—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে।
আজো তবু ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,

মাঠে-মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ—ভাঁড়ারের রস।
মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকালবেলার রৌদ্রে; কুঁড়েমির আজিকে সময়।

(জীবনানন্দ দাশ)

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমি-ঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু।
না-হয় রেখেছো বেঁধে; তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহ-ভরে ঊর্ধ্ব নভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।

(বুদ্ধদেব বসু)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথও থেমে নেই। প্রতি কয়েক বছর অন্তর তাঁর কাব্য-জগতে ঋতু পরিবর্তনের স্বাক্ষর। প্রতিটি উন্মেষ বিস্ময়কর, প্রতিটি প্রকাশে মুগ্ধতা। নব্যপন্থীদের দলে ভাঙন ধরাবার পক্ষে তাঁর এইসব নতুন কবিতাই যথেষ্ট। 'মানসী' থেকে 'বলাকা' এবং 'বলাকা' থেকে 'লিপিকা'—এই সুবিস্তৃত বর্ষব্যাপী কালের মধ্যে নানা বিচিত্রভাবে সংশয়াতীত ভাবেই রবীন্দ্রনাথ বাস্তব অর্থে নতুন, ভাবগত অর্থে নতুন। কোথাও এসে কোনো বিশেষ স্তরে পৌঁছে থেমে থাকবার মতো, পুনরাবৃত্তি করবার মতো তাঁর প্রতিভা নয় বলেই, কল্লোলযুগের এবং তৎপরবর্তী তিরিশের যুগের কবিদের উত্তরণপর্ব এতো সুকঠিন ও প্রায় অসম্ভব বিবেচিত হয়েছিল। বিষয়ের ব্যাপকতায়, অনুভব ক্ষমতার গভীরতায়, ছন্দের স্পন্দনে, নব-নব পর্যায়ে, নব-নব প্রস্তুতিতে রবীন্দ্রকাব্য এমন ক্রিয়াশীল যে সে-প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করাতেও যেন তৃপ্তি। এই আকর্ষণের বিরুদ্ধে, এই পরিতৃপ্তির বিরুদ্ধে সুকঠিন আত্মপ্রত্যয়ের সংগ্রামে জয়ী হওয়া তরুণতর কবিদের পক্ষে প্রায় সুদূরপরাহত বলে বিবেচিত হয়ে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। বস্তুত

রবিপ্রতিভার কবলিত হওয়ার আশঙ্কা সে-সময়ে বাস্তব হওয়ায় তরুণতর কবি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কতকটা দম্ভযুক্ত ঘোষণারও দরকার ছিল হয়তো।

তরুণতর কবি গোষ্ঠীর নতুন কাব্য-আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন এরূপ বলা যায় না। 'শেষের কবিতা'য় উল্লিখিত বালিগঞ্জের এক সাহিত্য সভায় রবিঠাকুরের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতির মন্তব্য স্মরণীয়। কথাটা অমিত রায়ের মুখ থেকে নির্গত হলেও বিদ্রোহী তরুণ সমাজের তখনকার আচরণে হয়তো এরূপ উক্তির সমর্থন ছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, অনুরূপ মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। দেখা গেল, আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের মধ্য থেকে আধুনিক কবিতা ক্রমশ স্পষ্টতর আকার লাভ করছে, ভিন্নতর স্বাদ ও সঙ্কেত আধুনিক বাংলা কবিতায় স্ফুটতর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই উদ্যোগী হয়ে এক সময়ে অভিনন্দন জানালেন এই স্বতন্ত্র প্রকাশকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের নবতর পর্যায়ের কবিতার মাধ্যমেই উন্মোচিত করলেন প্রকৃত আধুনিকতার স্বরূপকে। 'মানসী'র যুগের অলঙ্কার-বাহুল্য আগেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। ছন্দমিলনান্ত কবিতায় রসহানি না ঘটিয়েও মুখের ভাষার কাছাকাছি কবিতার ভাষাকে নিয়ে আসবার যে স্বপ্ন তৎকালীন কবিরা দেখেছিলেন তাকে বাস্তবে রূপায়িত করলেন রবীন্দ্রনাথই। 'বলাকা'য় ছন্দের নিগড় ভাঙার আভাস থাকলেও ছন্দের বাঁধন একেবারে ছিন্ন হয়নি। মিলের টান এবং পদক্ষেপের সমতা মেনে, সৃষ্টি শুধুই যে জাতি-সর্বস্ব এরূপ স্বীকৃতিতে নয়—জাতি থেকে মুক্তির উপলব্ধিতে 'বলাকা'র কবিতা-গুলোর সার্থকতা :

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

'পূরবী'তে পৌঁছে রবীন্দ্র-কাব্যের আভরণ-বাহুল্য কমলো। মিল তখনো রইলো কিন্তু 'বলাকা'র যুগের শব্দ-বিন্যাসে ও ধ্বনি র বিনিময়ে সরল, অলঙ্কার বর্জিত শব্দ ও বাক্য-ভঙ্গির সূচনা দেখা দিল :

এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি নিয়েছি বিদায়।

এই তো ভালো ফুলের সঙ্গে আলোর জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাণের আশায়।

এবং উপরিউদ্ধৃত দু'টি স্তবকের তুলনা করলেই ধরা পড়ে যে 'পূরবী'তে গদ্য ও পদ্যের সীমারেখা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তারপরেই 'লিপিকা'র গদ্য কবিতার নির্ভীক পরীক্ষা। দীর্ঘকালের নানা ধরণের পরীক্ষার পর 'লিপিকা'য় এসে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে আবার জন্মেছিলেন বলা যেতে পারে। বস্তুত 'লিপিকা' থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত এই সময়ের কবিতার প্রভাব নানাদিক থেকে আধুনিক বাংলা কবিতায় ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রত্যক্ষ ভাবে নয় কিন্তু ব্যাপকতর অপ্রত্যক্ষভাবে আধুনিক কালের কাব্য-আন্দোলন রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়ের কবিতাবলীর কাছে বিশেষভাবেই ঋণী।

পক্ষান্তরে আধুনিক বাংলা কবিতার বিস্তার, লালন ও পরিবর্দ্ধন গত তিরিশ বছরের মধ্যে, রবি-প্রতিভার শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর কাছে ঋণী হয়েও, ক্রমশঃ একটা স্বতন্ত্র সত্তা, ভিন্নতর অবয়ব গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় এই স্বাতন্ত্র্যের প্রতিশ্রুতি তিরিশ বছর আগেই লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' 'প্রথমা' এবং 'বন্দীর বন্দনা'র অধিকাংশ কবিতাগুলো সে-সময়ে সতর্ক ও সজাগ কাব্যপাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিরিশের যুগের শেষাশেষি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, বাংলা কাব্য-আন্দোলন কোনো সময়েই একটি বিশেষ ছকে-আঁকা ব্যাপারে পরিগণিত হয় নি, একই সামাজিক

পটভূমিকায় বিচরণশীল হয়েও এই কবিগোষ্ঠী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবে ক্রিয়াশীল। নীচের উদ্ধৃতিগুলো থেকে আশা করি এরূপ উক্তির সমর্থন মিলবে :

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙ্গে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মেলেনা পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে॥

(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

মেলাবেন তিনি ঝড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।

*　　　*　　　*

তোমার আমার নানা সংগ্রাম
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

(অমিয় চক্রবর্তী)

পাহাড় এখানে হাল্কা হাওয়ায় বোনে
হিম শিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।

আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে।
কাঁপে তনুবায় কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত প্রেসিয়ার।
হাল্কা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড় সওয়ার!

(বিষ্ণু দে)

যে-সব কবিতা থেকে স্তবকগুলো উদ্ধৃত হলো সে-সব কবিতা তিরিশের যুগেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় একদিকে যেমন নাস্তিকতার সুর অন্যদিকে তেমনি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় আস্থা ও আশ্বাসের অনুরণন। পক্ষান্তরে বিষ্ণু দে-র কাব্যকৌশলে শব্দের সহজ সংহত ব্যবহার এবং সার্থক পদবিন্যাস লক্ষণীয়। অথচ এসব কবিতায় এমন বৈচিত্র্য রবীন্দ্রকাব্যের আশ্রয়েই সম্ভব হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগতে নিশ্বাস টেনেই তিরিশের কবি গোষ্ঠীর মানস-জগৎ পূর্ণতা ও পরিপক্কতা লাভ করেছিল বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ-দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র কবিতায় এই পূর্ণতা ও পরিপক্কতার পরিচয় এখনকার পাঠক সমাজের অজ্ঞাত নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি দীর্ঘকালের সাধনায়, বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষের দিককার বছরগুলোতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা কবিতায় নব-নব দিগন্তের রশ্মিরেখা না উন্মোচিত করতেন তা হলে আধুনিক বাংলা কবিতার এই দ্রুত, সার্থক রূপান্তর সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। খুব সুখের বিষয়, এই রূপান্তর বিংশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। এখনকার দিনে বাংলা কবিতা একদিকে যেমন গদ্য-পদ্যের সীমারেখাকে হ্রস্বতর করে এনেছে অন্যদিকে তেমনি সতর্ক পদান্বয়ে, ভাবের সংহতিতে, চিত্রকল্প ও রূপকের বাস্তবনিষ্ঠ বিস্তারে এবং প্রকরণগত বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র এক অবয়ব ধারণ করেছে। জীবনানন্দের মানসলোক রবীন্দ্রকাব্যের বর্ণধারায় অনুরঞ্জিত হলেও তিনি গোড়া থেকেই রবীন্দ্রপ্রভাব পরিহার করার কাজে সাফল্যলাভ করেছিলেন। অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে-র কবিতায় বিন্যাস এবং সচেতন কারিগরি উল্লেখ্য।

সুধীন্দ্রনাথ নিঃশঙ্ক চিত্তেই রবীন্দ্রনাথ থেকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁর কবিতার প্রকাশভঙ্গি ও পটভূমি বিচিত্র। বিষ্ণু দে উপকরণগত বৈশিষ্ট্যে অনন্য; দেশী-বিদেশী প্রতীক ও চিত্রকল্পের সাহায্যে, ছন্দের নতুনতর প্রয়োগে, রবীন্দ্রনাথ থেকে স্মরণযোগ্য পঙক্তির সংযোজনায় অনেক সময়েই তাঁর কবিতা কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, কখনো সমাজচিন্তার অনন্যতায়, বিশ্বাস ও নির্ভয় স্বীকৃতিতে বহুল পরিমাণে সার্থক। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা আবার মেজাজের দিক থেকে রবীন্দ্র-কবি-মানসের অধিকতর নিকটবর্তী। তাঁর সব কবিতায় গদ্য ও পদ্যের, আবেগ ও মননের, বিস্ময় ও সমবেদনার, দূর ও নিকটের নানা দৃশ্যপটের সঙ্গতি। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অনুগামী। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'দ্রৌপদীর শাড়ী' পর্যন্ত সার্থক কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর থাকলেও বোধহয় এমন কোনো ভাবগত কি উপকরণ-গত কিংবা আঙ্গিক সম্পর্কিত বিদ্রোহী ব্যতিক্রম নেই যাতে বলা যায় তাঁর কবিতা ভিন্নতর গন্তব্যের সন্ধানী। যদিও বাংলা লিরিক কবিতায়, বুদ্ধদেব বসুর অবদান অসামান্য এবং প্রেমের কবিতায় আকাঙ্ক্ষা ও সংরাগের কবিতায় তাঁর একান্ত নিজস্ব সুর রবীন্দ্রোত্তর যুগে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তিতে অনুরণিত। পরিণত বয়সে লিখিত তাঁর নীচের কবিতাটি এদিক থেকে অনুধাবনযোগ্য :

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান অমায়,
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সংগম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।

(রূপান্তর : বুদ্ধদেব বসু)

প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত গীতিকাব্যের নির্ঝরে পরিপুষ্টি লাভ করেই আধুনিক কালেও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বিচিত্রগামী হয়েছে। এমন কি যে-সব কবির মূল অবলম্বন সমাজচিন্তা ও বাস্তবচেতনা তাঁরাও গীতি-কাব্যের ঐতিহ্যময় পরিবেশকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

তিরিশের যুগের শেষাশেষি আবির্ভূত হলেন সমর সেন। ধূসর নাগরিক জীবনের এই সচেতন কবির কবিতায় রয়েছে লুপ্ত রোমান্টিক সৌন্দর্যের জন্যে হাহাকার। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গদ্যছন্দের সঙ্গে তাঁর গদ্যছন্দের প্রভেদ সুস্পষ্ট। নগরজীবনের ক্লান্তি, হতাশা, বিক্ষোভ ও সামাজিক বিরোধ তাঁর কবিতার পটভূমি। নগরজীবনের সমগ্র সুরটি ইতিপূর্বে আর কোনো কবির কবিতায় বোধহয় এরূপ নির্মমভাবে ধরা পড়েনি। বিষ্ণু দে-র অনেক কবিতায় যেমন, তেমনি সমর সেনের কবিতায়ও রোমান্টিকতা-বিরোধী আবহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য পঙক্তির চটুল ব্যবহার লক্ষণীয়।

নামলো সন্ধ্যা,
সূর্যদেব এখানে নামলো সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা,
পিলু বারোয়াঁর সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা।
একাকার এই ম্লান মায়ায়
জাগর হৃদয়ের গোধূলীলগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এলো
তোমার পোষ্ট কার্ড,
আর এলো তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।

(বিষ্ণু দে : টপ্পা-ঠুংরি)

পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এলো ব'লে হাওড়ায়। (ঐ)

ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—
হে শহর হে ধূসর শহর !
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর হে ধূসর শহর !

(সমর সেন : স্বর্গ হতে বিদায়)

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়
হে মহানগরী !

(সমর সেন)

আজ বহুদিন তুষার স্তব্ধতার পর
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

(সমর সেন)

এরূপ আরো দৃষ্টান্ত এই উভয় কবির রচনা থেকে দেওয়া যেতে পারে। ইংরেজি কবিতার, বিশেষ করে এলিয়ট কাব্য থেকে নানা উদ্ধৃতিও এই দুই কবির কবিতায় দৃষ্টিগোচর হবে। বিষ্ণু দে-র 'জনমে মরণে প্রণয়ে জীবন শেষ' এই বাক্যটি এলিয়টের 'Birth and Copulation and Death' এই পঙক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সমর সেনের 'উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন এপ্রিলের বসন্ত আজ' এলিয়টের পঙক্তিরই রকমফের এবং 'ক্ষুধিত স্বেদাক্ত মুখের উপরে লাল আলোর পর' এলিয়টের 'After the torchlight red on sweaty faces-এর অনুকরণ। তৎসত্ত্বেও বিষ্ণু দে ও সমর সেন শক্তিমান এবং স্বকীয়তা সম্পন্ন কবি এবং সমর সেন বর্তমানে স্তব্ধ হলেও বিষ্ণু দে-র কাব্য-জীবনের পরবর্তীকালের অধ্যায় নব-নব অভিজ্ঞতার ও উৎকর্ষতার আলোকে উদ্ভাসিত।

সমর সেন যে-কালে কবিতার ক্ষেত্রে নতুন কাব্যরীতির প্রবর্তন করেন

সে-সময়ে একটি শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' এবং বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা দুটিকে কেন্দ্র ক'রে সক্রিয় ছিলেন। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, এবং বর্তমান প্রবন্ধকারও এই কবি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ তখন পর্যন্ত জীবিত এবং ক্রিয়াশীল। তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতাবলীর উদ্বোধনের সূচনা তখনই হয়েছিল বলা যায়। একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে কল্লোল যুগের কবিদের তৎকালীন সক্রিয়তা —এই দুই প্রভাবের মধ্যে থেকেও উল্লিখিত কবিগোষ্ঠী বাংলা কবিতায় স্বাতন্ত্র্য এনেছেন। এই কবিগোষ্ঠীর তরুণতম ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আবার অন্য দিক থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালের কাব্য-আন্দোলনেও অন্যতম মুখপাত্র।

তখনকার দিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্বে, একদিকে হতাশা, ক্লান্তি ও উদ্বেগ এবং অন্যদিকে ভবিষ্যতের সুখী ও সুস্থ সমাজ-জীবনের উদ্বোধনের আশ্বাস—এই দুই মানস-চেতনাই স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে :

আমার এ দিনগুলি রক্ত পিষে নিয়ে
দেবতাকে করেছে সুন্দর ॥
ছায়াময় এই রাত হিম হাত দিয়ে
আমাকে করেছে প্রস্তর।
অস্পষ্ট ছায়ারা সব তন্দ্রার ভিতরে
দুঃস্বপ্ন আনে
সেই কথা শুনিয়াছি ক্লান্তির প্রলাপে
দেয়ালের কানে।

(কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

হে কাল হে কৃপাহীন বেদনাপ্রপাত!
ভাঙো ভাঙো ঘন অবসাদ, মধুময় করো তনুমন।
মধুগর্ভ এ মুহূর্তে প্রাণপদ্মে ফোটে যেন জ্যোতির্ময়
আমার ভুবন ॥

(মণীন্দ্র রায়)

অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবেই, অন্যদিকে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যঙ্গ-মিশ্রিত অবজ্ঞার পাশাপাশি নবযুগের সমাজ-চিন্তার প্রতিফলন ঘটলো। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পটভূমি সামনে রেখেও যে স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে মৌলিক কবিতা লেখা সম্ভব সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বধূ' কবিতাটি তার উদাহরণ। ছন্দের দিক থেকে, পটভূমির দিক থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যে বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় তার সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে আরো কয়েকজন তরুণতর কবি উল্লেখযোগ্য কাব্যশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু এই নতুন ও তরুণ সমাজ-সচেতন কবিগোষ্ঠীর অন্যতম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়টা আধুনিক বাংলা কবিতার পক্ষে নানা কারণেই তেমন শুভ হতে পারে নি। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, আগষ্ট-আন্দোলন, এবং শেষ পর্যায়ে দেশ-বিভাগ—এই নানা ঘটনা দেশকে যেমন, তেমনি কবি হৃদয়কেও ক্ষত-বিক্ষত করেছিল বলা যেতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে দু'একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হয়তো কোনো কোনো কবি লিখেছেন, কিন্তু সমগ্রভাবে, যতগুলো কবিতা এসময়ে লেখা হয়েছিল সেগুলো মনে রাখলে, বলতেই হবে এই সময়ে বাংলা কবিতা বাইরের ক্ষুব্ধ নানা ঘটনার ধাক্কায় ভারসাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি। এমন কি বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান কবিরাও কারুশিল্প কৌশলের কুশলতা সত্ত্বেও সে-সময়কার কবিতায় সমসাময়িকতাকে অতিক্রম করে চিরন্তনের দিগন্ত রেখার দিকে অগ্রসর হতে পারেননি।

সুখের বিষয়, এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। একদিকে পুরাতন, ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, কবিরা ক্রমশ আধুনিক বাংলা কবিতার লুপ্ত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেন; অন্যদিকে তরুণতর অনেক নতুন কবিও দেখা দিলেন যাঁরা আঙ্গিক এবং উপকরণের দিক থেকে সময়োচিত পরীক্ষায় সচেষ্ট হয়ে বাংলা গীতি কবিতার ধারাকেই সমৃদ্ধ করলেন।

ইদানীন্তন কালে, বাংলা কবিতার চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে, রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের মহৎ ঐতিহ্যের পাশাপাশি আলাদাভাবে চিহ্নিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও কোনো কোনো দিক থেকে স্বাবলম্বী নতুন কাব্য প্রচেষ্টা উল্লেখ্য। আজকের তরুণতর বাঙালী কবি রবীন্দ্র-কবিমানসের প্রকৃতির প্রতি গভীর

শ্রদ্ধাশীল হলেও রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে অভ্যস্ত নন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদের মধ্যে গত তিরিশ বছরেরও অধিক কালের কাব্য-আন্দোলনের বিস্তৃত অধ্যায়। সুতরাং তাঁরা রবীন্দ্রনাথের চাইতে কল্লোল-যুগের কবি গোষ্ঠীর ও রবীন্দ্রোত্তর সকল কাব্য আন্দোলনের অধিকতর নিকটবর্তী।

মাথা পেতে তবে মেনে নিতে হবে
শাদা আরশির নিরেট ব্যঙ্গ?
যে-কুসুমগুলি মেখেছিলো ধূলি
তা-ও কি পাবে না তোমার সঙ্গ?
স্মৃতি থেকে তাই এনেছি দুমুঠো
গন্ধ মদির আমন ধান্য।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাবো কি পরশ যৎ সামান্য?

(অরুণকুমার সরকার)

শান্তিনিকেতনের বৃষ্টি: ছুটি শেষ। ভিজে আলতা-
শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউন্টর চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস

কলকাতায় ফিরে যদি—যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই? যদি সে নিজেই এসে থাকে?

(নরেশ গুহ)

এখানে বিক্ষত আমি, সারাক্ষণ প্রশ্নের পাথরে
মাথা খুঁড়ি; শান্তিহীন বুদ্ধির আগুনে দুই পাখা
পুড়িয়ে সর্বস্বরিক্ত।

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

থাক, কৃষ্ণচূড়া,
অবাক হবার মত তেমন বসন আর পৃথিবীতে নেই।

যাকে নিয়ে মন হ'তো সোনা
সে-হৃদয় এজন্মে পাবে না।

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

একই যুগে লিখিত হলেও প্রথম তিনটি উদ্ধৃতিতে স্নিগ্ধ সংরাগের এবং শেষের দুটি স্তবকে যন্ত্রণার উপলব্ধি উন্মোচিত। উপকরণ যাই হোকনা কেন, এখনকার কবিতায় প্রকাশভঙ্গির লাবণ্য ও স্নিগ্ধতা লক্ষণীয়। এমনকি, ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্রেও ভাষাব্যবহারে, বাচনভঙ্গিতে উগ্রতা নেই, যেমন পাওয়া যায় নজরুল কি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতায়। প্রেমের অভিব্যক্তিতে, প্রতিবাদের সুরে, হৃদয়মন্থিত যন্ত্রণার প্রকাশে সর্বত্রই সাযুজ্যবোধ ও সংহতির বিস্তার। এই পথেই ইদানীন্তনকালের বাংলা কবিতার যাত্রা।

পিতামহ অন্ধকার, পূর্ব পুরুষ পাহাড়, গন্ধর্ববাসী তারা,
যদি প্রাণ দিলে তবে প্রাণের গর্ব দিলে না কেন
যদি সাধ দিলে তবে সার্থকতার ক্ষমতা দিলে না কেন
যদি প্রেম দিলে তবে রক্ষার পৌরুষ দিলে না কেন
পিতামহ অন্ধকার, পূর্বপুরুস পাহাড়, গন্ধর্ববাসী তারা ?

(রাম বসু)

আধুনিক কাব্য-আন্দোলনে এক সময়ে অতিশয়োক্তি এবং চলতি ভঙ্গির উগ্রতা ছিল। কতকটা রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবকে এড়াবার সচেতন প্রয়াস হিসেবে এবং কিছুটা সমসাময়িক ইংরেজি ও য়ুরোপীয় কাব্যের প্রভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার সুস্থ ও স্নিগ্ধ স্বরূপ ব্যাহত হয়েছিল। যা কেবলমাত্র স্থায়িক, সাময়িক তাকে ঘিরেই আত্মতৃপ্তি চক্রের মতোই আবর্তিত হয়েছিল। গত দশ বারো বছরের মধ্যে আবার এই অবস্থার পরিবর্তনও সম্ভবপর হয়েছে। আনন্দিত হবার মতো, পরিতৃপ্ত হবার মতো উপকরণ হাল আমলের বাংলা কবিতায় একরূপ প্রতিশ্রুত।

সাহিত্যচিন্তায় বলেন্দ্রনাথ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের প্রকৃষ্টচিত্ত সাহিত্যসেবীদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম ছিলেন, এ সত্য যদি আধুনিক কালের পাঠক-সাধারণের কাছে আজকের দিনে অজ্ঞাত থেকে থাকে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ, স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথ মাত্র উনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং আজ থেকে প্রায় সাতান্ন বছর আগে সাহিত্য-সাধনার অনিন্দ্যকর্ম অসমাপ্ত রেখেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তদুপরি বাংলাদেশে অদ্যাবধি কবি ও সাহিত্য-সমালোচকের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে সাধারণ পাঠকজনের উদ্যোগ ও অধ্যবসায় নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং এমন কি নগণ্য। আর সে কারণেই কবি ও সমালোচক বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অকালমৃত্যুর এই অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরে কোনো পাঠক যে বলেন্দ্রপ্রতিভার দীপ্তিতে নিজেকে উদ্দীপ্ত রাখবে, এরূপ প্রত্যাশা সচরাচর না করাই বোধ হয় শোভন।

অথচ সমসাময়িক কালের সাহিত্যচিন্তায় বলেন্দ্রনাথের অবদান নগণ্যমাত্র নয় এবং যে-পাঠক উপন্যাস ও ছোট গল্পের তরঙ্গ-সঙ্কুল তীর অতিক্রম করে সমালোচনা-সাহিত্যের যুক্তি-জালশোভিত চিন্তারাজ্যে প্রবেশ লাভের পক্ষপাতী, তার পক্ষে বলেন্দ্রনাথের সুবিন্যস্ত গদ্য রচনার আকর্ষণ তীব্র হতে বাধ্য। তাছাড়া, বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার প্রধান প্রধান উপাদান ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ। সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য। ফলে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক একবার সে চিন্তারাজ্যে পরিভ্রমণ করলে বলেন্দ্র-নাথের স্বদেশপ্রেম, ঐতিহ্যবোধ ও শিল্পবোধের নিবিড় পরিচয় লাভে শুধু যে বিস্মিতই হবেন তাই নয়, আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ধারায় স্বল্পকালের জন্যে হলেও যে শক্তিমান লেখক নবচেতনার প্রাণস্পন্দন জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই বোধ হয় স্মরণ করতে অনুপ্রাণিত হবেন।

বলেন্দ্রনাথ কবি ও সমালোচক। কিন্তু মাঝে মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেও

কাব্য রচনায় তাঁর অনন্যতা তেমন ধরা পড়েছে কিনা সন্দেহ। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও সর্বত্রগামী কাব্যধারার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব যেমন আরো অনেকের কাব্য রচনায়, তেমনি ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের কবিতা-বলীতেও কোনো না কোনো দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর সে কারণেই 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী'তে (১) উল্লেখযোগ্য পদবিন্যাস বা শ্রুতিসুখকর শব্দচয়নের অসদ্ভাব না ঘটলেও রবীন্দ্রকাব্যের লাবণ্যজড়িত অনেক স্তবককেই সে-সব কবিতা অনিবার্যরূপে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। ফলে, 'মাধবিকা' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতাটি এবং 'কালবেদনা' 'বিষামৃত' 'অকলঙ্ক' কিংবা 'শ্রাবণী' কাব্যগ্রন্থের 'অন্তরবাসিনী' 'অপরাহ্ণে' 'দ্বিধা' ইত্যাদি কবিতা যদি 'চিত্রা' বা 'মানসী'র অন্তর্গত কবিতাগুচ্ছের প্রতিধ্বনি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে অবাক হবার বোধ হয় কারণ থাকে না। কিন্তু তবু একথাটাও স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, বলেন্দ্রনাথের কবিতাবলী রবীন্দ্ররচনার প্রতিধ্বনি হলেও কাব্যরসের আস্বাদন সে ক্ষেত্রেও সম্ভব; এবং বলেন্দ্রনাথ যে-কালে এই কবিতাগুলো লিখেছিলেন সে কালে রবীন্দ্রকাব্যের ভাব, ছন্দ ও ভাষার হুবহু অনুসরণে কাব্যরচনার রেওয়াজ প্রচলিত থাকায় সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে 'মাধবিকা' কি 'শ্রাবণীর' কবিতার উপযুক্ত মর্যাদালাভের বোধ হয় অসুবিধা ঘটেনি। তা ছাড়া বলেন্দ্রনাথ যে কবি ছিলেন একথাটা মনে রাখলে তবেই তাঁর সমালোচনাধারার একটি মূল বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করা সহজ, তাঁর নন্দন-তাত্ত্বিক প্রত্যয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব।

বলেন্দ্রনাথের কবিতাগুচ্ছ পাঠে উপলব্ধি করা যায় যে, সে কবিতাবলীর মাধ্যমে তাঁর কবিকল্পনা অসম্পূর্ণতা থেকে সমগ্রতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল-মাত্র, সামান্য সত্তা থেকে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির অপেক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত করছিল হয়তো,—কিন্তু খুব সম্ভব তারুণ্যজনিত বয়ঃসন্ধির কারণেই সে-সব রচনায় আদর্শ কাব্যের গভীরতা ও ব্যাপ্তির সঞ্চার আর শেষ পর্যন্ত হয়নি। আর, এই কাব্যরচনার পাশাপাশি চলছিল তাঁর প্রবন্ধ রচনা। বাংলা প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা;

(১) মাধবিকা (কাব্য)। ১০ই বৈশাখ, ১৩০৩। পৃঃ ৬২। শ্রাবণী (কাব্য)। ৪ঠা আষাঢ়, ১৩০৪। পৃঃ ২৬।

শেষ পর্যন্ত কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা যেন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এলো, ব্যাপক ভাবেই বলেন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হলেন।

বয়সে তরুণ হলেও বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা কোনো সময়েই বিশেষ কোনো একটি কেন্দ্র অভিমুখেই আবেগ-প্রবণতার সঙ্গে ধাবিত হয়নি। কাব্যরচনায় যুবকোচিত উচ্ছ্বাসের পরিচয় দিলেও প্রবন্ধ রচনায় বলেন্দ্রনাথ প্রায় গোড়া থেকেই প্রাঞ্জল ও সাবলীল অথচ সংহত গদ্য রচনার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন এবং একমাত্র তাঁর গদ্য প্রবন্ধাবলী পাঠের মাধ্যমেই তাঁর পরিণত, বুদ্ধিদীপ্ত অনন্যসাধারণ সাহিত্যচিন্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করা আর আয়াসসাধ্য মনে হয় না। স্বল্পায়ু সাহিত্য-জীবনে, মাত্র চৌদ্দ বছরের মধ্যে (২) পরিমাণের দিক থেকে তিনি অজস্র রচনাই লিখেছিলেন এবং সে-সব রচনার বিষয়বস্তুও বলতে গেলে বহু ব্যাপক ও বিচিত্র ভাবেই বিভিন্ন। সমসাময়িক কালে যে-সব ঘটনা ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-সব সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ যে উদাসীন ছিলেন না, এতে তাঁর সংবেদনশীল, স্পর্শক্ষম মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাঙ্গালীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও স্বদেশপ্রেমের ধারক ও বাহক বলেন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধাবলী পাঠেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে। অতএব সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর সর্বদা বিচরণশীল দৃষ্টি 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' 'কণারক' 'খণ্ডগিরি' 'প্রাচীন উড়িষ্যা' 'বারাণসী' 'ভবিষ্যৎ ধর্ম' 'ভূতকথা' 'লণ্ডন কংগ্রেস' 'জাপানী সভ্যতা' 'বর্মার ডাকাত' ইত্যাদি হরেক রকম বিষয়ের ওপরও ন্যস্ত হতে পেরেছিল এবং এমন কি 'লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি ও আহার্যসংস্থান' 'সশস্ত্র য়ুরোপ' 'খ্রীষ্টীয় নরক' ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কেও তিনি প্রয়োজনের তুলনায় বোধ হয় কম অবহিত ছিলেন না। এ থেকে বোধ হয় এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, তরুণ বয়স থেকেই বলেন্দ্রনাথ স্বদেশ ও সভ্যতায় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন এবং এ সকল ব্যাপারে তিনি বরাবরই গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালোবাসতেন।

(২) বলেন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ৬ই নভেম্বর, ১৮৭০। ২১শে কার্তিক, ১২৭৭। প্রথম প্রকাশিত রচনা : জৈষ্ঠ্য, ১২৯২। মৃত্যুর সন তারিখ : ২০ আগষ্ট, ১৮৯৯। ৩রা ভাদ্র, ১৩০৬।

সাহিত্য বিষয়ক মূল রচনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে অপর একটি প্রসঙ্গ অনুধাবনযোগ্য। স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা কোনো একটি বিশেষ কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতবর্ষের ব্যবসায় সূত্রে বিভিন্ন স্থানে কার্য উপলক্ষে যাতায়াতের সময় নানা অঞ্চলের আন্তর মাহাত্ম্য তাঁর নজরে পড়েছিল, ফলে, উড়িষ্যা, গুজরাট, লাহোর, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় তিনি সংস্কৃতিসমৃদ্ধ পর্যটক মনের বিস্ময়-মধুর নৈপুণ্য প্রকাশ করতে পেরেছেন। নিছক স্থান-বিশেষের ভৌগোলিক বর্ণনায় নয় পরন্তু বলেন্দ্রনাথ যখনই ভারতবর্ষের কোনো উল্লেখ-যোগ্য স্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তখনই সে-স্থানের ইতিহাস ও নানা কীর্তি-কাহিনীর মধ্যে ভারত-আত্মার বাণীকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' 'কণারক' 'খণ্ডগিরি' প্রভৃতি প্রাচীন পীঠস্থানের বর্ণনায় তার প্রমাণ রয়েছে। বলেন্দ্রনাথের মধুর ও সাবলীল গদ্যভঙ্গি যে এই বর্ণনাকে প্রাণময় করেছে, কণারক সম্পর্কিত গদ্য রচনার কোনো-কোনো স্তবক থেকেই সে-দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব। (৩) আধুনিক কালের বঙ্গ-ভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন কালের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির বিরাটত্ব ও ব্যাপ্তিকে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটি অবচেতন অভাববোধ হানা দিতে থাকে ; যে ঐশ্বর্য একদিন ছিল, আজ আর নেই ; যাকে অনুমান বা উপলব্ধি করা যাচ্ছে অথচ দৃষ্টিগোচর বা ইন্দ্রিয়গম্য নয় তার জন্যে তীব্র মধুর খেদোক্তি দিয়েই বলেন্দ্রনাথ অনেক সময় তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। (৪) 'প্রাচীন ভারতবর্ষে একটি সুন্দর পরিপাটি সংস্কৃত সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পাঠকমনে চৈতন্যবোধের সঞ্চারই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, এ বিষয়ে

(৩) "সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন, নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্ক মন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত, এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত।..." বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ। ৫৩৩ পৃষ্ঠা।

(৪) "পরিত্যক্ত পাষাণ স্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশার বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলা-খণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রাম সুখে লীন হইয়া আছে ; সম্মুখের

সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এ বিষয়ে যে তাঁর স্মৃতিচারণা (৫) সার্থক হয়েছে, একথা অস্বীকার করবার বোধ হয় উপায় নেই। বোম্বাই প্রদেশে গণেশ উৎসবে এবং গুজরাটে গরবা উৎসবেও বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের অস্তমিত প্রাণচাঞ্চল্যকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অন্যান্য প্রদেশে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে মেয়েদের 'প্রমত্ত উৎসাহবেগের' তুলনায় বাংলার বরাঙ্গনাদের অপেক্ষাকৃত স্তিমিত আচরণের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। (৬) যেখানেই সম্ভবপর তিনি প্রাচীন সংস্কৃতি ও অনুসন্ধান সম্বন্ধে সার্থক মূল্যায়নের চেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন। আজকালকার ড্রইংরুম-নিবাসী শৌখীন সংস্কৃতিবিলাসীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানটায় যে, কয়েকটি দুর্বোধ্য চিত্রপট, পুতুল ও ফুলের টবে ঘর ও বারান্দা সাজিয়েই

ঝিল্লি মুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিক জন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।--কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত, যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে এবং অন্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণ পাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।" বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী। সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৫৩৫—'৩৬।

(৫) '...কোথায় সে নিত্য নব কবরীর শোভা, কোথায় সে বিচিত্র কেশবিন্যাসের সহিত সুশোভন বিবিধ অলঙ্কার, কোথায় সে মৃণালভুজে চারু বলয়কঙ্কণ!' বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। পৃঃ ৫৩৭।

(৬) "...নিরানন্দ বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই প্রকৃতির সহিত নারীহৃদয়ের একটা প্রকাণ্ড সমবেদনা দেখা যায়। কোথাও বা বর্ষায়, কোথাও শরতে, কোথাও বা, নব বসন্তে—হয়, পর্যাপ্ত পুষ্পপল্লবের বিকাশে, নয়, স্নিগ্ধ সজল সঘন নবমেঘের সমাগমে, নয় শিশির মণিখচিত কনক শস্যরাশির প্রচুর পরিণতিতে রমণীগণ মঙ্গলগান এবং আনন্দনৃত্য সহকারে প্রকৃতির উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। মূঢ় প্রকৃতি যখন কেবল সমীরোচ্ছ্বাসে ঘনঘটায়, ফুলেফলে পল্লবে নব নব প্রাণ সঞ্চারের আনন্দ মূকভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন দণ্ডায়মানা প্রমদাগণ তাহাকে সুকণ্ঠের সঙ্গীতময় বাক্যময় ভাষা অর্পণ করিয়া বিশ্বব্যাপী আনন্দ প্রকাশকে সম্পূর্ণতা দান করেন। তাহা দেখিয়া মনে হয়, নারীগণ যেন আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অন্তরঙ্গ ভাবে আত্মীয় ভাবে বিশ্বপ্রকৃতির সন্নিকটবর্তী হইয়া আছেন ;—যে নিগূঢ় প্রাণপূর্ণ পুলক-চাঞ্চল্য মাটির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অপূর্ব ইন্দ্রজালে শাখায়-শাখায় পুষ্পস্তবক এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শস্যমঞ্জরী বিরচিত করিয়া দেয়, তাহা অলক্ষিতভাবে রমণীগণের সুকুমার দেহলতিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৃত্যে এবং গীতে স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠে। উন্মুক্ত আকাশতলে পৃথিবীর সৌন্দর্যসভায় বিশ্বলক্ষ্মীর সহিত আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের এই কোলাকুলি, এই প্রকাণ্ড প্রীতিসম্ভাষণ, এমন শোভন সুন্দর দৃশ্য আর কি কিছু আছে? কিন্তু হায়, সমস্ত বঙ্গদেশে বসন্ত হইতে হেমন্ত পর্যন্ত সমস্ত ঋতুর পর্যায়ে স্ত্রীকণ্ঠের সঙ্গীত একেবারেই নীরব।..." গুজরাটে গরবা। বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। পৃষ্ঠা ৫৫৩-৫৫৪।

তাঁর উত্তম নিঃশেষিত হয়ে পড়েনি, পরন্তু, যেখানেই সম্ভব প্রাচীন নগর, পুরাতন স্থপতি বা শিল্পকার্য এবং ধ্বংসাবশেষের মুখোমুখী হয়ে তিনি অতীতকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। ফলে, সমগ্রভাবে না হলেও বলেন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় স্বদেশ ও সভ্যতার অতীত গৌরবের স্মৃতিসুখকর চিত্র মূর্ত হয়েছে এবং সে-বৃত্তান্ত পাঠে পাঠক-মনেও ভাবাবেগ ও বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার সম্ভব হতে পেরেছে। 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে চিত্রকলার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ যে বিস্তারিত বক্তব্যের অবতারণা করেছেন তা' থেকেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হবে। পুরাতন চিত্রপট সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ যে 'বিচিত্রাভ বর্ণসঙ্গমে'র উল্লেখ করেছেন (৭) তাঁর এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতেও সেই বর্ণময়তা বিচিত্র-ভাবেই প্রকাশলাভ করেছে। মনে রাখা দরকার, বলেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৩০৫ সালে, অর্থাৎ, আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে; এবং একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন সেকালের আর কোনো লেখক চিত্রশালা ও চিত্রকর সম্বন্ধীয় রচনায় এরূপ 'স্নিগ্ধোজ্জ্বল রমণীয় আলোক নিক্ষেপ' করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। রচনাটি বর্তমান প্রবন্ধকারের বিবেচনায় বার-বার করে পড়বার মতো এবং বলেন্দ্রনাথের সার্থক, সুরঞ্জিত ও রম্যময় গদ্যভঙ্গির অন্যতম দৃষ্টান্ত। 'রবিবর্মা' সম্পর্কিত আলোচনাটিও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং তাতেও অনুরূপ প্রসাদগুণ বর্তমান।

কিন্তু বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁর অজস্র সাহিত্য-বিষয়ক নিবন্ধাবলী এবং এই রচনাবলী নিঃসন্দেহেই আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্য ও ললিতকলা সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি চিত্তহারী ভাষা ও অতুলনীয় গদ্যভঙ্গির যে পরিচয় দিয়েছেন তাকে বিস্ময়কর বলা চলে। আর সে-কারণেই নান্দনিক ভাব-কল্পনায় বলেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য সহজেই ধরা পড়বে। সমাস-সন্ধি-অনুপ্রাসের দুর্বহ গুরুভার কোথাও তাঁর ভাষাকে রুদ্ধশ্বাস করেনি এবং যেখানেই সম্ভবপর নতুন শব্দ, নতুন উপমা ও রূপকের সাহায্যে বলেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষায় সাবলীল গতিবেগ এবং প্রশান্ত গভীরতার

(৭) "...আমাদের পুরাতন সূর্যালোক অবহেলালাঞ্ছিত তাহার সেই পুরাতন চিত্রপট আজিও পরিত্যাগ করে নাই। তাহা যেন কেবল এই প্রাচীন চিত্রফলক এবং বিচিত্র শিল্প ও কারুকলার মধ্যে এই চিত্রকলা চিরদিন বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাহারই বিচিত্রাভ বর্ণসঙ্গমে একান্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে।..." দিল্লীর চিত্রশালিকা। বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী। পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮

ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর পত্তরচনার যে সীমাবদ্ধ ও চেষ্টিত আবেদন লক্ষ্য করা যায় গত্তরচনার গোড়া থেকেই সে-দুর্বলতা তিনি এড়িয়ে এসেছেন। প্রায় গোড়া থেকেই তাঁর গত্তরচনা সমকালীন সাহিত্যসেবীদের অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু হয়েছিল। এবং এ সম্পর্কে প্রিয়নাথ সেন একবার যে উক্তি করেছিলেন তাকে তাই অতিশয়োক্তি মনে করারও সঙ্গত কারণ নেই। (৮)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক জায়গায় বলেছিলেন যে, বলেন্দ্রনাথ বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করবার আগেই প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের নানা নিবন্ধে, বিশেষ ক'রে শেষ জীবনের রচনায় রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তির সমর্থন প্রভূত পরিমাণেই মিলবে। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ যুবক বয়সেই যে বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং সে সাহিত্যের অপরিমেয় রূপরস যে তিনি প্রভূত পরিমাণে পান করেছিলেন, তার নজীর তাঁর রচনায় প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। 'উত্তরচরিত' 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' 'মৃচ্ছকটিক' 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ইত্যাদির আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ অনভিজ্ঞ পাঠকসমাজের সামনে নির্মল আনন্দরসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিতে পেরেছেন এবং এই আধুনিক কালেও যে-সব পাঠকের পক্ষে মূল সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়, বলেন্দ্রনাথের সমালোচনার মাধ্যমে তাঁরা মূল-সাহিত্যের আনন্দরস যে অনেকটাই আস্বাদন করতে পারবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। 'উত্তরচরিত' 'মেঘদূত' কি 'মৃচ্ছকটিকের' বাংলা অনুবাদ কার্য বলেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না এবং সে চেষ্টাও তিনি করেন নি। কিন্তু সাহিত্যসমূহের আলোচনা তিনি এরূপ ভাবে করেছেন যে, যে-পাঠকের মূল রচনার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ও নেই তিনিও যাতে সে-সাহিত্যের প্রতি অভাবনীয় আকর্ষণ অনুভব করেন। বলা বাহুল্য, বলেন্দ্রনাথের জড়তাহীন সুসংস্কৃত মনের অদম্য উদ্যোগ, কবিত্বময় মাধুর্যমণ্ডিত গত্ত ও প্রকৃত রসিকজনোচিত বিচিত্র, উদার দৃষ্টিভঙ্গিই এসব আলোচনায় সঞ্জীবনীপ্রবাহের সঞ্চার করেছে।

(৮) '...গদ্যের সকল পর্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গি নাই যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না।...' সাহিত্য-সাধক চরিতমালা। ১৩৫৪। পৃষ্ঠা ১৮।

কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার শেষে বলেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, নারী এবং প্রকৃতি সৌন্দর্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোনো কবিতে দেখা যায় না। "একটি রূপসীর চিত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে কালিদাসের স্ফূর্তি ধরে না। সুখে দুঃখে বেদনা বিলাসে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যেন কিছু সস্নেহ সহৃদয়তা দেখা যায় এবং স্ত্রীসঙ্গে তিনি একটু বিশেষ আনন্দলাভ করেন।" বলেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে কালিদাসের প্রতিভায় যে বিশেষত্ব দেখা যায় 'শকুন্তলা' নাটকেই তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। (৯) এখানে আত্মপ্রকৃতির সমগ্র অনুরাগ সেচন করতে পারেন কালিদাস এরূপ একটি স্বস্বভাব অনুযায়ী বিষয়ে প্রতিভাকে নিয়োজিত করতে পেরেছেন বলেই সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে শকুন্তলা এমন একটি অপূর্ব সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলেন্দ্রনাথ আরো দেখিয়েছেন যে, কালিদাসের চিত্রপ্রিয় কবিপ্রকৃতি কেবল ছবি আঁকবার জন্যেই আপন মনের মতো বিষয়টি নির্বাচন করে নিয়েছে। রঘুবংশ থেকে নানা দৃষ্টান্তের অবতারণায় তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনও জুগিয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় একটি চিত্রশালা পরিদর্শনের পর মনের ভাব যেরকম হয়ে থাকে কালিদাসের রঘুবংশ পাঠান্তেও মনের মধ্যে অনুরূপ ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। রঘুর নানা দেশে পর্যটন ও দিগ্বিজয়, ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভা, রাজা দশরথের মৃগয়াগমন, রামসীতার রথযাত্রা, পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী, অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ— 'এইগুলি ছবি—বাকি সমস্তই ফ্রেম'। কালিদাস বর্ণনায় সুনিপুণ কিন্তু

(৯) "...শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং কথাবার্তা পর্যন্ত যেন তুলি দিয়া আঁকা যায়। চিত্রকর যেমন রূপসীকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এবং নানা ভঙ্গিতে আঁকিয়া তাহার সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলেন, কালিদাস সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্যে এবং বিবিধ ভাব ও ভঙ্গিতে যত রকমে সম্ভব শকুন্তলার সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। কোথাও বা কুরবক-শাখায় বল্কল বদ্ধ হইয়া যায়, কোথাও বা প্রিয়সখী বল্কলের দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, কোথাও বা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সুন্দরীর নব কিশলয়বৎ রূপলাবণ্য ফুটিয়া পড়ে; সৌন্দর্যের কবি সৌন্দর্য ফুটাইতে ব্যাকুল—একটি বাহুভঙ্গি, একটি হৃদয়-স্পন্দন, পাণ্ডু মুখকমলে অতি ক্ষীণ মৃদু অরুণিমাসঞ্চার এবং স্নিগ্ধদৃষ্টির নিবিড় চাঞ্চল্যটুকু পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না।...যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষিবালিকার সমাবেশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সেই দুই অনুরাগের (নারী এবং প্রকৃতিসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ) মিলন হইয়াছে। নগরবাসী রাজা, তপোবনের পালিত মৃগসেবিত তরুকুঞ্জের মধ্যে একটি ঋষিকুমারীর—একটি অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া যে একটি নাট্য ব্যাপার ঘটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যেন কবির নিজের কামনাস্বপ্ন।...' বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। পৃষ্ঠা ১৩ ও ১৪।

চরিত্রচিত্রণে যে তেমন কুশলী হতে পারেন নি সে-কথার উল্লেখও বলেন্দ্রনাথ অনেক স্থলেই করেছেন। তা ছাড়া, খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কালিদাসের বিশেষ দৃষ্টি ও ঝোঁক থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারেন নি এবং এই কবি যে নিপুণ চিত্রকর হয়েও তাঁর অতিনৈপুণ্য বশতঃই হিমালয় ও সমুদ্র-বর্ণনায় অকৃতকার্য হয়েছেন সে-প্রসঙ্গও মনোরম গদ্যভঙ্গির মাধ্যমে বলেন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন। রামায়ণের মৃগয়াবর্ণনার পাশাপাশি কালিদাসকল্পিত মৃগয়াকে বলেন্দ্রনাথ 'সৌখীন বিলাসমাত্র' বলে অভিহিত করেছেন এবং ভবভূতি যেস্থলে একটিমাত্র মেঘমন্দ্র সমাসে বিন্ধ্যপর্বতের অন্ধকার অরণ্য চোখের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়তে পারেননি একথার উল্লেখ করেই তাঁর বক্তব্যের উপসংহার ঘটেছে।

বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা সমগ্রতার সন্ধানী। ফলে, সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় প্রথমেই পটভূমির বিস্তৃত বিবরণী তিনি স্পর্শক্ষম পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করার পক্ষপাতী। সুতরাং যে-পাঠকের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাও নেই তাঁর পক্ষেও মনোযোগী হলে মূল বিষয়ের রস ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে আভাস পাওয়া সম্ভব। 'মৃচ্ছকটিক' 'রত্নাবলী' 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ইত্যাদি প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় তার প্রমাণ চূড়ান্ত-ভাবেই উপস্থিত। এমন কি 'মেঘদূত' 'ঋতুসংহার' কাব্যসাহিত্যের চিত্তাকর্ষক আলোচনায়ও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের লিপিচাতুর্যের গুণে পাঠক গলদ্‌ঘর্ম না হয়েও তাঁর বক্তব্যের মর্মমূলে গিয়ে পৌঁছাতে পেরেছেন এবং সে-স্থান থেকেই ধীরে ধীরে শান্ত পদক্ষেপে সমালোচক-প্রদর্শিত কবিকল্পনার বৈচিত্র্য বিচ্ছুরিত সমতল পথে আনন্দের সঙ্গে বিচরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। 'মৃচ্ছকটিক' প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ মূল সংস্কৃত রচনার অনুসরণে রাজনটী বসন্তসেনার প্রাসাদের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে নাটকের সেই বিশেষ দৃশ্যটি অভিভূত পাঠকের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছে বলতে পারা যায়। এখানেই বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা স্বতন্ত্র শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকৃত বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহের' সমালোচনার মতোই বলেন্দ্রনাথের অনেক সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাও তাই

যথার্থ সৃজনশীল সমালোচনার দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। শুধু লেখকরাই যে সৃষ্টি করেন না, প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ ও রসসন্ধানী সমালোচকরাও যে সৃষ্টি করতে পারেন, বলেন্দ্রনাথের নানা রচনায় তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

সৃজনীশিল্পই হোক বা সমালোচনাশিল্পই হোক, তার প্রধান অবলম্বন ভাষা এবং সে-ভাষায় বলেন্দ্রনাথের দখল অসাধারণ ছিল বলেই, সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি অসাধ্যসাধন করতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে তাই প্রিয়নাথ সেনের উক্তিকে (১০) অতিশয়োক্তি মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ আছে কিনা সন্দেহ। প্রকৃত প্রস্তাবে যে মুষ্টিমেয় শক্তিমান গদ্যলেখক আধুনিক বাংলা ভাষায় বৈচিত্র্য, দীপ্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন, বলেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহেই তাঁদের প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান এবং মধুর ও চিত্তহারী বর্ণনার ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালে তাঁর প্রতিযোগীর সন্ধান নিশ্চয়ই অনায়াসসাধ্য ছিল না।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায়ও বলেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রয়েছে। 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস' 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর' সম্বন্ধীয় তাঁর রচনাবলীপাঠে পাঠকমনে যে অপূর্ব রসসঞ্চার হয়, তার মূল্য বড়ো অল্প নয় এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এই রচনাবলী যে মূল্যবান উপক্রমণিকা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় আরো একটি বিষয় নজরে পড়বে; সেটি বলেন্দ্রনাথের ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত মৃদু-মধুর হাস্যরস। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লেখকদের রচনায় যেখানেই অসঙ্গতি ও নীচতা প্রকাশ পেয়েছে সেখানেই বলেন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যরস ও ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন। অতএব কবি জয়দেব সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করতে তিনি

(১০) "...সে গদ্য সকল কথা কহিতে জানে, সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনই সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা। এক একটি কথা এক একটি চিত্র; এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাংলা গদ্যে কোথাও দেখি নাই। এই বিস্তৃত অভিধান ভাষার অপূর্ব বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে—সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ, সরল, ভদ্র কোথাও সরসীর ন্যায় স্নিগ্ধ, কোথাও ফল পুষ্পাস্তরণে বিচিত্র এবং কোথাও নক্ষত্রনিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ন্যায় সমুজ্জ্বল।..." সা, সা, চ, পৃঃ ২১।

ইতস্তত: করেননি। "…হরিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়ত তাঁহার (জয়দেবের) লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বিলাসকলায় কুতূহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না।…দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণত: কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।…এই অতি সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। …সম্ভোগবর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানা ছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ধারই সর্বাপেক্ষা জঘন্য।…" বলেন্দ্রনাথের এই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অন্যত্রও উপস্থিত। কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রসঙ্গে ধনপতি ও শ্রীমন্তের চরিত্রে কবিকঙ্কণের সৃষ্টি-কল্পনার অভাব উল্লেখ করেও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপমিশ্রিত হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। "তাঁহার ধনপতি প্রতিদিন ঘরে-ঘরে দেখা যায়। রাগ হইল স্ত্রীকে দুই ঘা বসাইয়া দিয়া ধনপতি স্থির হইলেন। তাঁহার কাপুরুষত্বও মনে হয় না, স্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন বলিলে অবাক হইয়া থাকেন মাত্র।…শ্রীমন্তের ভাবও পিতার মত।… সুশীলাকে বিবাহ করিয়াই জয়াবতীর পাণিগ্রহণ করিতে শ্রীমন্তের বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হইল না।…শ্রীমন্ত একীকরণ, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিলন, এ সকলের বড় ধার ধারে না। হয়ত তাহার অর্থই বুঝে না, এমনতর কতকগুলো বড় বড় কথা উচ্চারণ করিয়া তাহাকে বিবাহকার্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। স্ত্রী সেবা করিতেই আছে। সুতরাং পঞ্চাশটা বিবাহ করিলে চব্বিশ ঘণ্টা পাখার বাতাস খাইবার সুবিধা। জঠরানলবিহীনা স্ত্রী মিলিলে খরচের হিসাবে আরও ভাল। শ্রীমন্ত, বোধ হয়, এই ভাবের অধিক উর্ধ্বে উঠে নাই।…কবিকঙ্কণের যে কল্পনার অভাব, তাহা উন্নত, মহান, গম্ভীর কল্পনা। লাগাম-ছাড়া কল্পনা আলস্যের চির সহচর। আমাদের তাহার অভাব হইতেই পারে না। কবিকঙ্কণ যে তেমন কবি ছিলেন, তাহাও নহে। লেখক একজন তিনি বটে।…" এবং এই প্রবন্ধেই অন্যত্র "দুর্বলা হাট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। মুকুন্দরাম তাহার এক নিখুঁত হিসাব দিয়াছেন; হাট-বাজারে মুকুন্দকে কেহ ঠকাইতে পারে না।…" এবং এরূপ নানা মন্তব্য বলেন্দ্রনাথের নানা রচনায় নজরে পড়বে। পুরাণের

দেবদেবী সম্পর্কে বাঙালী কবির সহজাত রূপকল্পনা প্রসঙ্গেও তাঁর সাহিত্য-চিন্তার অনন্যতা প্রমাণিত হবে। 'শিব' সম্বন্ধীয় নিবন্ধটি এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং 'বাংলা সাহিত্যে দেবতা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। তাছাড়া, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায়ও যে বলেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী' রচনাটিকে তার প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে।

মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত রচনায় বলেন্দ্রনাথ বহু বিষয়ে লিখেছেন। সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। শুধু একথাটাই জোর দিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে যে, বলেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ কবিকল্পনা ও চিত্তহারী ভাষার মণিকাঞ্চন সংযোগে তাঁর সাহিত্যচিন্তা সংযত ও সুগভীর আনন্দ-রসের জগৎকে উন্মোচিত করেছে। এমন কি, বিশেষ এক-একটি ভাব নিয়ে লেখা তাঁর ছোট ছোট 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধেও এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বাংলা সাহিত্যে যে অল্প ক'জন লেখক বিস্ময়কর ও বিচিত্রভাবে সৃজনশীল সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন বলেন্দ্রনাথকে তাঁদের অন্যতম বলে মেনে নিতে বাধা নেই। ভাষা গঠনে ও ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিতে তিনি যে গোড়া থেকেই স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন একথার উল্লেখ আচার্য রামেন্দ্র-সুন্দর বলেন্দ্রনাথের আদি গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় করেছিলেন (১১) এবং সে-উক্তি যে অতিশয়োক্তি নয়, তা বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী পাঠে অতি-আধুনিক কালের পাঠকও উপলব্ধি করতে পারবেন। কাব্যে যে ছন্দলীলা কাব্যপাঠককে মাতায় সেই ছন্দই ভাবের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে তাঁর গদ্যরচনায় প্রাণের প্রসার ঘটিয়েছে।

(১১) .."শুনিয়াছি, বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল, শিক্ষানবিশী অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না, কিন্তু শব্দগুলিকে বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া কোথায় কোন্‌টি বসিলে মানাইবে ভাল, তাহা স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিকরের হাতের অপূর্ব কারুকার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐশ্বর্যের দীপ্তি অপেক্ষা সৌষ্ঠবের শ্রীছাঁদ দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার জন্য যে সুরুচির, যে সামঞ্জস্য বুদ্ধির, যে সংযমের প্রয়োজন ছিল, তাহা প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাষার প্রতি এইরূপ যত্ন অতি দুর্লভ, অধিকাংশ লেখক ভাষাকে কেবল ভাবপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র দেখেন, উহাকে কারুশিল্পের হিসাবে দেখেন না। বলেন্দ্রের ভাষায় যে স্নিগ্ধ, কোমল, প্রশান্ত উজ্জ্বলতা আছে, তাহা চোখ ঝলসাইয়া দেয় না, কেবল তৃপ্তিই উৎপাদন করে।..." সজনীকান্ত দাস কৃত বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তায় যে-সব প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার অনুরূপ আলোচনা বেশী দেখা যায় না। সে-কারণেই বলেন্দ্রনাথের রচনাবলী সৎসাহিত্যের অনুসন্ধানী পাঠকসম্প্রদায়ের সুবিবেচনার অপেক্ষা রাখে। একজন জীবনীকার বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটিতে বাংলা সাহিত্যে যে নবধারার প্রবর্তক, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সমূহে সেই ধারারই পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় (১২)। অন্ততঃ বলেন্দ্রনাথের অনেক গদ্য রচনা পাঠে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য ও ভাষার অপূর্ব মাধুর্যের আস্বাদ যে লাভ করা সম্ভব, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। এক-এক সময় ভ্রম হয় বুঝি রবীন্দ্র-রচনাই পড়ছি! আর সে কারণেই বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর প্রসঙ্গ পাঠকমনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে 'the realisation of a purpose' নয়, কিন্তু 'the realisation of a possibility' সম্বন্ধেই সজাগ হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী সুদীর্ঘকাল সাহিত্যসাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্য নানা দিক থেকেই সমৃদ্ধ হয়েছে। বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘায়ু হলে এবং সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখার সুযোগ পেলে আধুনিক বাংলা সমালোচনা যে সমৃদ্ধতর হতো একথা বোধ হয় অনুমান করা চলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে তাঁর কাছ থেকে যে রচনাবলী পাওয়া গিয়েছে বাংলাসাহিত্যে তা' শুধু মূল্যবান সংযোজন-মাত্র নয়, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত ও স্বল্প-আলোচিত দিকটার ওপর তার ফলে নতুন আলোকসম্পাত হয়েছে বলতে পারা যায়। সংখ্যার দিক থেকে মুষ্টিমেয় হলেও আধুনিককালের যে-সব পাঠক-পাঠিকা সৎসাহিত্যের আলোচনায় আস্থাবান এবং সাহিত্যে সমন্বয় ও সমগ্রতার সন্ধানী বলেন্দ্রনাথের রচনাবলী তাদের মূল্যবান প্রাণসূত্রের সন্ধান দেবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

(১২) বলেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালার অন্তর্ভুক্ত জীবনী দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ১৬। ১৩৫৪

বাংলা সাহিত্য ও প্রমথ চৌধুরী

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান বটে কিন্তু এ-কথা বোধ হয় অনেক সাহিত্য-পাঠকেরই সহসা মনে পড়ে না যে, বাংলা গদ্যের ভাষা ও রচনারীতি আজকের দিনে নানা দিক দিয়েই যে এত সমৃদ্ধ হয়েছে তার মূলে রয়েছে সবুজ পত্রের যুগে প্রবর্তিত প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণধার কিন্তু সংহত গদ্যভঙ্গির প্রভাব। বস্তুত, বাংলা ১৩২১ সালে সবুজ-পত্রের প্রকাশের শুরু থেকেই কথ্যভাষার সাহায্যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে যে নতুন নিরাভরণ অথচ সরস রচনারীতির সূত্রপাত চৌধুরী মহাশয় করেছিলেন, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হতে পেরেছে আজকের দিনের সর্বত্রগামী বাংলা গদ্যভঙ্গির সৃষ্টি। প্রমথ চৌধুরীর প্রধান কৃতিত্ব এইখানটায় যে, আজকালকার এই বহুল প্রচলিত কথ্যভাষাকে মহৎ সাহিত্যের বাহনরূপে তিনিই একদা সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, গভীর জ্ঞান ও বহুমুখী চিন্তাধারা প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন।

অথচ আজকের দিনেও কোন কোন রসিক মহলে এরূপ ধারণা অব্যাহত রয়েছে যে, বাংলা গদ্য-সাহিত্যে শুধু মাত্র একটি বিশেষ ধরনের গদ্যভঙ্গির প্রবর্তনের জন্যই বুঝি প্রমথ চৌধুরী আমাদের নমস্য। আর সে-কারণেই বোধ হয় আধুনিক নানা পত্র-পত্রিকায় অনেক সজাগ সমালোচক পর্যন্ত 'বীরবলী' রীতির নজির-স্বরূপ তাঁর রচনাবলী থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েই নিরস্ত থাকতে পারলে খুসী হন; অথচ এ কথার উল্লেখ করা দরকার বোধ করেন না যে, চৌধুরী মহাশয় কথ্যভাষায় শুধু একটি বিশেষ ভঙ্গিরই প্রবর্তন করেননি তিনি এরূপ এক ভাষার প্রচলন করেছেন যার মেরুদণ্ড সবল ও দৃঢ় এবং যে ভাষা গভীর জ্ঞান ও চিন্তা প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। বস্তুত পক্ষে, সবুজ-পত্রের সূচনা থেকেই সুসংস্কৃত বাঙালী চিত্তে প্রমথ চৌধুরী যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার কারণ নিশ্চয় এই যে, অন্ধ সংস্কার ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যয়ী প্রগতিশীল ভাবধারার বর্তিকামালাকে তিনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন,—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজবাদ

ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে চিন্তাশীল পাঠকের বুদ্ধিকে শুধু উদ্রিক্ত ও সজাগই করেননি, পাঠক-মনকে পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ করতেও সমর্থ হয়েছিলেন।

সবুজ-পত্রের যুগে নতুন করে আলোড়িত হয়েছিল বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন। অনেক চিন্তার স্তূপ জড়ো হয়ে উঠেছিল, অনেক জিজ্ঞাসার সদুত্তর খুঁজতে শুরু করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের নব্য পাঠকরা। প্রথম মহাযুদ্ধের কালো মেঘ তখন মাথার ওপর সমুদ্যত,—রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক সে-সময়ে জমে উঠেছে। আর সে-কারণেই সে সময়ে নানা জ্ঞান ও বিদ্যার বিশ্লেষণ অনিবার্য-রূপেই আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে এতো নতুন-নতুন উপকরণ জমে উঠেছিল যে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় তার প্রকাশ কাম্য না হয়েই পারেনি। সহজ ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যেরূপ অনায়াসে আলোচনা করেছেন তা দেখে অবাক হতে হয়। তাঁর বিচিত্র প্রবন্ধাবলী পাঠে দেখা যায়, অনেক জটিল ও দুরূহ এবং অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয়েও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং সে-আলোচনা রসঘন ও যুক্তিনির্ভর হওয়ায় প্রকৃষ্টচিত্ত পাঠক হৃদয়কে আনন্দে পরিপ্লুত করতে সমর্থও হয়েছে। বীরবলের ভাষার বিরুদ্ধে এক সময়ে যে প্রবল আক্রমণ চলেছিল কালক্রমে তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। বিপিনচন্দ্র পাল থেকে মোহিতলাল মজুমদার পর্যন্ত অনেক লেখকই বীরবলী রচনারীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এঁরা নিজেরাও ছিলেন শক্তিশালী ও কীর্তিমান গদ্য-লেখক; কিন্তু সাধু গদ্য ছাড়া আর কোন গদ্যরীতি যে সাহিত্য-চর্চাকে সমৃদ্ধ করতে পারে এ ধারণাটাই ছিল এঁদের কাছে দুর্বিবহ। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় যখন অবলীলাক্রমে নব-প্রচলিত কথ্যভাষাকে নানা কাজে লাগাতে লাগলেন তখন আধুনিক কালের বিস্ময়-বিমুগ্ধ যুবচিত্ত নিঃশঙ্ক হয়েই বরণ করে নিল সেই মনন-সাধনার আশ্চর্য ফসলকে।

প্রমথ চৌধুরী এক জায়গায় বলেছেন যে, সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নয়, বয়স্যের সম্বন্ধ। বোধ হয় সে-কারণেই তাঁর রচনার প্রায় সর্বত্রই মার্জিত রসিকতা ও প্রচ্ছন্ন কৌতুকবোধের বিস্তার অনায়াসেই চোখে পড়বে। তিনি লঘু ও গুরু এই দুই ধরনের রচনাই

লিখেছেন এবং এক দিকে লঘু আলোচনাকে তিনি অত্যন্ত তরল করবার যেমন পক্ষপাতী ছিলেন না, অন্য দিকে তেমনি গুরু রচনাকেও গুরুগম্ভীর ও দুরাগম্য করার বাতিক তাঁকে কখনোই পেয়ে বসেনি। এক দিকে বইয়ের ব্যবসা, সবুজ-পত্র, সাহিত্যে চাবুক, বর্ষার কথা, রূপের কথা, মলাট-সমালোচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানা টীকা ও টিপ্পনির সাহায্যে নানা লঘু ও চুটকি আলোচনা যেমন সম্ভব হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি রামমোহন রায়, মহাভারত ও গীতা, হর্ষচরিত, রায়তের কথা, ভারতবর্ষ ও সমাজ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর আলোচনায়ও সরস ও প্রাঞ্জল অথচ তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা তিনি অনায়াসেই করে গিয়েছেন।

আধুনিক সাহিত্যে উৎসাহী অথচ প্রমথ-রচনার সঙ্গে অপরিচিত এরকম যদি কেউ থাকেন, তাহলে বলতেই হবে সে-পাঠকের সাহিত্যচর্চায় মস্ত ফাঁক রয়ে গেল। বস্তুত পক্ষে প্রমথ-সাহিত্য শুধু সবুজ-পত্রের যুগের বৃহৎ সাংস্কৃতিক দিগন্তকেই উম্মোচিত করছে না, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের একদল সুরুচিসম্পন্ন শক্তিমান লেখক সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণার হেতুমূলকেও উদ্‌ঘাটিত করছে। আর সে কারণেই চৌধুরী মহাশয় ততটা পাঠকের লেখক নন যতটা লেখকের লেখক। তাঁর রচনার ব্যঞ্জনা, ব্যাপ্তি ও নৈপুণ্যের প্রভাবেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদল তন্নিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু করে ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত অনেক শক্তিমান ও সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকই কোনো না কোনো দিক থেকে প্রমথ-রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তারই ফলে আধুনিক সাহিত্যে বাংলা গদ্যের নব নব সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

অথচ আজকের দিনেও প্রমথ-সাহিত্য সম্পর্কে অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের নীরবতাই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। তার একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তরল উপন্যাস ও অগভীর গল্প-প্লাবিত বাংলা দেশে প্রকৃত তন্নিষ্ঠ সাহিত্য আলোচনার আবহাওয়া সৃষ্টি করা সহজ ব্যাপার নয় এবং অনেক সময় মনে হবে যে, সে-চেষ্টাই বাতুলতা; যেহেতু সাধারণ স্তিমিত-স্বভাব পাঠকের পক্ষে সাহিত্য-জিজ্ঞাসার মূলসূত্রসমূহের সন্ধান লাভের জন্যে উদ্যোগী হওয়ার দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমন খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

তবু, উৎসাহ অসীম ছিল বলেই বোধ হয় সরাসরি চলতি ভাষায় সহজ ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী প্রাণে নব ভাবাবেগ সৃষ্টির চেষ্টা তিনি করেছিলেন। শুধু সাহিত্য নয়, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান এই সব বিষয়কেই চৌধুরী মহাশয় অবলীলাক্রমে তাঁর আলোচনার বিষয়ীভূত করেছেন এবং শুধু পুরাতন প্রসঙ্গে নতুন কথাই তিনি বলেননি, অনেক নতুন বিষয়েই নতুন বক্তব্য তিনি আমাদের আলস্যমন্থর অনভ্যস্ত মনের সামনে উপস্থিত করেছেন। এদিকে নিজে পণ্ডিত হলেও তথাকথিত পণ্ডিতজনের পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁকে কখনোই পেয়ে বসেনি এবং গুরুগিরির কোনো সুযোগই কখনো গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনেকেই সাধারণত বর্তমানের চাইতে অতীতের প্রতি আকর্ষণ অধিক মাত্রায় অনুভব করে থাকেন, সমসাময়িক কালকে ঘোর কলিযুগ মনে করে তাঁরা অতীত কালের দিকেই যেন ফিরে যেতে চান। বলাই বাহুল্য, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই অতীতমুখিতা কম ক্ষেত্রেই সুস্থ শিল্পবোধের সহায়ক হতে পারে। বর্তমানকে জানবার জন্যে অতীতকেও জানতে হবে বটে কিন্তু বর্তমানকে এড়াবার জন্যে অতীতকে আঁকড়ে থাকার মারাত্মক প্রচেষ্টাকে যে কোনোক্রমেই সমর্থন করা চলে না এ সত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীই বোধ হয় সমসাময়িক সাহিত্য-পাঠককে প্রথম স্পষ্ট করে দেখালেন। সবুজ-পত্রের যুগেও আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার লোকের অভাব ঘটেনি এবং এই বিরোধী দলে সুপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমান ও শক্তিশালী লেখকের সংখ্যাও বড়ো কম ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সেকালে প্রমথ চৌধুরী একাই তাঁর শাণিত যুক্তিবাদের সাহায্যে বিরুদ্ধ প্রতিকূলতাকে খণ্ডন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং আধুনিক সাহিত্যকে যোগ্য গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রবন্ধ সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংকলিত 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' নিবন্ধটি এই দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রমথ-রচনায় ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবের প্রসঙ্গ অনিবার্য রূপেই এসে পড়ে এবং এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা-বহুল স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনাও সম্ভব। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, ফরাসী সাহিত্যের এমন একটি মোহিনীশক্তি আছে যা চৌধুরী মহাশয়কে গোড়া থেকেই আকর্ষণ করতে

পেয়েছিল এবং খুব সম্ভব সে শক্তির মূলে ছিল স্পষ্টবাদিতা। "ফরাসী সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম। আমি পূর্বে বলেছি যে, ফরাসী সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্ট দুই-ই আছে। ফরাসী মনের এই প্রসাদ-গুণপ্রিয়তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসী লেখকরাই দিতে পারেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চাতেও ফরাসী পণ্ডিতদের সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না" ('ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' : প্রবন্ধ সংগ্রহ : পৃষ্ঠা ১১৯)। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চার পরিচয় বারবার পাওয়া গিয়েছে প্রমথ-রচনায় এবং ফরাসী সাহিত্যের মতই প্রমথ-সাহিত্যেরও উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করে তোলা, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করা। "ফরাসী সাহিত্য মানুষকে দেবতা নয়, সুসভ্য করে তোলে। ফরাসী সাহিত্য সকল প্রকার মিথ্যার, সকল প্রকার কপটতার প্রবল শত্রু এবং ফরাসী-মনের এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে-সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ।" বলা বাহুল্য, অনুরূপ নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসার নানা প্রমাণ প্রমথ-সাহিত্যেও বিশেষ ভাবেই উপস্থিত।

বাংলা কথ্যভাষায় প্রথম সম্পূর্ণাঙ্গ রম্যরচনা সৃষ্টির কৃতিত্বও বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীরই প্রাপ্য। বীরবলের হালখাতার অনেক রচনাই আজ থেকে পঞ্চাশ বছর কি তার অধিক কাল আগেকার লেখা এবং সে-সব রচনায় রম্যরচনার আস্বাদ এখনকার দিনেও অনেকেই অনুভব করতে পারবেন। 'তরজমা' 'বইয়ের ব্যবসা' 'সবুজ-পত্র' 'বর্ষার কথা' 'রূপের কথা' ইত্যাদি নিবন্ধে চৌধুরী মহাশয় যে রীতির সূত্রপাত করেছিলেন কালক্রমে তারই অনুসরণে আধুনিক বাংলা গদ্যের কয়েকজন শক্তিশালী লেখক সার্থক রম্যরচনা সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। আধুনিক কালের সাহিত্য-সমালোচনা যে extensive না হয়ে বরং intensive হবে এবং তাহলেই যে সে-আলোচনা সাহিত্য-পাঠকের কাছে সহজেই বোধগম্য হবে, এই সত্যের উদ্ঘাটন প্রমথ-সাহিত্য থেকেই সম্ভবপর হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্তত একজন কৃতী গদ্যলেখক

এই দিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর সার্থক উত্তরাধিকার লাভ করেছেন, তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভঙ্গি সম্পর্কে একজন তরুণ সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, বীরবলী ভঙ্গিতে তন্নিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব নয় বলেই প্রমথ চৌধুরীর মতো মনীষীকে না কি মুখ্যত টীকাটিপ্পনীর প্রায়-সাংবাদিক জগতে আজীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর থেকে ভ্রমাত্মক উক্তি আর কিছুই হতে পারে না। 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' 'বাংলার ভবিষ্যৎ' 'রামমোহন রায়' 'চিত্রাঙ্গদা' এবং অনুরূপ আরো অনেক রচনা এ সত্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করবে যে প্রমথ-সাহিত্যে বিষয়োচিত গাম্ভীর্য, তন্নিষ্ঠা ও বৈদগ্ধ্যের অসদ্ভাব নেই এবং কথ্যভাষায় লিখিত হলেও সৎ-সাহিত্যের মূল গুণাবলী প্রমথ-রচনায়ও বর্তমান। প্রকৃত প্রস্তাবে সবুজ-পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল 'বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে' 'সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত' করা এবং এই কথাই সে-সময়ে ঘোষিত হয়েছিল যে, 'সাহিত্য গড়তে কোনো বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম।' এই আত্মসংযম ও মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় প্রমথ-রচনায় বিশেষ ভাবেই উপস্থিত এবং সাহিত্যিক অর্থে সাম্প্রতিক কালের 'আধা-সাংবাদিক রচনা' বলতে আমরা অর্ধশিক্ষিত কি অশিক্ষিত পেশাদার সাংবাদিক রচিত বর্ণহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন, আড়ষ্ট ও অগভীর যে 'খবুরে-কাগুজে' আলোচনাকে বুঝি তার সঙ্গে বীরবলী গদ্যের বা রচনা-রীতির কোনো তুলনাই চলতে পারে না। এমন কি, একটির প্রসঙ্গে অপরটির উল্লেখও বোধ হয় শুধু অবান্তর নয়, অনভিপ্রেতও বটে।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রমথ-রচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং স্বতন্ত্র সাধনার দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। তাঁর সামনে ছিল ফরাসী সাহিত্যের আদর্শ এবং বোধ হয় সে-কারণেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যে লালিত হয়েও রবীন্দ্র-প্রতিভার ঐশ্বর্যে তিনি আচ্ছন্ন হননি। বরং, ভাবতে অবাক লাগে, বীরবলী গদ্যের সাবলীলতা রবীন্দ্রনাথের মনেও অনুরণন জাগিয়েছিল এবং প্রমথনাথের গদ্যরীতি যে তাঁর চলতি গদ্যভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল এ কথার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিক বার করেছেন। ফলে, একথা স্বীকার করে নিতে বাধা নেই যে, পঞ্চাশ বছর আগের রচনা হলেও প্রমথ চৌধুরীর

অনেক লেখাই এখনকার দিনেও বারবার করে পড়ার মতো এবং যে পাঠকের উদ্যোগ-আয়োজন ইদানীং কালের সাধারণ পরিশ্রমবিমুখ উপন্যাস-পাঠকের চাইতে অন্তত কিছু পরিমাণেও বেশী, প্রমথ-সাহিত্যে তিনি এখনকার দিনেও বীরবলী ঢংএর ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরো গভীরতর কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন।

প্রমথ-সাহিত্য পাঠ করতে গিয়ে তাঁর অনবদ্য গদ্যভঙ্গি সাধারণ পাঠককে অভিভূত করে বটে কিন্তু মুস্কিল এইখানটায় যে, বিচিত্রিত গদ্যভঙ্গির আড়ালে তাঁর আসল বক্তব্য চাপা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে এবং তা যদি হয় তাহলে সেইটেই হবে সাধারণ পাঠকের দুর্ভাগ্য। কেন না, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধরাজি প্রকৃতপক্ষে বহু স্তরময় এবং বহু বিচিত্র প্রসঙ্গকে অনায়াসেই তিনি তাঁর রচনার বিষয়ীভূত করেছেন। চৌধুরী মহাশয়ের লক্ষ্য ছিল সর্বপ্রকার অন্ধ গোঁড়ামী ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি এবং সে কারণেই অজ্ঞতা, জীর্ণতা, অন্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তিনি অপ্রতিহত গতিতে লেখনী পরিচালনা করে গিয়েছেন। কেবল যে তিনি প্রাচীনপন্থীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তাই নয়, তারুণ্যের অজ্ঞতাজনিত স্পর্ধার বিরুদ্ধেও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সমন্বয় সাধনের এই প্রচেষ্টাই তাঁর প্রবন্ধাবলীকে প্রসঙ্গ ও বক্তব্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে, নানা তথ্য ও তত্ত্বে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। প্রমথ চৌধুরীর সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ মন আধুনিক ইউরোপীয় আবহাওয়ায় লালিত হলেও চিন্তা ও ভাবনার রাজ্যে তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙ্গালী, খাঁটি ভারতীয়। "দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাংলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তাতে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্যে আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য।" এই আর্টের সাধনায়ই প্রমথ চৌধুরী তাঁর সমগ্র প্রাণসত্তাকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নতুন তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এখনকার দিনে কথ্য গদ্যরীতির দুটি ধারা পাশাপাশি চলছে; একটি সিনেমা ও সাংবাদিক জগতের

অন্তঃসারশূন্য চুটকি, অপরটি শিক্ষিত মনের উপজাত সাহিত্যিক গদ্য। লেখাপড়া না শিখেও যে সহজ কায়দায় মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব, প্রথমোক্ত গদ্যভঙ্গিই তার প্রমাণ এবং যতই দুর্বল ও আড়ষ্ট হোক, খুব সামান্য শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকের সমাজে ভাব-বিনিময়ের বাহনরূপে তার উপযোগিতাকে অস্বীকার করবার দিন বোধ হয় এখনো আসেনি। অন্য দিকে, শেষোক্ত গদ্যরীতিই এখনকার দিনে সমগ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে এবং সারস্বত সমাজ ও সাহিত্য বৃত্তির মারফৎ স্থায়ী ভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু স্তরময় দিগন্তকে আলোকিত করছে। সবুজ-পত্রের যুগে প্রমথ চৌধুরী যে পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন ইতিমধ্যেই যে তা সার্থক পরিণতির পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সবুজ-পত্রের যুগে সাহিত্যের যে-সব প্রশ্ন মুখ্য হয়ে উঠেছিল এখনকার দিনে সে-সব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এমন মনে করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। প্রমথ-রচনাবলী এখনকার দিনে আবার নিবিড় ভাবে পড়লে দেখা যাবে যে আজকালকার সাহিত্য-মীমাংসা জনিত অনেক জটিল প্রশ্নের সদুত্তর তাঁর নানা নিবন্ধে ছড়িয়ে রয়েছে। ফলে, এ কথাই শেষ পর্যন্ত মানতে হয় যে, সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হলে প্রমথ রচনাবলী থেকেই শুরু করা নিরাপদ। প্রমথ-রচনা আধুনিক হয়েও ঐতিহ্যবিরোধী নয়, এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা-সাহিত্যের যে ইমারৎ গড়ে তুলেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের রচনা তারই ভিত্তিকে কালক্রমে দৃঢ়তর করেছে বলতে পারা যায়।*

---

* এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধকারের 'সময় ও সাহিত্য' গদ্যগ্রন্থের 'প্রমথ চৌধুরী' শীর্ষক পরিপূরক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-চিন্তায় ধূর্জটিপ্রসাদ

সাহিত্য-চিন্তায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তিরিশের যুগের প্রারম্ভেই প্রগতিশীল ও মৌলিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির জন্যে সতর্ক ও জিজ্ঞাসু পাঠকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং যদিও সবুজ-পত্রের যুগেই রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে তরুণ বয়সেই তিনি বাংলা সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিসম্মত সাহিত্য সমালোচনার ধারাকে পরিপুষ্ট করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তবু প্রকৃত প্রস্তাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক পত্রিকার সূচনাকাল থেকেই স্বকীয় চিন্তা ও আলোচনার বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে ধূর্জটিপ্রসাদ তৎকালীন তরুণ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক, সাহিত্যিক এবং ছাত্রসমাজকে আকর্ষণ করতে থাকেন। তাঁর সাহিত্য-চিন্তায় (এবং অন্যত্র দর্শন, সমাজবিদ্যা, সঙ্গীত, চারুকলা, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন ও বহুমুখী বিষয়-বস্তুর অবতারণায়) এমন কোনো গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও আন্তরিক মূল্যায়নের পরিচয় ছিল যার প্রভাব উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বহুলাংশে পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে এবং পরে কিছু কিছু বিদেশ পর্যটনের ফলে ইংরেজি, মার্কিন ও য়ুরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে এদেশের সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায়। অল্প যে ক'জন বাঙালী লেখক এই যোগাযোগকে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর স্থাপন করতে সচেষ্ট হন ধূর্জটিপ্রসাদ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

সবুজ-পত্রের যুগে ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যচিন্তার প্রাথমিক উন্মেষ, একথার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। বস্তুত সে-সময়ে প্রমথ চৌধুরীর পরিচালনায় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রতীচ্যের যুদ্ধ-প্রভাবিত চিন্তাধারার সংস্পর্শে নতুন করে নবজাগরণের চাঞ্চল্য দেখা যেতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালীর মানসজীবনের প্রচণ্ড আলোড়নকে বিন্যস্ত ও কেন্দ্রানুগ করবার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯১৪ সালে সবুজ-পত্র

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনাবলীর ঐশ্বর্যে দীপ্যমান হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই ঘটনার কিছুকাল আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উল্লেখযোগ্য বিদেশ-যাত্রার একটি পর্যায় সমাপ্ত করেন এবং সমকালীন প্রতীচ্য ভাবধারার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটায় রচনার মধ্যেও ক্রমশ সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিকাশলাভ ঘটতে থাকে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারায় ঐক্যসাধনের যে-প্রয়াস রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও আলোচনায় ক্রমশই স্পষ্টতা লাভ করতে থাকে সবুজ-পত্র তারই ক্ষেত্রকে ক্রমশ বিস্তৃত করার দায়িত্ব নিয়েছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সবুজ-পত্রকে ঘিরে শিক্ষিত বাঙালীর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে নব-জাগৃতি নানা দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য এবং স্বাভাবিক ও সঙ্গত ভাবেই তরুণ ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্য-জীবনে এই নবজাগৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। মধুসূদনের সমসাময়িক কালে প্রতীচ্যের চিন্তাধারার সংঘর্ষে বাঙালীর নব-জাগৃতির প্রথম উন্মেষ এবং সিপাহীযুদ্ধের পরবর্তীকালে বাঙালীর জাতীয় মানসে সৃজনী প্রতিভার যে বিপুল প্রসার লাভ ঘটে মধুসূদনের কবিতায়, দীনবন্ধুর নাটকে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার ইতিহাস বিধৃত। সাহিত্যচিন্তার মূলধারা তদবধি নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে অভিজ্ঞান ও প্রত্যয়ের অনেক প্রান্তর অতিক্রম করে রবিপ্রতিভার সঞ্জীবনী স্পর্শে সমৃদ্ধতর ও সর্বতোমুখী হবার সুযোগ পেয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে প্রধানত রাজনৈতিক আন্দোলনের সংঘাতে বাঙালীর নব-জাগৃতির দ্বিতীয় পর্যায় আকারলাভ করেছিল। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেনের দেশাত্মবোধক গান এবং অন্যদিকে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ প্রমুখের ওজস্বী বক্তৃতামালা এই নবজাগৃতির উন্মেষকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে সমগ্র বাঙালী সমাজ সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছে। বাঙালীর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা যে সময়ে পূর্ণতা লাভ করেছে সে-সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতেও নব-নব জ্ঞানলব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচনশক্তির চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। এই পটভূমিকায় সবুজ-পত্রের প্রকাশ সঙ্গতভাবেই শিক্ষিত বাঙালী সমাজকে নাড়া দিয়েছিল। সুতরাং যাঁরা সবুজ-পত্রকে শুধু মাত্র কথ্যভাষা প্রবর্তন আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবেই গ্রহণ করে থাকেন তাঁরা ভ্রান্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে সবুজ-পত্র

বাঙালীর তৎকালীন সামগ্রিক নবজাগৃতিকেই প্রকাশ করতে তৎপর হওয়ায় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের বিশিষ্ট ভূমিকার কৃতিত্ব সে-পত্রিকার প্রাপ্য। এই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে তরুণ ধূর্জটিপ্রসাদ যে গোড়া থেকেই সৎ-সাহিত্যের আদর্শ এবং এ যুগের বিবেকবান লেখক সম্প্রদায়ের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন এরূপ অনুমান করা যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক জগতে ধূর্জটিপ্রসাদের সক্রিয়তা জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯২২ সনে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পদ গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকে হিসেব করলে দেখা যাবে প্রায় আটত্রিশ বছরকাল বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাভাবনার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই অনুপাতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নানা রচনার পরিমাণ তাঁর স্বল্প। নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর অনেক রচনা অবশ্য এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে তবেই ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্য চিন্তার প্রকৃত রূপটি স্পষ্টতর হতে পারে।

প্রমথ চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে ধূর্জটিপ্রসাদ খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কয়েকটি গুণের অধিকারী হয়েছেন। যেমন: (১) সাহিত্যচিন্তা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে উদারনৈতিক মনোভাবের প্রাধান্য দেওয়া। (২) ভাব-প্রবণতার পরিবর্তে হৃদয়-মনন-জাত উপলব্ধির ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা। (৩) বিশ্বসাহিত্যের গুণাবলী নিরূপণ করবার চেষ্টা করা। (৪) কথ্য-ভাষাকেই সব রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার বাহনরূপে স্বীকৃতি দেওয়া। (৫) পরস্পরবিরোধী মতামতের সংঘর্ষ থেকে আত্মরক্ষা করে সাহিত্য আলোচনাকে কেন্দ্রানুগ ও বিষয়কেন্দ্রিক করা। এবং সর্বশেষ (৬) নিজের কোনো মতামতকে অপরের স্কন্ধে জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া।

উল্লিখিত বিষয়গুলি মনে রাখলে ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা সহজতর হবে। এবং সম্ভবত হেনরী জেমস-এর মতো *

* "Art lives upon discussion, upon experiment, upon curiosity, upon variety of attempt, upon the exchange of views and the comparison of standpoints, and there is a presumption that those times when no one has anything particular to say about it, and has no reason to give for practice or preference, though they may be times of honour, are not times of development—are times possibly, even a little of dulness…" *Henry James.*

তিনিও মনে করতেন যে-কোনো ক্রমবর্ধমান কিংবা দ্রুতপরিবর্তনশীল যুগে শিল্পের আলোচনা, ঐ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মতামতজ্ঞাপনের সার্থকতার মধ্যেই সে-সময়ের প্রাণশক্তির প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। সুতরাং সমকালীন সাহিত্যচিন্তায় তাঁর উৎসাহের অভাব কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সম্পর্কে নানা আলোচনায় যেমন তাঁর উৎসাহ তেমনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে হাল-আমলের বিমল মিত্র, অমিয়ভূষণ মজুমদার পর্যন্ত তাঁর সন্দেহাতীত মনোযোগ আকর্ষণ করে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মানসলোকের এই সক্রিয়তাই তাঁর প্রতি উত্তরকালের লেখক ও পাঠকের শ্রদ্ধা নিবেদনের অন্যতম কারণ।

ধূর্জটিপ্রসাদ শুধুমাত্র সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন না, সৃজনীসাহিত্যেও তাঁর অবদান যুগোপযোগী স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। এবং যেমন সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তেমনি উপন্যাসরচনার ক্ষেত্রেও তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সজাগ পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়নি। কর্মজীবনে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকলেও অধ্যাপকসুলভ গতানুগতিকতা, বাগাড়ম্বর ও চর্বিতচর্বণ তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির প্রাণময়তাকে কখনো বিনষ্ট করেনি। শুধু ভাষায় নয় বক্তব্যের দিক থেকেও ধূর্জটিপ্রসাদের রচনা নিবিড় উপলব্ধির পরিচায়ক এবং কি উপন্যাস রচনায়, কি প্রবন্ধ প্রস্তাবে সর্বত্রই অন্যান্য অভিজ্ঞতার ও তথ্যনিষ্ঠার প্রভূত উপকরণ তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন। তাঁর প্রবন্ধাদি বিভিন্ন ও বিচিত্রমুখী, পক্ষান্তরে তাঁর রচিত উপন্যাসও বুদ্ধিবৃত্তির লীলায় পরিশুদ্ধ। অর্থাৎ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে রসকে তিনি বুদ্ধির সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধের জগতে বেঁধেছেন এবং সমকালীন সমাজের নর-নারীর স্থূল ও বিকৃত অনুভবের বিষয়কে প্রধান উপজীব্য না করে সত্যানুসন্ধান ও তথ্যানুগ বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে সমগ্রভাবে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে মননশীলতার প্রাধান্য। তাঁর সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্তত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং হয়তো আরো কেউ কেউ এই মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাস ('অন্তঃশীলা' 'আবর্ত' ও 'মোহানা') বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সার্থক দৃষ্টান্ত। নিছক

হৃদয়াবেগ-সর্বস্ব নয়, হৃদয়মননজাত উপলব্ধিতেই এই রচনাবলী বিকীর্ণ। বাইরের রচনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতের তীব্রতায় এই তিনখণ্ডে সমাপ্য উপন্যাস কোথাও তেমন উদ্বেল নয়। উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাসের মাধ্যমে চরিত্রচিত্রণের যে চিরাচরিত পদ্ধতি অধিকাংশ লেখকের অবলম্বন ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস-শিল্প সে-পথে অনুগমন করেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে য়ুরোপীয়, মার্কিন ও ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাব শিক্ষিত বাঙালী লেখককে প্রভাবিত করে। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা তখন অব্যাহত এবং এমনকি সকল লেখকের শীর্ষে। কিন্তু জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণতর বাঙালী লেখকগোষ্ঠী উপন্যাসচিন্তার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে, 'কল্লোল' 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি' প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকাগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণতর লেখকেরা একসময়ে বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছেই ভিন্নতর অনুপ্রেরণার জন্যে তাকিয়েছিলেন। ফলে একই সময়ে গর্কি, হামসুন, জোলা, হাক্সলী, লরেন্স, জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, ফ্লবার্ট, টমাস মান, জিদ্ এবং নিশ্চয় আরো অনেকেই তরুণ বাঙালী লেখকগোষ্ঠীর অন্তরচেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল। যেমন, কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে তেমনি উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ না করে ভিন্নতর প্রকৃতির উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ অনিবার্য হতে দেখা যায়। এই প্রভাব সর্বদা শুভ না হলেও কোনো কোনো দিক থেকে উপন্যাসের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছে। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসরচনার সার্থকতাও এই দিক থেকেই বিচার্য। উপন্যাসে মগ্নচৈতন্যের উপলব্ধিই প্রকৃতপ্রস্তাবে ধূর্জটিপ্রসাদের আশু লক্ষ্য এবং বহিরাশ্রয়ের সর্বাঙ্গীণ অবলম্বন না নিয়ে অন্তর্মুখী বুদ্ধি ও মননের অভিব্যক্তিতেই তাঁর উৎসাহ সমধিক। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে গত কুড়ি বছরের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ প্রবর্তিত উপন্যাসরচনার ধারাকে আর কেউ তেমন সমৃদ্ধ না করলেও এক বিশেষ যুগের উপন্যাস-আন্দোলনে এই মননপ্রধান উপন্যাস শিল্পের উদ্যোগ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। 'অন্তঃশীলা'র আলোচনা প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন : "কাহিনীতে ঘটনাবৈচিত্র্য নেই, অবস্থান পরিকল্পনা কোনো অব্যর্থ পরিণতির ধার ধারে না, একটি সুচিন্তিত প্লটকে সর্বাঙ্গীণভাবে ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্যই নয়, তিনি চান দুটি চরিত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধি দেখাতে। অর্থাৎ, নভেলের সংজ্ঞা সম্বন্ধে

ধূর্জটিপ্রসাদ আঁদ্রে মারোয়ার সঙ্গে একমত, তাঁরা দুজনেই ভাবেন যে সাবেকীদৃষ্টান্তে কতকগুলা ছাঁচে-ঢালা প্রতিমার পুতুলনাচে জীবনের অনুকরণ ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, তার কর্তব্য পাত্রপাত্রীর বিবর্তনের ছবি আঁকা।" কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই তুলনা শুধুমাত্র উপন্যাসের আঙ্গিকগত সাদৃশ্যেই নিহিত এবং উত্তরকালে রোজার গারদি, আঁদ্রে মারোয়ার জীবনাদর্শ ও উপন্যাসচিন্তায় যে দোষগুলি আবিষ্কার করেছেন (লিটারেচর অব দি গ্রেভইয়ার্ড: রোজার গারদি) বাঙালী পাঠকের সৌভাগ্যক্রমে ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে তার প্রতিচ্ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় না। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসের দু'টি মূল চরিত্র খগেনবাবু ও রমলা দেবী। এই দুটি চরিত্র পরিমার্জিত শিক্ষা ও শিল্পবুদ্ধির প্রতীক। অনেক প্রসঙ্গের আলোচনায়, সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ক প্রকরণের অবতারণায় উপন্যাসের মূল বক্তব্য ভারাক্রান্ত হলেও চরিত্রচিত্রণের সজীবতা অব্যাহত। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা ভারতবর্ষের বাইরের সংস্কৃতি জগতের খবর রাখে, বিদেশী লেখকদের রচনার আলোচনা করে, শুধুমাত্র শরৎচন্দ্রীয় মৌতাতের মধু পরিবেশন করাই তাদের একমাত্র কাজ নয়—ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে এই বিষয় বোধহয় এই প্রথম সার্থকতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত হলো। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিজীবী হলেও বুদ্ধিসর্বস্ব নন এবং য়ুরোপী নানা সাহিত্যের আবহাওয়ায় সযত্নে লালিত হয়েও তার মেধা ও মনন ভারতীয় চিত্তশুদ্ধির অধিকতর অনুবর্তী। আর সম্ভবত সে-কারণেই ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসচিন্তায় সঙ্গতি ও সৃজনশীলতার প্রাধান্য; তিরিশের যুগের কোনো কোনো তরুণ বাঙালী লেখকের মতো বিদেশী মনোভাবের হুবহু বাঙালীকরণ তাঁর বিবেকে বেধেছে। "অর্জিত বিদ্যায় তিনি যদিও বৈদেশিক, তবু তাঁর প্রবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বিশুদ্ধ, এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বটে, কিন্তু তিনি যে স্বভাবতই বিশ্লেষণ বুদ্ধির অনুর্বরমার্গের প্রতিকূল তার ভূরি প্রমাণ 'অন্তঃশীলার' প্রতি পৃষ্ঠায় বর্তমান।" সুধীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যও পাঠকের মনোযোগের অপেক্ষা রাখে।

সমালোচনা ও শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রেও ধূর্জটিপ্রসাদ বিরল অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনের এরূপ কম ক্ষেত্রই আছে যেখানে তাঁর সদাসক্রিয় মন বিচরণ করেনি। এবং মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্য-প্রবন্ধের

গুরুগম্ভীর উপক্রমণিকা এবং পরাক্রমশালী উদ্যোগ তাঁর রচনায় না থাকলেও মতামতের ক্ষেত্রে সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর মার্জিত রসিকতা আয়ত্বাধীন ছিল বলেই সম্ভবত তাঁর বহুমুখী চিন্তাধারায় আকর্ষণীয় অনুরণনের অভাব ছিল না। যদিও অধ্যাপনার কাজে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরে, প্রবাসেই দীর্ঘকাল তাঁকে থাকতে হয়েছে তথাপি তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি-জগতের একটি বিশিষ্ট অংশ বরাবরই সঞ্জীবিত ছিল। কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে, ঢাকায়, চট্টগ্রামে—বাংলাদেশের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংস্কৃতিকেন্দ্র-গুলির সঙ্গে তাঁর মানসলোকের যোগাযোগ একপ্রকার অব্যাহত ছিল এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা ঘটনা সম্পর্কে তাঁর মতামতজ্ঞাপনে তাঁকে কখনো ক্লান্ত হতে দেখা যায়নি। মনের এই সক্রিয়তা এখনকার অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বাঙালী লেখকের নির্জীব ভূমিকার পটভূমিকায় বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। অনেক ক্ষেত্রে যদিও সমগ্রভাবে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যের পথ নানা তথ্যের অবতারণায় সমস্যাসঙ্কুল এবং সাধারণ পাঠকশ্রেণীর সহজ উপলব্ধির অন্তরায় তবু তাঁর প্রায় প্রতি রচনায়ই অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মন্তব্য সচেতন পাঠককে ভাবায় এবং অভিভূত করে। সজাগ পাঠক প্রায়ই চমকিত হন এই ধরনের মন্তব্য শুনে এবং সমালোচকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। নীচের দৃষ্টান্তসমূহ উদাহরণত উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) "সাধারণত, নির্বাচনের দুই দিক ও প্রক্রিয়া আছে। যাঁরা গল্পের শেষ পর্যন্ত গোড়ায় কল্পনা করে লেখেন তাঁদের পক্ষে অবান্তরের পরিত্যাগ খুব কঠিন নয়। তাঁদের রীতিতে শক্ত কাজ শুরু হয় তারপর, অর্থাৎ ঘটনার যাথার্থ্য ও তাৎপর্যকে পরিষ্কার করা থেকে। এর সার্থকতা নির্ভর করে ভাষার কৃতিত্বে ও বুদ্ধিবিচারের পরিমাণের উপর। আরেক ধরনের সাহিত্যিক আছেন যাঁদের আনন্দ গল্পের নিজের খেয়ালে অর্থাৎ গতিতে। এঁদের বেলা পরিত্যাগটা গৌণ, ভাষার দক্ষতা ও গতির মোড় ফেরাবার বুদ্ধিটাই মুখ্য।"

(২) "শ্রদ্ধা সুস্থ মনের কাজ, পবিত্র মনের ব্যবহার। শ্রদ্ধা অর্থে বিনয়। বিষয়-বস্তুকে যখন নিজের সম্পত্তি ভাবা যায় তখন ওঠে ভক্তি, আর যখন তাকে ব্যক্তিসম্পর্করহিত হিসেবে দেখা হয় তখনই জন্মায় শ্রদ্ধার সূচনা। আত্মনিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে বহু সাধনার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ও

আর্টিষ্ট সশ্রদ্ধভাবে বিষয়বস্তুর সাধনা করেন। বৈজ্ঞানিক যখন পরমাণু কি জীবাণুর রূপ দেখেন তখন তিনি হৃদয়াবেগ সংযত করেন: চিত্রকর ও কবি সুন্দরী স্ত্রী দেখে কিংবা কল্পনা করে পাগল হন না। তাঁরা গঠনকে, কল্পিত রূপকে পৃথকভাবে জানতে চান প্রথমে, এবং জানবার পর গঠন ও রূপের নিয়মানুসারে তাদের ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের কীর্তির কি রূপ, কি গঠন, কি নিয়ম ছিল জানাটাই শ্রদ্ধা, এবং সেই জ্ঞানের প্রকাশই জন্মতিথি উপলক্ষে সভাসমিতির উপযোগী বক্তৃতা।..."

(৩) "এখন আমাদের কর্তব্য কি? কর্তব্যটা হলো ভক্তিকে শ্রদ্ধায় পরিণত করা। জন-সাধারণের মনোভাব যা লক্ষ্য করলাম তাতে কর্তব্য-সাধন সহজ হবে না মনে হয়। আমাদের মন এখন ফাঁকা, এবং কাব্যালোচনা দিয়ে সে বিশাল ফাঁক ভরান যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতেই হবে।...আমাদের দেশে একাধিক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, বিশ্বভারতী, সাহিত্য-পরিষদ, রবীন্দ্র-চক্র প্রভৃতি। তাছাড়া মাসিক পত্রিকাও বেরুচ্ছে বিস্তর। অধ্যাপকের দলও কম নয়। এখন যদি রবীন্দ্র-সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ অঙ্গবিচারের ভার বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত করা যায় তবে বিচারের সুবিধা ঘটে।—বিশ্বভারতীতে কিছু কাজ চলছে দেখছি। কিন্তু কোথাও যেন প্ল্যানের অভাব আছে।...বড় বড় কাগজের সম্পাদকরাও প্ল্যান করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচারে সাহায্য করতে সহজেই পারেন। অধ্যাপকবৃন্দের কাছে বিশেষ প্রত্যাশা করি না। সাহিত্যের ডিগ্রী সাহিত্য-বিচারের অন্তরায়। তা ছাড়া, অধ্যাপকরা বড়ই ব্যক্তিতান্ত্রিক ও বিশেষত এই দেশে যেখানে সকলে মিলে রিসার্চ করার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে টাকা উঠছে, যদিও নিতান্ত মন্থর গতিতে। যদি কোনো কালে পঁচিশ লাখ টাকা ওঠে তবে যেন অন্ততঃ দশ লাখ টাকা রিসার্চ ও প্রচারের জন্য রাখা হয়।..."

উল্লিখিত উদ্ধৃতি তিনটির প্রথমটি প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত প্রবন্ধ থেকে ('রূপ ও রীতি' মাসিক পত্রে ১৩৪৮ সনে প্রকাশিত) এবং পরবর্তী দুটি উদ্ধৃতি 'রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব' প্রবন্ধ থেকে (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ সন) পরিবেশিত। ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যচিন্তায় নিছক মন্তব্যই যে শেষ কথা নয়, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিও যে তাঁর প্রবন্ধ ও আলোচনায় অব্যাহত

ছিল তার স্বপক্ষে কিছু কিছু প্রমাণ আশাকরি উদ্ধৃতিগুলোতে প্রচ্ছন্ন। সবুজ-পত্রের পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাঙালী বুদ্ধিজীবী লেখকরা সমকালীন সাহিত্যে নতুন স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তি এনেছিলেন। সঙ্গতরূপেই সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীল চিন্তাধারায় সজীবতা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কিছু কিছু বিভ্রান্তি দেখা যায়। সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যগুলোর সঙ্গে সমকালীন ঘটনার মূল্যগুলোকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব প্রকট হয়। একদিকে বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা অন্যদিকে স্বদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের নবতর ও চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোড়ন—এরূপ অবস্থায় লেখক ও শিল্পীদের অনেকে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। সুখের বিষয়, এই ক্ষয়কারী আবহাওয়ার মধ্যেও অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমুখ লেখক বাংলা সংস্কৃতির সূত্র উদ্ধারের কাজে অবিচলিত থাকতে পেরেছিলেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালের বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখাও তৎকালীন আলীগড় নিবাসী ধূর্জটিপ্রসাদের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। সাহিত্য-চিন্তায় একালেও তাঁর পরিমার্জিত বুদ্ধির দীপ্তি বিচ্ছুরিত। কয়েক বছর আগে 'ক্রসরোড' পত্রিকায় সংশয়াচ্ছন্ন বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, অনেক পাঠকের মনে থাকতে পারে। এই প্রবন্ধটিতে একজন বিবেকবান বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ থেকে নীচে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

(১) "কালচারের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলা, বিশেষ করে আড্ডার মারফৎ, অর্থাৎ বৈঠকী আলোচনা আর বন্ধু-বান্ধবদের ঘরোয়া আসরের প্রাণখোলা গাল-গল্পের মারফৎ।—রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল বসুর সভায়, 'পরিচয়ে'র বৈঠকে, 'ভারতী' আর 'কল্লোলে'র দৈনিক আসরে ও অসাহিত্যিক ভদ্রলোকদের বৈঠকখানায় কথোপকথনের যে শিল্পসুলভ কৌশল প্রচলিত ছিল আজ আর তার দেখা মেলা ভার।…"

(২) "সাহিত্য ক্ষেত্রে আমি ভয়ানক অবস্থা দেখলাম। সাহিত্যের প্রতি গভীর উৎকণ্ঠা কেটে গেছে। এবার সর্বত্র একটা বৈরাগ্য দেখলাম। এমন কি সাহিত্যজগৎ সম্পর্কেও কেউ চিন্তিত নয়। বন্ধুরা কেবল কতকগুলো

বইয়ের কথা বললো আর নির্বিচারে তাদের প্রশংসা করলো যা আমার কাছে নিতান্তই অদ্ভুত ঠেকেছে।...”

(৩) “গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এইগুলি আমি পড়েছি। উপন্যাসগুলোর কোনো আকৃতি নেই, কবিতাগুলি বিষয়বস্তুহীন, আর প্রবন্ধ ব্যক্তিগত হওয়ার ফলে, মনের কোনো হদিসই নেই, যদিও লেখার কায়দা সত্যি অপূর্ব। যে বই, কয়েক বছর আগে, লোকে রেলভ্রমণের শেষে তাচ্ছিল্যভরে ফেলে দিত, সেই বইয়ের আজ কেবল কয়েকটি সংস্করণই হয়েছে তাই নয়, সে সম্পর্কে সাধারণ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই হয়নি। উপন্যাসগুলোর আকার সেগুলির গুণগত দৈন্যের ক্ষতিপূরণ করছে। নামকরা লেখকেরা কেবল পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। তাদের মনের ভেতরকার অতি দুরন্ত রোমাণ্টিকতা পূতিগন্ধময় হয়ে দেখা দিয়েছে। ছোটগল্পগুলির, মনে হয়, যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোটগল্পের বিষয়বস্তু যদিও আজও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর যারা তাদের দারিদ্র্যের যুক্তিবাদের সম্মুখীন হতে অনিচ্ছুক ট্র্যাজেডি-কেন্দ্রিক।...”

কিন্তু সেই সঙ্গে সংস্কৃতির সংশয়াচ্ছন্ন আকাশে ধূর্জটিপ্রসাদ আশার রৌপ্যরেখারও সন্ধানে সচেষ্ট। চিত্রশিল্পে সমৃদ্ধিশালী উপকরণ (অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও যামিনী রায়কে মনে রেখে) তাঁর নজর এড়ায়নি এবং সে-কারণেই তিনি বলতে পেরেছেন যে ‘সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরের চেয়েও যামিনী রায়ের চিত্রশালায় অনেক শান্তি।’ পক্ষান্তরে বাংলার নারীজাতিকেই দারুণ দুর্দিনেও তাঁর কাছে একমাত্র আশার আলো বলে মনে হয়েছে। তাঁর বিবেচনায় এই তরুণীরা একেবারে নতুন জাতের, তারা দৃঢ়ভাবে হাঁটে যা তাদের মা-রা কোনদিন পারত না। তারা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলে এবং বাংলা সংস্কৃতির জ্ঞানের ক্ষুধাটা তাদের উপরে বর্তেছে। বলাবাহুল্য, ধূর্জটিপ্রসাদের সমস্ত মন্তব্যই সর্বদা গ্রহণযোগ্য কিনা সন্দেহ। অনেক সময় তাঁর মন্তব্যে নিছক বাকচাতুর্যের পরিচয় পাওয়াও সম্ভব। তৎসত্ত্বেও তাঁর মনের জগতের সদাসক্রিয় অনুভূতিগুলোর সুপরিচ্ছন্ন প্রকাশ পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা উদ্রেকের সহায়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবন্ধ বা বক্তব্যগুলোতে কোনো সর্ববাদী সিদ্ধান্তের দিকে পাঠকমনকে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করাটাই বরাবর তাঁর অনভিপ্রেত এবং প্রধানত বুদ্ধিদীপ্ত অসাধারণ অভিজ্ঞতার আলোকপাতে বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের খুঁটিনাটিগুলো সচেতন ও শিক্ষিত

পাঠকসমাজের সামনে উপস্থিত করে দিয়েই তিনি সন্তোষলাভ করতেন। ফলে, তাঁর রচিত প্রবন্ধ পাঠের কৌতূহল সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকতো এবং বিষয়বস্তু যাই হোক ধূর্জটিপ্রসাদের একদল অনুরাগীকে বরাবরই তার রচনাদির অনুশীলনে তৎপর দেখা যেতো। জীবনের শেষের দিকেও তিনি যে চিন্তার জগতে জীবিত ছিলেন তার অসামান্য নিদর্শন 'মনে এলো' পর্যায়ের ছোট ছোট অথচ পরিশ্রুত চিন্তার অনুবর্তী গদ্য রচনাসমূহ। ধূর্জটিপ্রসাদের রচনা-বলীর উপযুক্ত মূল্যায়নের সময় বোধহয় এখনও আসেনি। তাঁর সমস্ত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলো সাময়িক পত্রসমূহ থেকে উদ্ধার করে পুস্তকাকারে যদি কখনো প্রকাশিত হয় তখন এই কাজ তেমন দুরূহ বিবেচিত হবে না। পরবর্তীকালের ছাত্র ও সাহিত্যিকেরা তখন তাঁর সম্বন্ধে আরোও গভীর ও তথ্যানুগ মূল্যায়নে উৎসাহী হতে পারবেন। উপস্থিত এইটুকু বলা যেতে পারে যে প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাবলীর নব-মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা এখনকার দিনে সৎপাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন এবং যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে উদ্যোগী হবেন সাধুবাদ তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য।

একালের সমালোচনা সাহিত্য

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে অদ্যাবধি অনেক নবীন সমালোচক রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত সমালোচনার ধারাটি মোটামুটি ভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী, একথা বোধ হয় স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। সমসাময়িক কালের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক পত্র-পত্রিকা পাঠান্তে এ সিদ্ধান্তই অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী সমালোচনার যে আধুনিক রীতির পরিবর্তন সাধন করে গিয়েছেন, তার প্রভাব শুধু যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে নতুনত্ব এনেছে তাই নয়, রসিক-জনকেও নতুন কালের নতুনতর তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে রস-বিচারের নানা সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে, এই অতি আধুনিক-কালের নব্য সমালোচক প্রাচীন আলঙ্কারিক ও শাস্ত্রকারদের রসসূত্রের ব্যাখ্যাকেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় মনে করে চর্বিতচর্বণের মাধ্যমে ইতিকর্তব্য সমাধা করার প্রয়াস পান না, যথাসম্ভব নিজের দৃষ্টিভঙ্গিজনিত নতুন মন্তব্য প্রয়োগেরও অবকাশ খোঁজেন। সমালোচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য যে, পাঠকমনে সৌন্দর্যবোধের সঞ্চার করা, এটা রবীন্দ্রনাথই বিশেষ ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন ও আধুনিক কালের পণ্ডিতদের রচনাবলী থেকে ঘন-ঘন উদ্ধৃতি উপস্থিত করে সমালোচনায় নামলে তা হবে মল্লযুদ্ধের নামান্তর মাত্র, তাতে সাধারণ পাঠককে বিস্মিত করাও সহজ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আলোচনায় কোথাও প্রাণের গভীর স্পর্শ পাওয়া সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। প্রাচীন কালের আলঙ্কারিকদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন অনেকখানি কিন্তু নিছক সে কালের সাহিত্য-মীমাংসার সূত্রগুলোর দ্বারা আগে থেকেই দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন হতে দিলে যে, প্রকৃত সমালোচনা সম্ভব হয় না একথা তিনি অনেক ক্ষেত্রেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ বিচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-মীমাংসার পূর্বপ্রচলিত সংজ্ঞাগুলোকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়েছেন এবং সরাসরি মূল রচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নব নব তথ্য উদ্‌ঘাটনের ভিত্তিতে আধুনিক

সমালোচনার নতুন সুষ্ঠু আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। সৎসমালোচনা যে নিছক পাণ্ডিত্য প্রকাশের ভূমিকা মাত্র নয়, সৃজনী সাহিত্যের মতোই তা যে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হতে পারে রবীন্দ্রনাথই সেটা তাঁর অপূর্ব সমালোচনাগুলোর মারফৎ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনা-পদ্ধতি আরও ঘরোয়া ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় রয়েছে সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি। প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে ফরাসী দেশসুলভ লঘুচপল ব্যঙ্গপ্রিয়তা। তাঁর আলোচনায় গুরুগিরির আভাস নেই; উচ্চ সিংহাসনে বসে নীচের আসনে উপবিষ্ট একদল লোককে উপদেশ বিতরণের মতোও মুখভঙ্গি তিনি কখনোই করেন নি; সমালোচক হলেও তিনি পাঠক সম্প্রদায়ের সামনে এসেছেন বন্ধুর বেশে; পাঠকের সঙ্গে কথা বলেছেন সেই ভাবে যে ভাবে বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেন। প্রমথ চৌধুরীর আলোচনা কোনো ক্ষেত্রেই অযথা বাগাড়ম্বরময় নয়, কোনো দিকেই অনাবশ্যক বিস্ফারিত নয়; অল্প কথায় যথাযথ ভাবে বক্তব্যকে উপস্থিত করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন বলেই তাঁর কৃত সমালোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যবহুল, অনেক সময় মার্জিত রসিকতার রেশ তাতে থাকলেও সে রচনায় সঞ্জীবনীশক্তির প্রভাব বড়ো অল্প নয়। গুরুগম্ভীর বিষয়ে লিখতে বসে গুরুগম্ভীর ভাষার আশ্রয় না নিয়েও যে সুষ্ঠু ও পরিণত সমালোচনার প্রকাশ সম্ভব হতে পারে, প্রমথ চৌধুরীই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন যে, প্রমথ চৌধুরীর অনেক রচনাই আসলে সমালোচনা নয়, আলোচনা মাত্র; তাঁর বক্তব্যও অনেক স্থলে কথার কথা মাত্র। একথা একেবারে অস্বীকার করবার উপায় নেই; অনেক স্থলেই চৌধুরী মহাশয়ের সমালোচনার বৈঠকী ভঙ্গিটাই সাধারণ পাঠকের ভালো লেগেছে, কথাবার্তার মেজাজটাই যেন অভিভূত করেছে অত্যধিক, কিন্তু মূল বক্তব্য যে পাঠকমনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে এরূপ সিদ্ধান্ত সর্বদা যুক্তিযুক্ত মনে হবে কি না সন্দেহ! কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রমথ চৌধুরীর অনেক উল্লেখযোগ্য রচনা লেখা হয়েছিল এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে—১৩২০ সালে কিংবা তারও বেশ কয়েক বছর পূর্বে। চলিত কথ্য ভাষায় সাহিত্যচর্চার আন্দোলন তখন নতুন করে শুরু হয়েছে; কথ্যভাষার সম্পূর্ণতা তখন আশা করা সম্ভব ছিল

না বলেই তাঁর রচনায়ও সর্বত্র শব্দের ওজন এবং জোর সর্বদা প্রকাশলাভের সুযোগ পায়নি। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় পঞ্চাশ বছর আগেই প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, কথ্যভাষায় সৃজনী-সাহিত্য তো বটেই, ধর্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনাও অনায়াসে সম্ভব হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ও অপ্রতিহত দীর্ঘকালীন সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকে সাধুভাষার সাহায্যেই বাংলাসমালোচনার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছিলেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অতুলনীয় রচনাগুলো এখন থেকে অর্ধশতাব্দী কালেরও অধিক আগে লেখা হয়েছে অথচ এই বইয়ে রবীন্দ্র-সমালোচনার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বর্তমান। এই বইয়ে বাণভট্টের কাদম্বরীচিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সমালোচনা শুধু যে রবীন্দ্র-সমালোচনা পদ্ধতির গুণগত দিকটাকেই পাঠক সমাজের চোখের সামনে উন্মোচিত করেছে তাই-ই নয়; সমালোচনার ক্ষেত্রেও যে সাধু ভাষায় গদ্যকাব্যের প্রাণসঞ্চার করা অসম্ভব নয়, সেটাও রবীন্দ্রনাথই প্রমাণ করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যেমন সৃজনী-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কথ্যভাষাকেই একমাত্র বাহন করে তুলেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনায় চাপা রসিকতা, মার্জিত রহস্যপ্রিয়তার অসদ্ভাব নেই; আর সেই সঙ্গে এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে মনন-সাধনার আশ্চর্য ফসল। কিন্তু তবু তাঁর সমালোচনায় কোথায় যেন একটা সমগ্রতার, সম্পূর্ণতার অভাব শেষ পর্যন্ত অনুভব করা যেতো, এখানে সেখানে একটি কি দুটি পংক্তিতে অথবা একটি কি দুটি স্তবকে তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন যার তুলনা আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে বিরল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত সমালোচনার ধারার সঙ্গে তুলনা করলে এটাই মনে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় গদ্যভঙ্গি তাঁর সমালোচনা-সাহিত্যে যে সমগ্রতা এনেছে প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনায় তা অনুপস্থিত। কিন্তু তা হলেও এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবিসংবাদী নেতৃত্ব শুধু বাংলা সমালোচনাতেই নবীন কালের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যায় নি, অনেক নবীন সাহিত্যিকের সমালোচনা-পদ্ধতিকেও প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর 'হালখাতা'র অনেক প্রবন্ধই যে আধুনিক কালের

অনেক নবীন লেখককে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দিক থেকেই তিনি আধুনিকতার গুরু।

সবুজ-পত্রের আবহাওয়ায় লালিত যে দু-জন কৃতি সাহিত্যসমালোচকের নামের উল্লেখ প্রথমেই অনিবার্য তাঁরা অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এঁদের কেউই স্ফীতকায় গ্রন্থাদি লিখে পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেননি। প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত সমালোচনা-পদ্ধতির ঘরোয়া ভঙ্গিটি উভয়েই গ্রহণ করেছেন এবং উভয়েরই ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য বিস্ময়কর। ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্য চিন্তা সম্পর্কে এই গ্রন্থে স্বতন্ত্র নিবন্ধ রয়েছে কিন্তু অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনারও যে প্রয়োজন ছিল একথার উল্লেখ অনিবার্য। অতুলচন্দ্র গুপ্ত দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে রসবাদী ও ঐতিহ্য সন্ধানী হলেও আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি আধুনিককালের লেখক সম্প্রদায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সংবেদনশীল মনের বিচরণক্ষেত্র ছিল বাস্তবিক বিস্ময়কর। যে কোনো বিষয়েই উৎসাহী হওয়া, বিশ্লেষণ করা তাঁর ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত, লেখায় এবং আলাপ আলোচনায় আধুনিক কালের সাহিত্যের সমস্যাগুলো সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ও বিশ্লেষণ একালের তরুণ লেখক সম্প্রদায়কে সঠিক পথ নির্দেশে সাহায্য করেছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরূপ সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তি খুব বেশী দেখা যায় না।

আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন ব্যক্তিরও অভাব নেই যাঁরা সমালোচনা-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধারাটির অনুগমন অধিকতর রুচিকর মনে করে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক কালের সাহিত্যসেবীদের সমালোচনার পদ্ধতি এ যুগেও যে অনেকের রচনাশক্তির শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সহায়ক হতে পারে, তা এই প্রাচীনপন্থী সমালোচকদের কেউ কেউ সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত মোহিতলাল মজুমদারকে এই রক্ষণশীল সমালোচকগোষ্ঠীর পুরোধা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মোহিতলাল আধুনিক কালের সমালোচক হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে ছিলেন খাঁটি বঙ্কিমপন্থী, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনতিকাল পরবর্তী গদ্যলেখকদের কাছ থেকেই তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। কথ্যভাষায় সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টাকে তিনি কখনোই

প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচনা গ্রন্থগুলো তিনি লিখেছেন বিশুদ্ধ সাধুভাষায়ই। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শনকেই মোহিতলাল আদর্শ বলে মেনে নিয়েছিলেন অনেক দিক থেকে। বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিমের কাল এবং ইংরেজি সাহিত্যে অষ্টাদশ ও নবম শতক (জনসন-ড্রাইডেন কোলরিজ-আরনল্ড ও ওয়াল্টার প্যাটার) তাঁর মনকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করেছিল এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের দিকপাল জনসনের মতো মোহিতলালও ধ্রুপদী (classical) লেখকের আদর্শে আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্বলতা এইখানটায় যে, তিনি মোটেই পরমতসহিষ্ণু ছিলেন না এবং যে উদার মনোভাব প্রকৃত সুষ্ঠু সমালোচনার সহায় তা তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' এবং 'সাহিত্য কথা' পড়বার পর একথাই মনে হবে যে, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অনুরাগ ছিল আন্তরিক,—ধ্রুব আদর্শ অনুযায়ী সমসাময়িক কালের সাহিত্য-সমালোচনাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন ও পরিশ্রমের ত্রুটি তিনি করেন নি,—দেশী ও বিদেশী গ্রন্থপাঠ জনিত অধ্যবসায় তাঁর বক্তব্যকে অনেক স্থলেই সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা পাঠক মনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ যে হয়নি এর একটি প্রধান কারণ এই যে, তাঁর প্রচেষ্টা কোথাও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন মেটায়নি, বরং রক্ষণশীলতার বিশেষ একটি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণকেই যেন উন্মোচিত করে এসেছে। আর সে কারণেই মোহিতলালের রচনাবলীতে 'Some admirable critical appreciations' থাকলেও সেই সঙ্গে এই সব সমালোচনার 'Incompleteness and occasionally glaring Insensibilities' (স্যামুয়েল জনসনের 'দি লাইভস্ অব পোয়েটস্' সম্পর্কে একজন সমালোচক এ কথার উল্লেখ করেছিলেন) অনেক সজাগ পাঠকেরই নজরে পড়বে, বলা বাহুল্য।

সমালোচক মোহিতলাল ষ্টাইল ও রীতির মধ্যে বরাবরই একটি মূল পার্থক্য দেখিয়ে এসেছেন। বাংলায় style-এর অর্থে 'রীতি' শব্দটির ব্যবহার তিনি সমর্থন করেননি। তাঁর অভিমত এই যে, ষ্টাইলে লেখকের ব্যক্তিত্ব লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে, কিন্তু 'রীতি' বস্তুটি প্রকৃতপ্রস্তাবে লেখকের একটি ভঙ্গিমাত্র। অতএব প্রমথ চৌধুরী কথ্যভাষায় যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন

মোহিতলাল তার ভেতর ষ্টাইলের প্রকাশ খুঁজে পাননি। খুঁজে পেয়েছেন 'রীতি' মাত্র—যাকে তিনি অভিহিত করেছেন একটা অতিশয় প্রকট বচন-ভঙ্গিমা বলে। তাঁর মতে 'রীতি যেমন ভাষার বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব মাত্র, তেমনই তাহা লেখকের আন্তর-অনুভূতির গভীরতা ও মৌলিকতার পরিপন্থী। …অনেক লেখক ভাষার নবত্ব সম্পাদনের জন্য নানাবিধ কৌশল করিয়া থাকেন। ভিতরের ভাববস্তুর কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না বলিয়াই ভাষার এইরূপ ভঙ্গিমাই তাঁহাদের একমাত্র কৃতিত্ব। এইরূপ রচনাভঙ্গি বা ভঙ্গিমা-যুক্ত ভাষায় যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে তাহা খাঁটি ষ্টাইলের লক্ষণ নয়—তাহা অতিশয় Superficial idiosyncracy—সে যেন ভাষার মধ্যে লেখকের নিজ নামের মুদ্রাচিহ্ন' (সাহিত্য কথা—২১৬ পৃষ্ঠা)। কিন্তু ষ্টাইল ও রীতির মধ্যে এই পার্থক্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অনেকের কাছেই অহেতুক ঠেকবে। আসল কথা নিশ্চয়ই এই যে, ইংরেজিতে যাকে ষ্টাইল বলে, বাংলায় তাকেই আমরা রীতি বলে থাকি এবং রীতি কখনোই লেখার একটি বিশেষ ভঙ্গিমাত্র নয়, ষ্টাইলের মতো রীতিও প্রকৃত প্রস্তাবে লেখকের ব্যক্তি মানসকেই উন্মোচিত করে থাকে, বাক্‌-পদ্ধতি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সামঞ্জস্যেই তা সাধারণ পাঠকসমাজকে অভিভূত করে। প্রমথ চৌধুরী যে ভাবে লিখেছেন সেটা কষ্টকল্পিত ব্যাপার নয়, তাঁর মন ও মেজাজ অনুযায়ীই তিনি লিখে গিয়েছেন। তিনি জটিল সাধু ভাষায় গতানুগতিক ভাবে লিখলে সেটাই হতো তাঁর পক্ষে ব্যতিক্রম এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন সম্ভব হতো কি না সন্দেহ! শক্তিমান লেখক মাত্রেরই একটি নিজস্ব রীতি থাকে, এই রীতি নিশ্চয়ই লেখকের ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে দৃঢ়সংপৃক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এঁদের সবারই নিজস্ব রীতি রয়েছে। কোনো না কোনো দিক থেকে এঁরা পাঠকসমাজকে গভীর ভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছেন, অন্ততঃ রীতির ক্ষেত্রে এঁরা কেউ-ই রক্ষণশীল ছিলেন না।

আর এক শ্রেণীর সমালোচনাকে আমরা আখ্যা দিতে পারি পণ্ডিতি সমালোচনা পদ্ধতি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও ইংরেজি সাহিত্যে এই সব সমালোচকের দখল সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। এঁদের পাণ্ডিত্য নিশ্চয়ই স্বীকৃত। কিন্তু এঁদের সমালোচনায় এমন

কোনো নতুন উক্তি নেই, এমন কোনো অভাবিত বিশ্লেষণ নেই, যা পাঠক-মনকে নাড়া দিতে পারে। দেশ বিদেশের পণ্ডিতজনের উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁরা অবলীলাক্রমে সমালোচনার ব্যাপ্তি ঘটান বটে, কিন্তু নিজস্ব মন্তব্য প্রয়োগ তেমন নিরাপদ মনে করেন না। প্রাচ্যের ভট্টনায়ক, অভিনব গুপ্ত, ব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, পাশ্চাত্যের ভলটেয়ার, রুশো, ক্রোচে, শ' পর্যন্ত সকল দিকপালই যেন এঁদের সমালোচনার সূত্রপাতেই অবলীলাক্রমে হাজির হন। ফল এই দাঁড়ায় যে, সাধারণ পাঠক পৃথিবীর নানা সাহিত্যের কতকগুলো শ্রেষ্ঠ উদ্ধৃতির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হয়ে অভিভূত হন, সমালোচকের জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধি সম্পর্কে সজাগ হন, কিন্তু সমালোচনার মূল সূত্রটাকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। অথচ অ্যারিস্টটল, দান্তে, হোমার, ক্রোচে, বার্গস, হেগেল বা শোপেনহাওয়ারের প্রভাব আমাদের মনে যতোই গভীর হোক না কেন, সমালোচনা প্রসঙ্গে এঁদের বচন বৃত্তান্তের উল্লেখ যে সর্বদা অনিবার্য নয় এই সত্যও হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। বইয়ের ভেতরকার সাহিত্য পদার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে তার আনুসঙ্গিক নীতি অথবা অন্য কোনো তত্ত্বকথার অবতারণা যে পাঠক মনকে যথার্থ সাহিত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট করে, এ কথার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথই বহুকাল আগে করেছিলেন।

পাণ্ডিত্যের পরিবেশে সংবর্ধিত হয়েও যাঁরা সমালোচনার জগতে স্বকীয় চিন্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ও অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমালোচনা-সাহিত্যের সাম্প্রতিক অধ্যায় অবশ্য আরো বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। একেবারে আধুনিক ধরনের সমালোচনায় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর 'স্বগত' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী ভাষার গঠনপ্রণালীর দিক থেকে অনেকের কাছে কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য বিবেচিত হলেও আধুনিক কালের সমালোচনা-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিককে তিনি পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত করেছেন। 'স্বগত' বইটিতে ইঙ্গ-মার্কিন সাহিত্য এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও তিনি নানা নতুন ধরনের আলোচনা করেছেন। একদিকে পাউণ্ড, এলিয়ট, জয়েস,

ইয়েটস্‌, ভার্জিনিয়া উলফ এবং অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ, বিষ্ণু দে সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি নতুন আলোক সম্পাত করতে পেরেছেন। সুধীন্দ্রনাথ সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং তাঁর শব্দসম্ভার (vocabulary) আশ্চর্য রকমের ব্যাপক। তাছাড়া, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় সুনিবিড়। সবার ওপর তাঁর সংস্কৃত-সমৃদ্ধ মন নব্য শিক্ষিত সমাজের জলবায়ু এবং আলো বাতাসে এমন ভাবে লালিত হয়েছে যে সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা কোনো সুড়ঙ্গ পথেই প্রবেশ লাভ করে তাঁর রচনার ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারেনি। দুঃখের বিষয়, তাঁর সমালোচনার বিশিষ্ট রীতি সম্পর্কে এখনকার দিনে অনেক পাঠকই এখন পর্যন্ত তেমন সজাগ নন।

'স্বগত' বইটির অনেক প্রবন্ধ পাঠান্তে একথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে যে, সমসাময়িক পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের নিবিড় ভাবে প্রভাবিত করেছে তো বটেই, আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকেও নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের দীর্ঘকালের আচারলুপ্ত সংস্কার, অনভ্যাস ও জড়তাকে দীর্ণ করে দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার ও মনকে বিস্তৃত করার জন্যে এই ধরনের সমালোচনা সাহিত্যের যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এ সত্য স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। দৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও প্রাণবান কথ্যভাষায় যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা সম্ভব 'স্বগত' গ্রন্থপাঠে আশা করি আমার মতো আরো কেউ কেউ তা উপলব্ধি করতে পারবেন। আরো একজন গল্পলেখক কথ্যভাষায় সমালোচনা শক্তির উল্লেখযোগ্য পরিচয় দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সমালোচনা-পদ্ধতির মূলে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব রয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর রচনার নিজস্ব দীপ্তির দিকটাই সর্বাগ্রে নজরে পড়বে। অন্নদাশঙ্করের সমালোচনার বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা আশ্চর্য রকম সংক্ষিপ্ত অথচ বুদ্ধি ও সুবিবেচনার সমন্বয়ে চাপা আলোর মতো বিচ্ছুরিত।

সাম্প্রতিক সমালোচনার ক্ষেত্রে আরো কয়েকজন শক্তিমান লেখকের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের যে আধুনিক যুগ সম্পর্কে এতো কাল পাঠক সমাজের অতি অস্পষ্ট ধারণা ছিল, সে যুগের কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু ('কালের পুতুল') বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার প্রধান সহায় তাঁর

ভাবপ্রবণ ভাষা, তাছাড়া, নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগাকেই তিনি সবার উপরে স্থান দিয়ে থাকেন। তাঁর গদ্য রচনা প্রাণবান ও বেগমুখর, তাই সমালোচনায়ও তিনি কবিত্বের আমেজ আনতে পেরেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমসাময়িক আরো অনেকের মতোই রসবাদী,—কিন্তু সমালোচনায় তিনি পরমতসহিষ্ণুতার পক্ষপাতী।

বুদ্ধদেব বাবুর সমালোচনার দুর্বলতা এইখানটায় যে, একবার তিনি যে কথা যে লেখকের সম্পর্কে বলবেন, তথ্যনির্ভর বলে প্রমাণিত না হলেও সে মন্তব্য তিনি প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত থাকেন না। ফলে, মাইকেল মধুসূদনের মতো দিকপাল সম্পর্কে তিনি প্রমাদক মন্তব্য করেন, আবার আধুনিক কবি সমর সেন সম্পর্কে অত্যন্ত অতিশয়োক্তি করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে সমালোচনা সার্থক মূল্য বিচারের সমার্থক তার প্রমাণ বুদ্ধদেব বসু কৃত জীবনানন্দ দাশ, নিশিকান্ত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত আলোচনা থেকেই নির্ণয় করা সম্ভব। এদিকে বিষ্ণু দে কাব্য রচনায় বুদ্ধদেব বাবুর সমকালীন হলেও নিছক রসবাদীর দৃষ্টি নিয়ে শিল্পকর্মকে বিচার করতে নারাজ। তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' তাই সমসাময়িক সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় সাহিত্য-বিচারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাকে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত করেছে। কিন্তু আবু সঈয়দ আয়ুবের মতো বিষ্ণু বাবুও সম্ভবতঃ সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য সম্পর্কে দুটি বিভিন্ন অভিমতের পক্ষপাতী। আয়ুব সাহেব সমাজ বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত শিল্প ও সাহিত্যের প্রয়োগমূল্য বা উপকরণ মূল্যের দাবি স্বীকার করেও আনন্দানুভূতি ও শ্রেণী নিরপেক্ষ প্রতিমানের ভিত্তিতে সাহিত্যের চরম মূল্য সন্ধানের পক্ষপাতী। সাহিত্য যখন শ্রেণী সংগ্রাম বা বিপ্লবের হাতিয়ার রূপে কাজ করতে থাকে, তখন তার উপকরণ মূল্যটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। আবার সাহিত্য যেহেতু ব্যক্তিমানস ও ব্যক্তিচৈতন্যের বিকাশ ঘটায়, মানবাত্মার স্বাধিকারবোধকে ঘোষণা করে, আনন্দসংবেদন বৃত্তিকে বিকশিত করে সেহেতু সাহিত্যের চরম মূল্য বলেও একটা বিশেষ কিছু রয়েছে বলা যেতে পারে। আয়ুব সাহেবের এই সিদ্ধান্তকেই বিষ্ণু দে যথাসম্ভব নিপুণ ব্যাখ্যা সহকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মোটের ওপর, বিষ্ণুবাবুর শ্রম-শীলতাকে শ্রদ্ধা করতে হয় এবং মার্ক্সবাদী মনীষীদের অনেকের সমালোচনার

ভিত্তিতেই এবং তাঁদের রচনাবলী থেকে নানা উদ্‌ধৃতি দিয়েই তিনি যে ভাবে আপন সিদ্ধান্তসমূহকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন তা স্থির ভাবে অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বিষ্ণু দে-র ভাষা আশানুরূপ প্রাঞ্জল নয় এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের 'স্বগত-'র গদ্য তাঁর আদর্শ হলেও সে গ্রন্থের সুসংবদ্ধ বাক্যরীতি বিষ্ণু দে-র 'রুচি ও প্রগতি' অথবা হালের 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'-এ সর্বদা দৃষ্টিগোচর হবে কি না সন্দেহ। বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দ বিশেষণরূপে বাংলা গদ্যে অনধিকার প্রবেশ করে উদ্ধত ভঙ্গিতে পাঠকের চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে, সে ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে-র গদ্য রচনার দুর্বলতা সহজেই নজরে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্যরচনার পাশাপাশি বিষ্ণু দে-র বাক্য গঠন প্রণালীকে তাই 'বিশৃঙ্খল শব্দ যোজনায় শ্রুতিকটু' মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র উদ্যোগ আয়োজন অভিনন্দিত হওয়ার যোগ্য। যেহেতু গদ্যের পৌরুষকে বজায় রেখে সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর সমলোচনার ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা তিনি সতর্কতার সঙ্গেই করে এসেছেন।

সমকালীন সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে কার্ল মার্ক্সের মূল সূত্রগুলোর ভিত্তিতে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আসছেন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায় এবং বিনয় ঘোষের নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখনই গোপাল হালদার একজন বস্তুনিষ্ঠ দূরদর্শী সমালোচক হিসেবে প্রগতিশীল পাঠক মহলের প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর গদ্য সমালোচনা সাহিত্যের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সাংবাদিক প্রগল্‌ভতা অনুপস্থিত। অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল বিষয়বস্তুকে তিনি সাবলীল অনাড়ম্বর গদ্যের মাধ্যমে উপস্থিত করতে পেরেছেন—এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' ও 'বাঙলা সংস্কৃতির রূপ' আলোচনা পদ্ধতির নবত্বের জন্যেই ভালো লাগে, একথা বোধ হয় স্বীকার করা যায়। প্রগতিশীল মহলের একজন কৃতী সমালোচক হিসেবে এই সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'সাহিত্য-বিচারে মার্ক্সবাদ' এবং সেক্সপীয়র সম্পর্কিত আলোচনা থেকে এরূপ সিদ্ধান্তই বোধ-হয় সঙ্গত যে, সমাজ জীবনের পটভূমিকায় সাহিত্যের বাস্তব ব্যাখ্যায় তিনি

যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে এখন পর্যন্ত বিরল। 'নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা'র গ্রন্থকার বিনয় ঘোষও মার্ক্সবাদী সমালোচনায় নিজস্ব চিন্তার ছাপ রাখতে পেরেছেন এবং তাঁর গদ্যভঙ্গিও জোরালো। মার্ক্সবাদী সমালোচনার যে ইস্কুল গড়ে উঠেছে, তাকে যে আর এখনকার দিনে সহসা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয় গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, বিনয় ঘোষের সমালোচনা-সাহিত্যই তার প্রমাণ। কিন্তু এই নব্য দৃষ্টিভঙ্গি-জনিত সাহিত্য সমালোচনা এখন পর্যন্ত সকল জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারেনি; কালক্রমে এই সমালোচনার পদ্ধতি বিস্তৃত ও পরিবর্ধিত হবে আশা করা যায়। তখন সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়তো অনেকটা সহজতর হবে। খুব কঠিন কিন্তু অবিসংবাদী বোধহয় সেই পথের যাত্রা এবং সে কারণেই জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে আশার কথা। সমাজজীবনের পটভূমিকায় সাহিত্যকে বিচার করার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ইদানীং কালে আরো কেউ কেউ করছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সরোজ আচার্য, অরবিন্দ পোদ্দার, নারায়ণ চৌধুরী, অচ্যুত গোস্বামী এবং শিবনারায়ণ রায়। এঁদের সমালোচনা পদ্ধতির মূল্য বিচার আলোচ্য প্রবন্ধে সম্ভব নয়, শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, এঁদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জনিত বিচারের উদ্যম আধুনিক বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে প্রকৃত বাস্তবধর্মী আলোচনার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

বাংলা কবিতার ঋতুবদল সুস্পষ্ট। ক্রমশই ধীরে ধীরে কিন্তু একরূপ অনিবার্য ভাবেই নতুন সংকেত, নতুন ব্যঞ্জনার প্রতিফলন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অনুভব করা যায়। সহজেই বোধগম্য হয়তো নয়, কিন্তু ভাষায় ও ভঙ্গিতে ক্রমশই নতুনতর এবং ভিন্নতর অভিব্যক্তির নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। পদবিন্যাসে সতর্কতা, চিত্রকল্পে নবত্ব এবং শব্দযোজনায় মোহ-প্রবণতা—বাংলা কবিতায় এই লক্ষণগুলো অনায়াসেই চিনতে পারা যায়।

পনর বছর আগেও বাংলা কবিতায় একটা অস্থির ভাব ছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় এবং যুদ্ধের পরের কয়েকটি বছর নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনায় সমগ্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে অনিশ্চয়তার তীক্ষ্ণতা আত্মপ্রকাশ করে। তখন পর্যন্ত কবিদের পক্ষে যেন আত্মস্থ হবার, সার্থক গ্রহণ ও সার্থক বর্জনে সাফল্য লাভ করবার সুযোগ ছিল না; যদিও এই সময়কার কবিতায় দেশপ্রেমের অভাব ছিল না, সমাজচিন্তার অভাব ছিল না; বরং বলা যায়, আন্তরিক উদ্যোগে আবেদনে, অভিজ্ঞতার বিস্তৃতিতে কোথাও আন্তরিকতার অনটন না থাকাই সম্ভব। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের দিকে যাত্রা বাংলা কবিতায় পরিবর্তনের কাল। স্পষ্টতই এই পরিবর্তনের একটি লক্ষণ, সমাজ-চেতনার অত্যধিক তীব্রতার হাত থেকে মুক্তি, অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আড়ালে গীতিময়তার হাতে শান্ত সমর্পণ। পঞ্চাশের প্রায় মাঝামাঝি থেকে আজ পর্যন্ত তরুণতর কবিদের কবিতায় এই শান্ত সমর্পণ ব্যাপকতা লাভ করেছে।

কিন্তু কোনো কবিকেই, বর্তমান প্রবন্ধকারের বিবেচনায়, নিছক দশকের পরিসরে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। প্রতি দশকেই একজন সর্বগুণসম্পন্ন কবি আত্মপ্রকাশ করবেন কিংবা একদল নতুন কবি নতুন কাব্যাদর্শ ও কাব্যরূপের প্রতিষ্ঠা করবেন এরকম প্রত্যাশাই বাতুলতা। একজন কবির সাধারণত অনেকটা বিস্তৃত সময় লেগে যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির

মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আবেগে, বেদনায়, ব্যর্থতায়, পুনর্জন্মের যন্ত্রণায় শক্তিমান কবিমাত্রই স্পন্দিত হন এবং দীর্ঘকালের চর্চায় ও অভিজ্ঞতায় সচেতন শিল্পচিন্তার প্রবর্তনায় ধীরে ধীরে তাঁর কবি-স্বভাব ক্রমশ পরিণত উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এবং তখনই সম্ভব হয় এক একটি আশ্চর্য কবিতা, অভিজ্ঞতায় ও আবেদনে যা চিত্তহারী। সাধারণত একজন কবি যে যুগে কাব্যরচনা শুরু করেন সেই যুগ বা দশক দিয়েই তাকে চিহ্নিত করবার রেওয়াজ দেখা যায়। কিন্তু কে না জানে কবি যদি মোটামুটি দীর্ঘজীবী হন এবং বিবেকসম্মত ভাবে সক্রিয় থাকেন তাহলে দুই তিন এমন কি চার দশকের সুবিস্তৃত ব্যবধানের মধ্যেই কাব্যজীবনের বিশেষ বিশেষ অধ্যায় কিংবা স্তরকে অতিক্রম করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, তিরিশের কবি হয়েও জীবনানন্দ দাশ চল্লিশ এবং অংশত পঞ্চাশ দশকেরও অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় কবি এবং তিন দশকের নিরবচ্ছিন্ন সাধারণ পটভূমিকায়ই সমগ্রভাবে তাঁর শিল্পচেতনা এবং কবিত্বশক্তি সার্থক।

প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষমতাসম্পন্ন কবিমাত্রেই সর্বদা কাব্যলব্ধ অভিজ্ঞতার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উপনীত হচ্ছেন ; কোনো একটি বিশেষ সময়ে বা স্তরে সেই কবির কোন একটি বিশেষ অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করা যায় মাত্র, কিন্তু সেইটেই কোন কবির একমাত্র পরিচয় বলে প্রচার করলে ভুল করা হবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় চল্লিশের যুগে 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সুভাষের কাব্য-জীবনে সেটা একটি পর্যায় বা স্তর মাত্র। পরবর্তীকালে নতুন সুর পাওয়া গেল 'মিছিলের মুখ' কবিতায় এবং এই তো সেদিন পঞ্চাশের যুগে 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত' কবিতায় উচ্চারিত হলো নতুন ধ্বনি, প্রকাশ পেল নবতর ব্যঞ্জনা। সুভাষের সমগ্র কাব্য জীবনের উপর উভয় দশকের প্রভাবই লক্ষণীয়। তাই সুভাষকে মূলত চল্লিশ দশকের কবিরূপে চিহ্নিত করলেও তাঁর কাব্যসাধনার একটি বৃহৎ অংশ পঞ্চাশ ষাট দশক পর্যন্ত বিস্তৃত।

গত দশ বছর ধরে বাংলা কবিতা যে পরিবর্তনের সূচনা করছে এখনকার দিনের কোনো বিশেষ দল বা কবিগোষ্ঠীর আচরণের মধ্যেই তার অঙ্কুর খুঁজতে যাওয়া হাস্যকর এবং যে ব্যক্তি আধুনিক কবিতার কোনো একটি ভঙ্গি বা বাকচাতুর্যকেই উৎকৃষ্ট কবিতার লক্ষণ রূপে গ্রহণ করবেন তিনি নিঃসন্দেহেই

ভ্রান্ত। অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট কবিতা কি বস্তু যদিও সচরাচর তার ব্যাখ্যা অল্প কথায় সম্ভবপর নয় তথাপি যুগ-যুগাশ্রিত কাব্যপাঠের মধ্য দিয়েই যে প্রকৃষ্ট কবিতা সম্পর্কে একটি ধারণা সম্ভবপর সেকথা কোলরিজ তাঁর সমসাময়িক কালে ঘোষণা করলেও অদ্যাবধি সে উক্তির গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। কবিতাকে একদা মিলটন অভিহিত করেছিলেন 'A flow of the soul' বলে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর যুগে বললেন: 'emotions recollected in tranquility': ভিক্টোরীয় যুগে আর্নল্ডের ভাষায় a criticism of life; কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের কালে টি. এস. এলিয়ট মন্তব্য করলেন: 'কবিতাকে শুধু দুর্ভোগের মধ্যেই পাওয়া যাবে না, পরন্তু কাব্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে একমাত্র দুর্ভোগের মধ্যে থেকেই।' "Poetry not only must be found only in suffering but can find its materials only in suffering." এলিয়ট আরো একটি কথা বললেন সেটিও উল্লেখ্য: 'কবিকে একই সঙ্গে কদর্যতা ও সৌন্দর্যের রূপকে উপলব্ধি করতে হবে, পঙ্কিলতা, ভয়াবহতা এবং উজ্জ্বলতা সবই তাঁর দৃষ্টিপথে থাকা দরকার।' তাঁর প্রথম গদ্য সমালোচনা-গ্রন্থ, The Sacred Wood-এ এক জায়গায় লিখেছেন: "Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. But, of course, only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things." তাই এলিয়টের কবিতায় সেই চিরাচরিত আবেগ নেই কাব্য পাঠক যে ধরনের আবেগের অনুভবে দীর্ঘকালের কাব্যপাঠের মধ্য দিয়ে অভ্যস্ত এবং পাঠকও আন্তরিকভাবেই অনুভব করেন যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্‌ কি টেনিসনকে আবেগের যে সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করে এসেছি এলিয়টের কাব্য বিচারে তা একেবারেই অচল। কিন্তু আধুনিক কাব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এখানেই থেমে নেই। ফেবার বুক অব মডার্ণ ভার্স (মেজাজে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইয়েটস্‌ সম্পাদিত অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ণ ভার্স-এর সঙ্গে পার্থক্য বিস্তর) সম্পাদনাকালে মাইকেল রবার্টস তাঁর সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখলেন: "Poetry may be intended to amuse, or to ridicule, or to produce an effect which we feel to be more valuable than amusement and different from instruction;

but primarily poetry is an exploration of the possibilities of language." অর্থাৎ, রবার্টসের বিবেচনায় ঝোঁকটা মূলত ভাষাগত অন্বেষণের।

উপরের দু-টি অনুচ্ছেদে কবিতার প্রকৃতি প্রসঙ্গে যাঁদের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো তাঁরা সবাই প্রধানত কবি। সুতরাং কবিদের মধ্যে কবিতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মতামতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা যে অনেক সময় দুরূহ ব্যাপার তা সন্নিবেশিত এই মন্তব্যগুলো থেকে মোটামুটি অনুমান করা যায়। কিন্তু একটি বিষয়ে বোধ হয় সকল কবি-সমালোচকই একমত: কবিমাত্রেই মানব অভিজ্ঞতার লিপিকার এবং এই অভিজ্ঞতা সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে এবং একটি স্থিরীকৃত কাব্যদর্শনের পটভূমিকায় এই অলোক-সামান্য অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ কবিতার সৃষ্টি সম্ভবপর করে তোলে।

২

আধুনিক বাংলা কবিতায় গত দশ বছরের ইতিহাসে আশা করবার মতো, আনন্দিত হবার মতো অনেক নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে এসত্য হৃদয়ঙ্গম করবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে সাম্প্রতিক কবিতার সীমাবদ্ধতাও কাব্যপাঠকের নজরে পড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু কিছু কিছু বিচ্যুতি সত্ত্বেও ক্রমপরিবর্তনশীল এই দশকের বাংলা কবিতায় জীবনের লক্ষণ সুস্পষ্ট। তরুণতর কবিদের উদ্যম ছাড়াও তিরিশের এবং চল্লিশের কয়েকজন কবিও এখন পর্যন্ত বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল। একদিকে অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র মতো প্রবীণ কবির নতুন রচনায় যেমন আশ্বস্ত হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই চল্লিশের যুগের কবিগোষ্ঠীর কয়েকজন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, রাম বসু এবং আরো কয়েকজন তাঁদের নব নব রচনার ঐশ্বর্যে বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। পক্ষান্তরে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, আলোক সরকার, শোভন সোম, মানস রায় চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো বেশ কিছু সংখ্যক অতি তরুণ কবি সমগ্রভাবে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রবহমান ঐতিহ্যের পটভূমিকায় নিজেদের মেলাতে পেরেছেন বলতে

পারা যায়। এই তরুণ কবিদের কেউই এখন পর্যন্ত কাব্যরচনার জগতে এমন কোন সামগ্রিক একক সাফল্য অর্জন করেন নি অন্যদের তুলনায় যাকে উচ্চ পর্যায়ের বলা যেতে পারে। কিন্তু এঁরা সকলেই বিভিন্ন দিক থেকে কাব্য-অবয়বের পুষ্টি সাধনে সচেষ্ট। কেউ বিষয়ে, কেউ ভঙ্গিতে, কেউ বা অন্তর্নিহিত দার্শনিক ব্যাখ্যায় নতুন কোনো বক্তব্য উপস্থিত করবার চেষ্টায় আছেন। সবচেয়ে উল্লেখ্য দু-চার জন ছাড়া তরুণতর কবিদের, প্রায় সকলেই ফিরে গিয়েছেন সেই ছন্দ-মিলের জগতে আধুনিক বাংলা কবিতার সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশ যেখানে উজ্জ্বল শোভায় ও বর্ণমহিমায় দ্যুতিমান। প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে অরুণ মিত্র এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় বোধ হয় ব্যতিক্রম। ছন্দে ও মিলে ঈর্ষাযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও গদ্যকাব্যের জগতেই এঁরা অন্তত সম্প্রতি নতুন পর্যায়ের কবি-কল্পনার যোগ্যতর অভিব্যক্তির গূঢ়তর অনুসন্ধানকার্যে ব্যাপৃত আছেন।

কিন্তু অন্যান্য কবিদের, বলতে গেলে, ছন্দ মিলের জগতেই পদচারণা অব্যাহত। বিষয়ে, বর্ণনায়, উপলব্ধিতে আধুনিক সমস্ত কবিতাই এক ধরনের নয়, কিন্তু কাব্যচেতনাকে সবাই ছন্দে মিলে লালন করছেন। এইদিক থেকে মনে হবে একালের কবিতা অন্তত অঙ্গসজ্জায় বাংলা কবিতার দীর্ঘকালের প্রবহমান ঐতিহ্যের অনুগামী হালফ্যাসানের বায়ুতাড়িত বস্তুপিণ্ড মাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'গলা ফুলিয়ে আজগুবি হবার' সাধনায় আধুনিককালের কবিতার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত এ অভিযোগ আধুনিক কাব্য সম্পর্কে সমগ্রভাবে প্রযোজ্য নয়। গত দশকের বাংলা কবিতাও এই সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য।

গত কয়েক বছরের বাংলা কবিতায় বক্তব্য এবং বহিরঙ্গ এই উভয় দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। কাব্যরচনায় সর্বতোমুখী উদ্যোগের লক্ষণ পরিস্ফুট এবং চতুর্দশপদী, গীতি কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, কাহিনীকাব্য, কাব্যনাট্য ইত্যাদি নানা বিষয়েই সাম্প্রতিককালের রচনায় আধুনিক কবির শিল্প-চাতুর্যের কিছু কিছু নমুনা উপস্থিত। এবং যে-পাঠকের সদিচ্ছা আন্তরিক, সাম্প্রতিক কবিতায় পরিতৃপ্ত হবার মতো বস্তু তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, প্রায় সর্বদেশে সর্বকালেই পাঠকের শিক্ষা ও রুচির উপর কবিতার আবেদনের বিস্তৃতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে

এলিয়ট কাব্যপাঠের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা এই দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।[১] তাঁর বিবেচনায় কবিতা আলোচনার অর্থই হলো কাব্যপাঠকের অভিজ্ঞতার পরিসরকে বিস্তৃততর করা এবং একমাত্র কাব্যরসাস্বাদনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভালো কবিতা এবং খারাপ কবিতার পার্থক্য নির্ধারিত হওয়া সম্ভব। 'At the first stage we find out what poetry is by reading it and enjoying some of what we read ; at a larger stage our perception of the resemblances and differences between what we read for the first time and what we have already enjoyed itself contributes to our enjoyment ; এবং একজন বিচক্ষণ সমালোচকের এই কথাগুলো মনে রেখেই সাম্প্রতিক কাব্যের আলোচনায় উৎসাহী হওয়া শোভন। কবিতা কী বস্তু তা নিরন্তর কবিতা-পাঠের মধ্য দিয়েই জানা যেতে পারে। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ কবিতায় গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে কাব্যপাঠকের মনে কবিতা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি সহজাত ধারণার সক্রিয়তা অপরিহার্য।

সাম্প্রতিককালের কবিতায় অন্তত দুটি লক্ষণ সুস্পষ্ট। এক ধরনের কবিতা সুস্থ জীবনবোধের অনুরাগী, জীবনানুগ সচেতন শিল্পপ্রত্যয়ে সমৃদ্ধ। কিন্তু আরো এক ধরনের কবিতাও রয়েছে যেক্ষেত্রে কাব্যকলার কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে ; শিল্পের সমগ্রতা সেক্ষেত্রে উপস্থিত কিনা সন্দেহ। এই উভয় শ্রেণীর কবিতাই এখনকার দিনের কাব্যপাঠকের চোখে পড়বে, একটু ব্যাপকভাবেই চোখে পড়া সম্ভব। একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট কবিকৃতির পক্ষে সুস্থ জীবনবোধের অনুরণনই যথেষ্ট নয়, কাব্যকলার অন্যান্য দিকের অঙ্গীকারও অত্যাবশ্যক ; অন্যদিকে তেমনই একমাত্র শিল্পচাতুর্যই সৎকবিতার অবলম্বন ভেবে নিয়ে কোনো কবি পূর্ণাবয়ব শিল্পসৃষ্টির অধিকার অর্জন করলেন বলা যায় না। এ সম্পর্কে এমন কি আরো অগ্রসর হয়ে বলা যায়, এলিয়টের 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল

১. "The experience of poetry, as it develops in the conscious and mature person, is not merely the sum of the experiences of good poems. Education in poetry requires an organisation of these experiences."
T. S. Eliot. : The Use of Poetry & The Use of Criticism.

১৯২২ সালে, কিন্তু তাঁর 'ফোর কোয়ার্টেট'-এর রসাস্বাদনের জন্যে কাব্য-পাঠককে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এবং বলা বাহুল্য, সমগ্রভাবে এলিয়টের কবিকৃতির অনুধাবন কার্যে এই উভয় কাব্যগ্রন্থের আলোচনা অপরিহার্য। বাংলা কবিতায়ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনেক। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' অনেক সময়ের ব্যবধানে রচিত এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে, এই উভয় কাব্যগ্রন্থের আন্তরিক পর্যালোচনা বাঞ্ছনীয়।

এখনকার কবিতায় অভ্যাসগত কাব্যচর্চার নিদর্শন অনেক। কিন্তু তারই পাশাপাশি ক্রমপরিণতিশীল কবিমনের পরিচয়ও অনেকের রচনায় উপস্থিত। প্রসঙ্গের বিস্তৃতিতে, দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে, রূপক ও চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্যে অনেক কবিতাই চিত্তগ্রাহী। অগ্রজ কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র প্রভৃতির কবিতা পরিণত বয়সের মানসিক দীপ্তির আলোকে উদ্ভাসিত এবং জীবন-দর্শনের দিক থেকে গভীরতাসন্ধানী। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক কবিতা যেমন একাকীত্বের বিষণ্ণতায় গভীর তেমনি অরুণ মিত্রের কবিতাও আর সেই পূর্ব যুগের তীব্রকণ্ঠ নয়, ভিন্নতর দিক থেকে তিনিও সম্প্রতি কবিতাকে হৃদয়ের স্থূল আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করে গভীরে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় সাম্প্রতিককালের চেষ্টাকৃত কারিগরি অনুপস্থিত। বরং বলতে পারা যায়, শব্দবিন্যাসের আপাতরম্যতাকে অতিক্রম করে তাঁর কবিতার নিরাভরণ বিষণ্ণ সুর কাব্যপাঠকের অন্তর চেতনাকে স্পর্শ করে।

তোমার মুখের ছবি ম্লান, তুমি নির্বাক এমন!
স্বপ্নে দেখি, কেঁদে ওঠে মন।
কোথায় তোমার সেই উজ্জ্বল আলাপ
সত্যি কি বধির হয়ে গেছ, বলো কার অভিশাপ!
সে কি শুধু প্রত্যাখ্যানে তুমি আর সেই তুমি নও!
কও, কথা কও
মনের অতলে যেন শুনি তার ধ্বনি,
বরেণ্য রমণী

বলো, স্বপ্ন মিছে সব ভুল।
আমার বাগানে আজ প্রতীক্ষিত বসন্তের ফুল।

('আহ্বান')

এবং অন্যত্র অরুণ মিত্রের কবিতায়:

সূর্য-আঁকা দরজাটা হেলে পড়ে,
আমি নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হই।
তুলসীতলায় পিদ্দিম সমুদ্রের হাওয়ায় নিবে আছে
রূপকথা জড়িয়ে লাউমাচার আঁধার
কল্লোলের কোন্ গহীনে নেমে গেছে।
এক কণ্ঠস্বরের আলো
এই উঠোন থেকে সরু পথ ধরে
আমাকে বহুদূরের বিস্তারে নিয়ে গিয়েছিল।
তখন সন্ধের দোকানবাজার মিটেছে,
লোকজন সওদা নামিয়ে স'রে গেছে,
নানান্ বেসাতি এখানে ওখানে ছায়া হয়ে রইল,
আমি চললাম মোহনায়।
অবশেষে পথ ফুরোল আর আমি বিপুল হৃদয়ের
ধ্বনির ভিতরে চোখ বুজলাম।
এই আমার চেনা জায়গা, চেনা সময়,
শান্তির আদিগন্ত রাত নিয়ে আকাশ।
আমার মার আঁচলে কত তারা, কত তারা।

(নিভৃত : অরুণ মিত্র)

উদ্ধৃত দুটো কবিতায় একটি জিনিস স্পষ্ট। দুটি কবিতাই গভীরতাসন্ধানী; কিন্তু অলঙ্কারবাহুল্য বর্জনে সচেষ্ট। পংক্তিবিন্যাসে এমন একটি গভীর শুদ্ধাচারী আবেগ বিস্তৃত যা পাঠকমনকে আকর্ষণ করে। মনে হয়, দু দুটো যুদ্ধের ক্ষত ও আর্তনাদের পর বাংলা কবিতার পাঠকও যেন এই নির্মল অন্তর্বেগবতী আবেগ সঞ্চারণের প্রতীক্ষায় ছিল এবং এই পরিশুদ্ধ আবেগের

অনুরণনেই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার একটি বৃহৎ অংশ এখন পর্যন্ত স্পন্দিত। অরুণ ভট্টাচার্য, চিত্ত ঘোষ, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানস রায় চৌধুরীর কবিতাবলী প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। পক্ষান্তরে, অন্য এক ধরনের কবিতায় কবির সমাজসত্তার সচেতনতা তীক্ষ্ণতরভাবে ক্রিয়াশীল। খুব উচ্চকণ্ঠ না হয়েও এই ধরনের কবিতা যুগোপযোগী সমাজচিন্তায় সমৃদ্ধ এবং বৃহত্তর আবেদনে বিকীর্ণ; মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল প্রমুখের কবিতায় এই সমাজসচেতন আবেদনের ব্যাপকতা লক্ষণীয়। যুগযন্ত্রণা কখনোই কাব্যের বিষয় হবে না এবং ব্যক্তির চৈতন্য বৃহত্তর সমাজচেতনায় লীন হলে চলবে না, কবিসমাজ ও কাব্যপাঠকের একাংশের এই দাবি হাস্যকর। সম্ভবত যুদ্ধকালীন কবিতার আপৎকালীন ক্ষতচিহ্নের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এখনকার দিনের কবিতার তীব্র অন্তর্মুখিনতার বিস্তৃতি। কবিসত্তা ও সমাজসত্তার সার্থক সমীকরণে পঞ্চাশের যুগের অনেক কবিতাই তাৎপর্যময় এবং সেই সঙ্গে প্রসঙ্গ ও উপকরণে বিশিষ্ট।

আমি মধ্যশতকের দুর্ভাগ্য প্রেমিক। যাকে চাই
যদিও বা পাই তাকে হলঘরের অস্বস্তি কেবল
মনে লেগে থাকে। শুধু ভীড় ক্লান্তি, স্নায়ুর লড়াই
দুঃস্বপ্নের হিজিবিজি। এখানে যে অন্দর মহল
মেলেনা এখনো। তাই প্রেম আজো অন্ধকারে-ডোবা
মহেঞ্জোদাবোর লিপি : ভাষা তার অপঠিত, বোবা॥
('ভাষা তার বোবা' : মণীন্দ্র রায়)

এবং মুখের ভাষার অনুবর্তী এই কাব্যভাষায় সমকালীন জীবনবোধের দীপ্তি উন্মোচিত। সমাজসত্তার এই পরিণত বিকাশ কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়েছে :

অথচ হাজার পাতা ঝ'রেও যেহেতু
থেকে যায় কয়েকটি মুকুল,
জন্মের মাটিতে তাই বারেবারে ফিরে আসে বীজ।

আমি তার কেন্দ্রে বসে দেখেছি কী করে
আলোকে সে মাথা তোলে, অন্ধকারে মূল।

(আগুন নিয়ে খেলা : মণীন্দ্র রায়)

এখন পৃথিবী লাল করমচার দৃষ্টি নিয়ে শরীরের রক্ত আর পুঁজ
ক্ষরণের যন্ত্রণায় অর্দ্ধেক উন্মাদ। তার নষ্ট সন্তানেরা
জননীর হাতে লাথি মেরে থুথু ছিটিয়ে আনন্দ
অনুভব করতে চায়! এখন আকাশ নদী গাছ পাখী ফুল ভয়ঙ্কর
নরকের মুখোমুখি অসহায় শতাব্দীর মত হৃৎপিণ্ডের পিপাসা
জুড়াতে গলায় ফাঁস দিতে চায়, মৃত্যুর চাকার
নীচে পিষে যেতে চায়।

(মানুষের মুখ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বৃষ্টির জল তোমাকে অবিরল ধুইয়ে দিয়ে গেল
পৃথিবী কাঁদল না একটুও।
বৃষ্টির জল কোন চিহ্ন রাখল না
ছাই হল তোমার ননীর মতো শরীর ;
তোমার চোখের সামনে
মৃত্যুর শীতল চাদর তোমার পরিচিত মুখ
ঢেকে দিল। পৃথিবী কাঁদল না একটুও।

(কৃষ্ণ ধর)

খানিকটা ছায়ার মধ্যে গা ডুবিয়ে গাছের গোড়ায়
ঘুমিয়েছিলাম আমি।
ছাতি-ফাটা ভীষণ তেষ্টায় জেগে দেখি
শিকড়ে কালচে ছোপ
বিকেলের ঝর্ণা ছিল নিকটেই। তার
পাড়ে বসে আঁচলা ভরে জল নিতে গিয়ে মনে হল
ঝর্ণাটা রক্তের আগাগোড়া

আকাশের কাছে চলে গেছে
ঝলসানো মোরোগ ফুল জলের কিনারে।
('আমার ক্ষতের মুখ' : রাম বসু)

সুতরাং যে-সব কবি বা কাব্যপাঠক মনে করেন আধুনিককাব্যে সমাজ-বোধের উপযোগিতা এখন আর তেমন নেই তাঁদের ধারণা সঙ্গত বলা যায় না। বরং বলা যেতে পারে অদম্য জীবনমুখিতার যথার্থ কাব্যরূপ বর্তমানে অধিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পেরেছে। ভাবানুষঙ্গে, শব্দের সুচারু বিন্যাসে, চিত্রকল্পে শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে। চল্লিশের অন্তত কয়েকজন কবির শিল্পোত্তীর্ণ সুস্থ মানসিকতার সাক্ষ্য পঞ্চাশের যুগে লিখিত তাঁদের কবিতাবলীর মধ্যে সাম্প্রতিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-অভিজ্ঞতার ভিন্নতর উপস্থাপনে নিঃসংশয়ে চিত্তাকর্ষক।

অনায়াসে কেউ-কেউ আশ্বিনের অম্লান আভায়
মগ্ন হতে পারে। তারা যদি
অষ্টবসু হত, তবে যেত ফের স্বর্গরাজ্যে ফিরে
অক্লেশে। কেননা তারা লোভ, রক্ত, ঘৃণা,
হিংসার উপরে উঠে হতে পারে রোদ্দুরের নদী।
এখানে উল্লেখযোগ্য, আমি তা পারি না।
বস্তুত যেহেতু আমি দেবব্রত নই, সুতরাং
দীর্ঘকাল আমি এই অন্ধকারে আছি।
মনুষ্যপ্রতিম কিন্তু বিকলাঙ্গ, অগণন মুণ্ডহীন মাছি
যেখানে রক্তের স্রোতে ডুবেছে তিমিরে।
মনে হয় ভুলে গিয়ে ফুল, পাখি, পরিচিত বন্ধুদের নাম
আরো কিছুকাল এই অন্ধকারে থেকে যেতে হবে।
('তারার তিমিরে' : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এবং উদ্বেগের হাত থেকে, অন্ধকারের মুঠি থেকে এ যুগের কবির যেন উদ্ধার নেই ; কিংবা খুব সম্ভব অন্ধকারের, উদ্বেগের অধিকতর সীমানাবর্তী হয়েই আলোর গোপন, নিভৃত আকাঙ্ক্ষাকে লালন করতে হবে। ছন্দে বাঁধা কিংবা

আরোপিত আশাবাদে এখনকার কবি বোধ হয় উদ্বুদ্ধ নন; বরং কবি আর্ত, বিয়োগান্ত দৃশ্যের নায়ক এবং দুঃখে সুখে নবজন্মের চেতনায় উন্মুখ।

গত দশ বছরের বাংলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য কি স্মরণীয় পংক্তির অভাব নেই। দীর্ঘ কবিতায় দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে, একালের কবিতায় বৈশিষ্ট্য দেখা না গেলেও অনেক পরিমিত পরিসরে লিখিত সার্থক ছোট ছোট কবিতার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। তির্যক ব্যঞ্জনায়, মুহূর্তের স্মরণযোগ্য উপলব্ধিতে, ভাষা-বিন্যাসের রম্যতায় এবং প্রকাশভঙ্গির বিচ্ছুরিত লীলায় একালের অনেক কবিতাই স্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর। কবিতার বিষয়বস্তুর পরিধির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক কবিতা প্রাত্যহিক সংসারের মুখের ভাষা ও বিচিত্র ঘটনাবলীর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ভাষা বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেক কবিতা নিপুণ কারিগরির সাক্ষ্য; স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় শব্দ-চয়নে, শব্দ-মণ্ডলীর সচেতন ব্যবহারে খুব ভেবে চিন্তে অগ্রসর হবার চেষ্টাই প্রবল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রধান অবলম্বন আবেগ এবং আবেগের কাব্যকলাসম্মত সুষ্ঠু প্রকাশেই কবিতা সংহত। নিচের স্তবকগুলো উদাহরণত উল্লেখ্য :

১.

এখানেও ছিল এক নদী টলটলে
সে নদী কখন এক ডুব দিয়ে
নেমে গেল পাতালে অতলে।
তাই তো এখানে বালি, বালিয়াড়ি, বালির পাহাড়
কোথায় জলের সাড়া!
হাওয়া শুধু করে হাহাকার,
বালির গভীরে নেই ফল্গুর ইশারা!

(দিনেশ দাস)

২.

একবার আশ্বিনে আসি একবার ফাল্গুনে ফিরে যাই
আসি যাই আসি যাই মানুষের মনে না মেলায়
—একটা ছুরির মুখ বিঁধে আসে সমস্ত জীবনে
সমস্ত জীবন ভরে কৌটায় কৌটায় রক্ত কৌটায় কৌটায় রক্ত
একটা জ্বালায় শুধু রি রি করে মন

(মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

৩. পিতামহ, আমি সেই ভয়ের নিবিড় অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি আর চেয়ে দেখছি রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটিও তারা আজ।
মনে হয় আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়।

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

৪. ভালোবাসা, নিঃশব্দ দু-পায়ে যাও জানালার পাশে, জানালা যেই খোলো
সহসা দু-চোখে কাঁপে কোন দৃশ্য কেন আর্ত ? অর্পিত বিষাদ।
উঠে দাঁড়াতেই ধ্বনি—ভালোবাসা, শোনো মুখ তোলো
আতঙ্কিত আমার দুচোখ দেখো, জ্যোৎস্নার পাহাড় স্তব্ধ
নির্নিমেষ সংহত সুন্দর
প্রেতের মতন হিংস্র কাছে আসে।

(আলোক সরকার)

৫. যুবক নয়, প্রৌঢ়ও না। এমন একটা সময়
প্রেম যখন সতর্ক প্রহরী নয়
দুঃখ আর অভিভূত করেনা মনকে
যুবতীর শরীরে ফুল বা চন্দ্রের উপমা মনে পড়ে না,
তখনও আমরা অপাংক্তেয়। এ শুধু দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে।

(অরুণ ভট্টাচার্য)

৬. স্বপ্নে নয়, শিরায় শোণিতে
এসো তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ;
এসো অন্ধ সঙ্কীর্ণ গলিতে
ক্ষুব্ধ বড়ো রাস্তার সংবাদ।

(অরুণকুমার সরকার)

৭. মিছেই মানুষ বেতারে টেলিভিসনে সাংবাদিকের গোলটেবিল বৈঠকে
পরস্পরকে নিন্দা করার উজ্জ্বলতায় নিজের মুখ দেখতে চায় আলো
মিছেই মানুষ নিজের দেশের নিজের দলের গর্ব করে।
আসলে তার পায়ের নিচে কোথাও আর মাটির কোন চিহ্ন নেই
হিমালয়ের চূড়ার উর্ধ্বে নিশান হাতে ওঠার দেশ নেই
ছ-ফুট জমি মেপে নিয়ে যেখানে উপনিবেশ গড়া যায়।

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

যা কবিতা নয় তাকে বর্জন করতে হবে বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক অধ্যায়ে এই বিশ্বাস ব্যাপক। ধর্ম, হিতোপদেশ, আশাবাদ, নৈতিক জীবনের পথে উন্নতির ক্ষেত্রে যা একপ্রকার অপরিহার্য কবিতায় যেন তার প্রবেশাধিকার ক্রমশই সঙ্কুচিত। অবশ্য ভবিষ্যতের ওপর অটুট বিশ্বাস কিংবা নির্ভরতা রেখেও কিছু কবিতা লেখা হচ্ছে যা ধ্রুপদীধর্মী ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত।

তিনি একটি শিশু-তরু রোপণ করেছিলেন
বাঁচিয়েছিলেন রোদের হাত থেকে
দিয়েছিলেন জল
পিতার মত পরম স্নেহ, মাতার মত নিবিড় ভালোবাসা।
একশ' বছর পার হয়েছে তিনি এখন দেখি
দাঁড়িয়ে আছেন ছায়াশীতল বিশাল বনস্পতি
ক্লান্তিহর ব্যজন হাতে, ফুল ফলের প্রচুর সম্ভার
পিতার মত পরম স্নেহে, মাতার মত নিবিড় ভালোবাসায়।

(শোভন সোম)

কি মেঘ দেখালে নিজে মেঘের আড়ালে বসে,
নিজে তো দেখলে না তুমি মৃদুস্বভাবের দোষে ;
শিরায় শিরায় দিলে টান—
চামর দোলানো মেঘে অতসীজড়িত সুখী ;
যদি কথা বলে উঠি যদি গান গেয়ে উঠি,
ক্ষমা করো, স্থির ভগবান ॥

(অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

এখনকার দিনেও বাংলা কবিতা রোমাণ্টিক। কিন্তু কেউ যেন উনিশ শতকী ইংরেজি কবিতার লক্ষণগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার রোমাণ্টিকতার চারিত্রলক্ষণ আবিষ্কার করতে না যান; এখনকার বাংলা কবিতা রোমাণ্টিক এই কারণে যে প্রসঙ্গে ও উপকরণে তার স্বাধীনতা সীমাহীন এবং সুরের দিকে, নতুন চিত্রকল্প রচনায় তার নতুন করে পক্ষপাত। বদ্‌লেয়র প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন : 'রোমাণ্টিকদের কবিতা ছিলো কবিত্ব-মণ্ডিত রচনা, যার কোনো কোনো পংক্তি বা অংশ কবিতা হলেও অনেক অংশই কবিতা নয়, কিন্তু বদ্‌লেয়র কবিতা বলতে বুঝলেন এমন রচনা, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, যার প্রতিটি পংক্তি ও শব্দ, মিল ও অনুপ্রাস, রসের দ্বারা সুপক্ক ফলটির মতো, কবিতার দ্বারা আক্রান্ত।' মনে হয় সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের অনেকেও এই দিক থেকেই রোমাণ্টিক হবার পক্ষপাতী। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থে, সাম্প্রতিক কবিদের কোনো নৈতিক দায়িত্বপালনে আগ্রহ নেই। পরিশ্রুত কবিতা লেখার আদর্শে সাম্প্রতিক কবি উদ্বুদ্ধ। এবং সম্ভবত সে কারণেই প্রচলিত সর্বজনস্বীকৃত মূল্যগুলি সম্পর্কে কোনো কোনো তরুণতর কবির সুতীব্র অনীহা। অন্ধকার কি অধঃপতন বিষয়ে সাম্প্রতিক কবিদের অনেকেই সামাজিক অর্থে চিন্তিত নন; আধুনিক কবিতার মেজাজের সমীপবর্তী বলেই যদিও কোনো কোনো কবিতায় এই শব্দগুলো স্বাভাবিকভাবে এসেছে তথাপি প্রয়োজনের বাইরেও অনুরূপ শব্দগুলির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার অনেক সময় ক্লান্তিকর মনে হয়।

৩

চিত্রকল্প নির্মাণে, কোনো কোনো স্থলে উপমা ও প্রতীকের ব্যবহারে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য। এদিক থেকে কোনো সাম্প্রতিক কবির সাফল্য চূড়ান্ত স্বীকৃতির উপযোগী না হলেও এই চেষ্টা নতুন বলেই উল্লেখ্য। এমন সময় আসে যখন পুরাতন পদ্ধতিতে উপমা ও রূপকের ব্যবহার বর্জনীয় বিবেচিত হয় এবং নতুন নতুন শব্দ-উপাদানে উপমা-প্রতীকের ব্যঞ্জনার অনিবার্যতা দেখা যায়। এক্ষেত্রেও এলিয়ট দৃষ্টান্ত।

When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table ;

এই পংক্তি বিন্যাসে অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা অনুভব করেননি এমন কাব্যপাঠক বিরল। বাংলা কবিতায়ও অনেক সময়, যেমন জীবনানন্দ দাশের কবিতায়, এই অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' কিংবা ঐ একই কবিতায় 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে ;' ইত্যাদি পংক্তি উপমার অনন্যতায় সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গত একথাও মনে হবে চিত্রকল্পের ব্যবহারে সাম্প্রতিক শক্তিমান কবিদের অনেকেই জীবনানন্দ দাশের শেষ বয়সের কবিতাবলীর কাছে অনেক পরিমাণেই ঋণী। সম্ভবত তিরিশের যুগের আর কোনো কবিই সাম্প্রতিক কবিসমাজকে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এতো গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। ঠাণ্ডা, অন্ধকার, অমল, কুয়াশা, নক্ষত্র, আগুন ইত্যাদি শব্দ জীবনানন্দের কবিতায় যে ব্যঞ্জনা এবং নতুনতর স্বাদ বহন করে এনেছে সাম্প্রতিক কবিদের উদ্যোগে ও আচরণে তার প্রতিধ্বনি অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়। এখনকার শীতাংশু, অরুণাংশুরা, লোকেন বোস, অনুপম ত্রিবেদী, সুবিনয় মুস্তাফীর উত্তর পুরুষ এবং সে-কারণেই আমাদের স্মৃতিমন্থনের অন্যতম সহায়।

শব্দমণ্ডলীর সাহায্যে চিত্রকল্পের বিস্তার এবং বলা যেতে পারে চিত্রকল্প এক ধরনের শব্দ সংগঠিত ছবি যা আবেগ বা সংরাগে বিকীর্ণ। ইংরাজিতে বলা যাক 'a word-picture charged with emotion or passion.' চিত্রকল্প কবিতার একমাত্র গুণ না হলেও বিশিষ্ট একটি গুণ এবং কাব্য পাঠকের কাছে বিভিন্ন ধরনের চিত্রকল্পের আবেদন যেমন বিভিন্ন প্রকারের তেমনই একটি মাত্র চিত্রকল্প থেকেই কাব্য-পাঠক বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। সিসিল ডে. লুইস তাঁর 'দি পোয়েটিক ইমেজ' বইটিতে এজ্‌রা পাউণ্ডের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "It is better to present one Image in a life time than to produce voluminous works." একটি সার্থক চিত্রকল্প নির্মাণ যে সর্বদা সোজা ব্যাপার নয় সে ইঙ্গিত পাউণ্ডের উক্তিতেও প্রচ্ছন্ন। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালেও এমন অনেক কবিতা নজরে পড়বে যেখানে চিত্রকল্পের বিন্দুমাত্র ছায়াও অনুসন্ধান করে উদ্ধার করা

যাবে কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ, সে সব কবিতা চিত্রকল্পবিবর্জিত এবং অনেক সময় সে-কারণেই বর্ণহীন কিংবা বিস্বাদ। কিন্তু তারই পাশাপাশি রয়েছে এমন কিছু কিছু সার্থক ও সুসংবদ্ধ কবিতা, উপমা এবং চিত্রকল্পের ঐশ্বর্যে যেগুলো পাঠক মনে গভীর রেখাপাত করে। নীচের স্তবকগুলোতে, যথা—

১. নদীর ওপারের বন ছুঁয়ে চাঁদ উঠে এলো
নটীর মতো নিটোল, চোখের নীচে কালি।

(কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

২. পলাশের শাড়ী পরে রাজ্যেশ্বরী সন্ধ্যা
স্বর্ণচাপা আলোর ভেতর পেশল পাহাড়
হরিয়াল ময়নার ডাক, হরিণের দৃষ্টি, ঝর্ণার শব্দ, হাতীর গন্ধ,
সিংভূম, তোমার কঠোর রূপসী শরীরের বাঁকে শিল্পীর সংযম
পেখম তোলা ময়ূরের মতো রোদের বনস্থলী।

(রাম বসু)

৩. মনে হ'ল অন্ধকার, তারার শরীর নিয়ে,—
লঘুপায়ে হরিণীর গতি—
আমার বিবর্ণ মুখে একঝাঁক সুবর্ণ আশা
ছুঁড়ে দিয়ে পালালো তখনি।

(অরুণ ভট্টাচার্য)

৪. প্রত্যহ সকাল ফাটে অগ্নিময় চোখে
অনিদ্রা আহত রাত্রি ঘুম কাটে দাঁতে
বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্তে একাকীত্ব শোকে
কল্পিত বৃক্ষকে চায় স্মৃতির ·করাতে।

(চিত্ত ঘোষ)

৫. একা অন্ধকার ঘরে পৃথিবীর বুকে বড় দীর্ণ শব্দ হয়
দুই চক্ষে রক্ত ঝরে, কীটগুলি হানাহানি করে পরস্পর
মগজ আঁচড়ায় আর দু চোখের মণি ছিঁড়ে খায়
রক্তে দৃষ্টি ঢেকে আসে তিরস্কার দীর্ণ কলকাতায়।

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৬. সংসার পেরোলে বন্ধ পাথরের দরজা খুলে যাবে এই চির প্রত্যাশা
ঘুমহারা রাত্রি ছিল আমার দুপাশে, আমি শরীরের সব অধিকার
সরিয়ে নিয়েছি এই তারকা-অঙ্কিত পথ, অনাবৃত নিশ্চল সুদূর
মৌরীর জঙ্গল ঘুরে অমূর্ত ফোয়ারা পাই নিঃস্ব বুকে গন্ধ ভারাতুর।

(মানস রায়চৌধুরী)

৭ শান-বাধানো ফুটপাটে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।
ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

৮ কালো মেঘের ফিটন চ'ড়ে
কালিঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো।
সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় ক'রে
খিদের জ্বালায় হুগলি-গঙ্গাকেই
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধ'রে বেহুঁশ প'ড়ে আছে।

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

৯. ও নদী, রহস্যময় নদী,
অন্ধকারে হারিয়ে যাসনে, একটু দাঁড়া ;
এই যে একটু-একটু আলো, এই যে ছায়া ফিকে ফিকে,
এরই মধ্যে দেখে নেব সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারকাটিকে।

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

১০. হাওয়ার হাতে বাজুক তবে তালি
মেঘের ঝড়। ঝাঁপের ঝাঁপ। তুমুল ঢেউ। কালি···
ঝড়ের ঝাঁপে আকাশ কাঁপে খালি

ডুবলো শেষ সুদূর দেশ মেঘের গিরিচুড়ো
ঝঞ্ঝা লেগে বিপুল বেগে পাহাড় হ'লো গুঁড়ো
সর্বনেশে মাতন-জাগা ভাঙনে চুর চুর
হৃদয়-দাগা এ ভালো-লাগা ভাসালো একি সুর !

(বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়)

সুন্দর সুন্দর ছবি প্রস্ফুটিত বলতে পারা যায়। এখনকার কবিতায় প্রতীক-ধর্মিতার স্থানও উপেক্ষণীয় নয়। কোনো বিশেষ প্রতীকী আন্দোলনের অনুগামী না হয়েও এখনকার দিনের কতকগুলো বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রতীকী তাৎপর্যে বিন্যস্ত বলতে পারা যায়, যেমন নদী, বৃক্ষ, পিতামহ, দর্পণ, ঘর, অন্ধকার, জানালা, ঈশ্বর, চৌকাঠ, যিশু, অপ্রেম, ভগীরথ এবং অনুরূপ নানা শব্দসমষ্টি। কোন সাম্প্রতিক কবিতাই আদ্যন্ত প্রতীকধর্মী নয়; কিন্তু শব্দের প্রতীকী ব্যবহার কবিতায় দৃষ্টিগোচর যোগ্য।

চার

কবিমাত্রেই স্বকালের পুতুল ; স্বাভাবিক নিয়মেই একালের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে ইতিহাস, জীবন ও স্বদেশ সম্পর্কে সৎকবির মানসচেতনা উদ্বেল। তার অন্তর্দৃষ্টির পূর্বগগনে নবারুণ আভা এবং পশ্চাৎ দিগন্তে বিলীয়মান

কালের শেষদীপ্তি। মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান বিবেকনির্ভর কবি উভয় তোরণের সঙ্গে নিজের কবিসত্তার নিবিড়তম যোগসূত্রটিকে উপলব্ধি করবার চেষ্টায় থাকেন। ফলে, ঐতিহ্যনির্ভর অনেক সুন্দর কবিতা একালের কাব্যপাঠক উপহার পান। বিগতকালের ইতিহাস ও কাব্যকাহিনীর নানা ঘটনা নতুনতর তাৎপর্যে আধুনিক কবিতায় দীপ্যমান হবার সুযোগ পায়। আর্তিতে বিক্ষত, অপ্রেমের অন্ধকারে শঙ্কিত কবিহৃদয় প্রাচীন স্মৃতির ঐশ্বর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে একালের প্রতিকূল পরিবেশে ভিন্নতর মুক্তি ও উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন। মনে হয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণেই এই ধরনের কবিচেতনার ওপর নির্ভরশীল। নীচের স্তবকগুলো প্রসঙ্গত উল্লেখ্য :

মা, তোমার চোখে বিদ্যুৎ যদি ঝলে,
সেই আভা নিয়ে আকীর্ণ হবো তমিস্র নদীজলে।
আমি তো দেখেছি সেই আভা নিয়ে বেহুলার খেয়া ভাসে,
ভেঙেচুরে যায় মৃত্যুর পিঞ্জর,
কালের কুটিল জলের বাসরে আমিও লখিন্দর
বেহুলা আমায় নিয়ে চলে আজো প্রদীপ্ত বিশ্বাসে।

(অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

কাকে তুমি চাও? কোন্ মাকে তুমি ডাকো? কার গহন অঞ্চলে ফিরে যেতে চাও তুমি? বলো,

কে তোমাকে জন্ম দিল প্রেমে? সর্বনাশী
কোন্ মা তোমাকে দিল সাপ খেলাবার ভাঙা বাঁশী?
*   *   * আজ দেখো সুদূর দুয়ার ধরে মা
গভীর লণ্ঠন জ্বেলে জাহাজের মতো আর্ত আলো ফেলে কিনা
তোমার নিহত শব খুঁজে খুঁজে, তোমাকে মা ডাকে নাকি,
ফিরে ডাকে প্রাচীন নিখিলে?

(শঙ্খ ঘোষ)

এবং জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন পর্যন্ত কবিরা বাংলা দেশ সম্পর্কিত কবিতায় যে স্বদেশ চেতনা-উদ্বুদ্ধ প্রসাদগুণের সঞ্চার করেছেন উদ্ধৃত স্তবকগুলোতে তারই সমীপবর্তী অনুরণন সুস্পষ্ট। যুগযন্ত্রণার প্রকাশে, দেশপ্রেম, মানবতাবাদ এবং বিশ্ববোধের পটভূমিকায় সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় সুভাষিত পদাবলীর অসদ্ভাব নেই। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিভাষায়ঃ 'শিল্পসামগ্রীর উপাদান যদিও সনাতন ও সার্বজনীন সংসারেই আহরণীয় তবু যে অসামান্য বিন্যাসে সেই চিরপরিচিত উপকরণ-সমূহ আমাদের বিস্ময় জাগায়, তার উৎপত্তি শিল্পীর একাগ্র সংকল্পে এ উক্তির গুরুত্ব সাম্প্রতিক কবিসমাজে স্বীকৃত।

এ কালের সাম্প্রতিক কবিতায় কোনো দার্শনিক সিদ্ধান্ত কিংবা কোনো রাজনৈতিক যুক্তিবাদের স্থান সঙ্কুচিত এবং সম্ভবত তারই ফলে মানসিক উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার প্রাধান্য। ধূসর, আরোপিত আশাবাদে এখনকার কবি আর উদ্বুদ্ধ হন না; চলেছে বিস্তৃততর অনুসন্ধান, সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে নতুনতর সম্ভাবনার। অনেক সময়ে পুঁথিগত বিদ্যার অনুপ্রেরণায় বিদেশী কাব্যাদর্শে বাঙ্গালী কবিও অস্থির হয়ে থাকেন এবং বদ্‌লেয়র, ম্যালার্মে, ভ্যালেরি, এলিয়ট প্রমুখের কাব্যচেতনার অনুসরণে আশ্বস্ত হতে গিয়ে অনুকরণ ও আত্তিকরণের পার্থক্য ভোলেন। কিন্তু, প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই সম্ভবত সৎকবির মানসিক ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার সমসাময়িক কালের স্বদেশ, স্বজাতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের উপকরণগুলির উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় এই বোধ যে ক্রমশই ফিরে আসছে এটা, আমার বিবেচনায়, শুভ লক্ষণ।

নির্দেশিকা